অতঃপর – শারিয়া কি বলে?

হাসান মাহমুদ

bpl

bpl

অতঃপর, শারিয়া কী বলে

হাসান মাহমুদ

ISBN 978-984-93089-9-7

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২০, মাঘ ১৪২৬

প্রকাশক
বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর পাবলিশিং লিমিটেড (বিপিএল)

প্রচ্ছদ
....

শিল্প নির্দেশনা
মোতাসিম বিল্লাহ্ পিন্টু

মুদ্রণ
মাটি আর মানুষ, আলীজা টাওয়ার (৩য় তলা), ১১০ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর পাবলিশিং লিমিটেড-এর পক্ষে তৌফিক ইমরোজ খালিদী কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের ভৌত বা ইলেক্ট্রনিক প্রতিলিপি তৈরি করা যাবে না। বইটির পাইরেটেড কপি চোখে পড়লে প্রকাশককে জানাবার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

bpl.bdnews24.com

Atapar Shariah Ki Bole
by Hasan Mahmud
Published by bdnews24 publishing ltd.
17 Mahakhali, Dhaka-1212, Bangladesh.
+880 2 8817131, bpl@bdnews24.com

উৎসর্গ

যুগে যুগে যে অগণিত মুসলিম নারী
ইসলামের নামে অপমানিত, অত্যাচারিত
ও নিহত হয়েছেন তাঁদের প্রতি

মুখবন্ধ

এ বইয়ের অধ্যায়গুলো মূলত দেশের সর্বাধিক পঠিত অনলাইন সংবাদমাধ্যম 'বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম'-এর মতামত বিভাগে প্রকাশিত আমার ইসলাম-মুসলিম সম্পৃক্ত নিবন্ধগুলো থেকে নির্বাচিত এবং আমার "শারিয়া কী বলে, আমরা কী করি" (৪র্থ সংস্করণ)-এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তী বই। বই দুটি প্রধানত ইসলামে মানবাধিকার, মুসলিম বিশ্বের বাস্তবতা ও তার সাথে ইসলামের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্পর্কিত। অতীত বর্তমানে আলেমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে প্রচণ্ড মতভেদ হয়েছে এবং হচ্ছে তার মধ্যে আছে গায়েবি জানাজা বা জোরে আমিন বলা জায়েজ কিনা, নামাজের সময় বুকে নাকি নাভির নিচে হাত বাঁধতে হবে, আল্লাহ'র হাত-পা আছে কি না, রাসুল (সা.) আলোর সৃষ্টি কিনা, তাঁর ছায়া ছিল কি না, তিনি সামনে-পেছনে সমান দেখতে পেতেন কি-না, তাঁর শরীরে মশা-মাছি বসত কি না, তিনি মেরাজে গিয়েছিলেন দৈহিক নাকি রুহানি, কোরান শরিফ সৃষ্ট না অসৃষ্ট ইত্যাদি। বাস্তবে মানুষের জীবনের ওপর ওসবের প্রভাব সামান্যই।

যেসব বিষয় আমাদের জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে, সেগুলোই এই বই দুটোর প্রধান উপজীব্য। এর মধ্যে আছে তাৎক্ষণিক তালাক, মুরতাদ-হত্যা, নারী-নেতৃত্ব, পর্দা-হিজাব-নিকাব, সম্পত্তিতে নারীর অর্ধেক উত্তরাধিকার, চার বিয়ে, স্ত্রী-প্রহার, একুশ-ছাব্বিশে-ষোলোই উদযাপন শিরক কি-না, অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক, ভাস্কর্য ও মূর্তি বনাম পূজার প্রতিমা, সংগীত, বাল্যবিবাহ, ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা ইত্যাদি। যেহেতু এগুলো বিধি বিধানের মধ্যে পড়ে তাই অবশ্যম্ভাবীভাবে শারিয়া আইনসম্পর্কিত অনেক বিষয় ও সূত্র এসেছে। বিগত দিনগুলোতে আমরা দেখেছি বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম এ বিষয়গুলো নিয়ে সন্দেহ, সিদ্ধান্তহীনতা ও বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। আশা করি এই বই দুটো তাদেরকে মুক্তচিন্তা ও শালীন আলোচনায় প্ররোচিত করবে।

তাত্ত্বিক আলোচনা অন্তহীন। কিন্তু গাছের পরিচয় তো তার ফলেই। এটা অনস্বীকার্য যে ইসলামের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে, সেই সাথে "তোমারটা ভুল আমারটাই ঠিক, তুমি দোজখে যাবে" এসব বলারও প্রবণতা আছে। কিন্তু যেহেতু যার যেটা বিশ্বাস তার কাছে সেটাই পরম সত্য তাই ও দাবি অর্থহীন। বরং ইসলামের যে ব্যাখ্যায় শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত হয়, সেটাই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। এই বিশ্বাসই এই বই দুটোর মূল চালিকাশক্তি এবং এটা এসেছে কোরান থেকেই:

তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি– হজ ৭৮,

আল্লাহ তোমাদের সহজ করতে চান, তিনি তোমাদের কষ্ট চান না–বাকারা ১৮৫,

আল্লাহ তোমাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট দিতে চান না–মায়িদা ৬।

চৌদ্দশ বছর ধরে ইসলামে মানবাধিকারের ব্যাপারে আমরা অনেক দাবিই করেছি কিন্তু তার অনেকটাই প্রমাণ তো করতে পারিই নি বরং বাস্তবে তা উল্টো প্রমাণিত হয়েছে। এখানে এসেই আত্মসমালোচনা অর্থাৎ নিজেদের পারফরম্যান্স রিভিউ জরুরি হয়ে পড়ে। সমস্যাটা হলো, ইসলাম-বিরোধীদের চুন খেয়ে আমাদের মুখ এতটাই পুড়েছে যে এখন আত্মসমালোচনার দই দেখলেও আমরা আঁতকে উঠি আর নিজেদের ব্যর্থতাগুলোকে অস্বীকার করার চেষ্টা করি। ফলাফল পরস্পরের বিরুদ্ধে অবধারিত গালাগালি ও হুংকার। কিন্তু, অন্ধ হলে তো প্রলয় বন্ধ হয় না, তাই আত্মসমালোচনার বিকল্প নেই।

ইসলামে মানবাধিকার নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেশ কিছু ইসলামি ও মানবাধিকার সংগঠনের সাথে দীর্ঘকাল কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছে, তাই কিছু অভিজ্ঞতাও হয়েছে। এখানে আমরা ভদ্রভাবে বিতর্ক-আলোচনায় অভ্যস্ত। অনেকবার অনেক দেশে, এবং কানাডিয়ান টিভিতে মওলানা মুফতির সাথে আমার শারিয়া নিয়ে তুমুল ও শালীন তর্কবিতর্ক

হয়েছে। কিন্তু তারপরে আমরা একসাথে অনেক হাসিঠাট্টাও করেছি। বাংলাদেশে সে আবহ নেই। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ইসলামি নেতৃত্ব অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর, তাঁদের নেতৃত্বে গত কয়েক দশক ধরে জাতি ভিন্নমতের প্রতি উত্তরোত্তর অসহিষ্ণু ও উগ্র হয়ে উঠেছে। এই বৈরী পরিবেশে আমার নিবন্ধগুলো প্রকাশ করার জন্য 'বিডিনিউজ২৪ ডট কম'-এর কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বিষয়বস্তু এক হলেও সংবাদমাধ্যমের নিবন্ধ আর বইয়ের ভাষা, শব্দচয়ন, বাক্যবিন্যাস, ব্যাপ্তি, গভীরতা ইত্যাদি আকাশপাতাল আলাদা হয়। তাছাড়া ২০১১ সালে "শারিয়া কী বলে, আমরা কী করি" প্রকাশিত হবার পরে অজস্র ঘটনা ঘটেছে, আমূল বদলে গেছে ইসলামে মানবাধিকারের বোধ, উপলব্ধি আর বাস্তব। তাই এই বই দুটো পরস্পরের পরিপূরক ধরা যেতে পারে। কোনো কোনো অধ্যায়ে প্রয়োজন মাফিক পটভূমি যোগ করা হয়েছে। আমি নিরপেক্ষভাবে পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যাগুলোর সাথে মানবাধিকার ও বাস্তবতার সখ্য ও সংঘাত দেখাবার চেষ্টা করেছি। কারণ (১) বিভিন্ন মতামতের মধ্যে চিন্তার শালীন সংঘাতই অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি, এবং (২) মুসলিমদের গঠনমূলক সমালোচনা ইসলামের সমালোচনা নয় বরং নিজেদের আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টামাত্র।

সংবাদপত্রের একগাদা নিবন্ধ বাছাই ও চয়ন করে একটা বই বের করা চাট্টিখানি কথা নয়। যার ক্রমাগত তাগাদা, অনুপ্রেরণা ও পরিশ্রম ছাড়া এ বই কল্পনাও করা যায় না সেই সামিনা আমিনকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না, এই সফল প্রচেষ্টার একক কৃতিত্ব একান্ত তারই।

যে ধর্ম প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে শুধু টিকেই নেই বরং বাড়তে বাড়তে আজ পৃথিবীর সবচেয়ে "বাড়ন্ত" ধর্ম (Fastest Growing Religion) তার আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তি প্রশ্নাতীত। সেই সাথে এটাও সত্য যে বহুদিন থেকেই বিশ্ব-মুসলিম নানান সমস্যায় জর্জরিত। তার অন্যতম কারণ আমাদের ইসলামি নেতৃত্বের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদ। তবে এটাই শেষ কথা নয়। ঐশী বিশ্বাস ও ধর্মাচরণ বিভিন্ন হলেও বিশ্বশান্তির মানব-

বাগানের কথা সব ধর্মেই বলা আছে, ইসলামেও আছে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সমস্ত সংঘাত পার হয়ে সখ্যের শক্তিতে বিশ্ব-মানবের সেই বাগান একদিন ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে সেই প্রত্যাশায়–

বাগান হোক না শত, ঝড়ে ক্ষতবিক্ষত–নামহীন কোনো ফুল ফুটবেই,

দূর দুরান্ত থেকে, যুগ যুগান্ত থেকে–কলিতে অলিরা এসে জুটবেই!

তীক্ষ্ণ খরার পরে, খালবিল নদী ভরে–উত্তাল জল ছল ছলবেই,

ক্ষুদ্র মরণ শেষে, রুদ্র জীবন এসে–জীবনের রূপকথা বলবেই !

হোক পথ দুঃসহ, দুর্গম ভয়াবহ–দু-এক পথিক পথ চলবেই,

বোধের বন্ধদ্বারে, নিকষ অন্ধকারে–বিদ্রোহী কিছু দীপ জ্বলবেই!!

সবাইকে সালাম।

হাসান মাহমুদ

সূচিপত্র

মুসলিম উম্মাহ ও অপ্রতিহত মোদি	১১
তিন তালাকের 'তালাকপ্রাপ্তি', উত্তাল ভারত	১৮
সমান উত্তরাধিকার : প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ও হজরত ওমরের (রা.) শাসন	২৬
বিশ্ব বেকুব দিবস: ১ এপ্রিল নাকি ২২ জুন?	৩৩
নিউজিল্যান্ড: প্রতিশোধের করাত-চক্র ও 'বিদায় হজ'-এর ভাষণ	৩৭
পাক-ভারত যুদ্ধ: "গাজোয়া-এ হিন্দ" হাদিস কী বলে?	৪২
অ-তে অতুলপ্রসাদ, আ-তে আলতাফ মাহমুদ!	৪৭
ধর্মানুভূতি: কঠিন সংকটে পাকিস্তান (আসিয়া বিবি মামলা)–দেখে শিখব নাকি ঠেকে?	৫৩
আইয়ুব বাচ্চু বনাম আমাদের ইমামেরা	৫৯
গ্রেনেড হামলার শারিয়া-বিচার !	৬৬
মুসলিম নারীর তালাকের অধিকার	৭২
মন্দিরে নামাজ: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সাধারণ গণমানস	৭৯
হুংকারী মওলানা ও জারার মসজিদ...	৮৪
পোশাক ও যৌনতা–নিকাবনামা	৯০
২১শে, ২৬শে, ১৬ই উদ্‌যাপন কি শিরক?	৯৯
পাক-আলেমদের সখাত-সলিল	১০৫
আবার জঙ্গি: পাকিস্তানি বনাম বাংলাদেশি গণমানস	১১২
কোরান যেভাবে দাসপ্রথা উচ্ছেদ করেছে	১১৮
মসজিদে গণহত্যা ও জঙ্গি-মানস	১২৮

অনেক দেশে নাস্তিক এখন সংখ্যাগুরু	১৩৩
ধন্যবাদ, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ('বিশ্বকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রধারণা থেকে বের হতে হবে').	১৪০
ধর্ষণ বন্ধে শারিয়া আইন?	১৫১
'নেত্রীত্ব' বনাম 'নেতৃত্ব'	১৫৮
বাংলাদেশের শারিয়াকরণ: সুদে ও আসলে গুনতে হবে কি দেনা?	১৬৭
ইসলামে বাল্যবিবাহ	১৭৬
জঙ্গি উচ্ছেদে শারিয়া আইন	১৮১
মুরতাদ হত্যার পক্ষে-বিপক্ষে	১৮৬
মূর্তি বিড়ম্বনার ইসলামি আঙ্গিক	১৯৫
ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড, মুসলিম-প্রতিক্রিয়া, বাক-স্বাধীনতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি	২০১
কানাডায় পশ্চিমা বিশ্বের প্রথম শারিয়া কোর্ট–অতঃপর?	২০৮
কানাডিয়ান শারিয়া কোর্ট–ফাঁক ও ফাঁকি	২১৬
বাবরি মসজিদ: ভুতের ভবিষ্যৎ	২২১
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও তুরস্কের নাক: ৫টি বিস্মৃত প্রতিবাদ	২২৬
ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার, সফল জঙ্গিবাদ উচ্ছেদ প্রকল্প ও আহলে হাদিস	২৩৬

মুসলিম উম্মাহ ও অপ্রতিহত মোদি

(সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট: ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর ভারতে অধিভুক্তির ব্যাপারে কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ভারতীয় সংবিধানে ৩৭০ অনুচ্ছেদে সম্মতি স্বাক্ষর করেন। সে অনুযায়ী ১৯৪৯ সালে ভারতের সংবিধানে ৩৭০ এবং ৩৫ (ক) অনুচ্ছেদ যুক্ত হয়, যার ফলে জম্মু-কাশ্মীরের জনগণের নাগরিকত্ব, সম্পদের মালিকানা, মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হয়, বাইরের কেউ সেখানে জমি কিংবা সম্পদ কিনতে পারত না, ভোটারও হতে পারত না। ৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে ভারতের প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোবিন্দ এক প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের মাধ্যমে অনুচ্ছেদটি বাতিল করার ফলে জম্মু-কাশ্মীর সেসব অধিকার হারিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয়েছে। এর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে লবিং করছেন)।

৫ আগস্ট ২০১৯ ভারতে মোদি সরকার কাশ্মীরে জনগণের সাংবিধানিক অধিকার হরণ করার পর থেকে পরমাণু বোমার দুই শক্তিধর পাক-ভারতের মধ্যে বিরাজমান টানটান উত্তেজনা। ভারত-চাণক্যের রাজনৈতিক দাবাখেলায় ধীরে ধীরে প্রকাশ হচ্ছে হিন্দুত্ববাদের সাম্প্রদায়িক হিংস্র নখ-দাঁত। তাঁর একাগ্র দুচোখ যে জম্মু-কাশ্মীর-লাদাখ ছাড়িয়ে সুদূর কোনো এক মঞ্জিলে নিবদ্ধ তা বুঝতে আইনস্টাইন হতে হয় না। রাজনীতির এই ভারত-ঘুঘু ইঁদুর বেড়াল খেলছেন বিশ্ব-দরবারে কোণঠাসা পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সাথে, সেটাই স্বাভাবিক। ইমরান খান প্রাণান্ত চেষ্টা করছেন ও দেশবাসীকে আশার বাণী শোনাচ্ছেন, সেটাও স্বাভাবিক। ভয়াবহ অস্বাভাবিক যেটা তা হলো যা দীর্ঘদিন মধ্যপ্রাচ্যে ও পাক-ভারত বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মওলানাদের গর্বিত উচ্চারণে হাজার বার শুনেছি:

"আবূ নুঁআয়ম (রা.) নুমান ইবনু বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি মু'মিনদের পারস্পরিক দয়া ভালোবাসা ও সহানূভূতি প্রদর্শনে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যখন দেহের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশগ্রহণ করে"—সহি

বুখারি হাদিস ৫৫৮৬ ও অন্যান্য হাদিস কেতাব।

এই হাদিসের সাথে বাস্তব মিলছে না। পাকিস্তানের সাথে ভারত-ঘুঘু যে ইঁদুর-বেড়াল খেলছে তার অন্যতম শক্তি মুসলিম দেশগুলোই। লোহার কুড়ুলটা অন্য কাঠকে ছিন্নভিন্ন করতে পারে কাঠের হাতলটার সাহায্য পায় বলেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সর্বোচ্চ সম্মান/পুরস্কার দিয়েছে কারা?

১. সৌদি আরব–"অর্ডার অফ আব্দুল আজিজ আল সৌদ",

২. আরব আমিরাত–"জায়েদ অর্ডার"–(এতে খুব গোসসা হয়ে আমিরাত সফর বাতিল করেছেন পাকিস্তান সিনেট চেয়ারম্যান সাদিক সাঞ্জরানি),

৩. বাহরাইন,–"দ্য কিং হামাদ অর্ডার অব দ্য রেনেসাঁ",

৪. আফগানিস্তান–"গাজী আমীর আমাউল্লাহ খান অ্যাওয়ার্ড",

৫. প্যালেস্টাইন–"গ্র্যান্ড কলার অব দি স্টেট অব প্যালেস্টাইন",

৬. মালদ্বীপ–"নিশান ইজউদ্দীন"।

এ ছাড়াও মোদি পেয়েছেন:

৭. রাষ্ট্রসংঘের "চ্যাম্পিয়ন্স অফ আর্থ",

৮. "অর্ডার অব সেন্ট এন্ড্রু"–রাশিয়া,

৯. সিওল শান্তি পুরস্কার–দক্ষিণ কোরিয়া,

১০. লন্ডনের বিখ্যাত মাদাম তুসো মোম জাদুঘরে মোদির মোমের মূর্তি।

এই বিপুল শক্তির সামনে কী শক্তি নিয়ে দাঁড়াচ্ছে পাকিস্তান? দাঁড়াচ্ছে "গাজোয়া-এ হিন্দ" হাদিসের শক্তিতে। নবীজির (সা.) উপস্থিতিতে যে জিহাদ তাকে গাজোয়া বলে। দেশের মওলানারা উত্তেজিতভাবে এই হাদিস জাতিকে শোনাচ্ছেন, জাতি তা বিশ্বাসও করছে এমনকি পাক

আমির" ওয়েবসাইটেও এ হাদিস উজ্জ্বলভাবে ধরা আছে। এ হাদিস আছে প্রায় আধা ডজন, একটি আছে সহি হাদিস নাসাঈতে যা সহি সিত্তার অর্থাৎ 'সত্য ছয়'-এর অন্যতম (সহি বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)। হাদিসগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে, তবে সবগুলোর সারসংক্ষেপে ভারতের ব্যাপারে মোটামুটি এই দাঁড়ায়,–জেরুজালেম থেকে মুসলিমেরা এসে হিন্দুস্তান আক্রমণ করে জয় করবে, "হিন্দু রাজাদেরকে শেকলে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসবে", বিজয়ী মুসলিমেরা জান্নাতি হবে।

এই হাদিসের জোশে টগবগ করে ফুটছে পাকিস্তানি জাতি আর তার আর্মি। ওখানে কারো বলার হিম্মত নেই, কেউ খতিয়েও দেখছে না হাদিসটা কেন অবাস্তব। প্রবল ক্ষমতাশালী ইসরাইলের রাজধানী জেরুজালেম দখল করে সেখান থেকে ভারত আক্রমণ করার সাধ্য মুসলিম বিশ্বের নেই, কিংবা ভারতে এখন কোনো রাজা নেই যাকে মুসলিমেরা "শেকলে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসবে"। অথচ "গাজোয়া-এ হিন্দ"-এর ভারত-বিজয়ের জোশ তাদের মন-মগজ গ্রাস করে রেখেছে। এভাবেই ইসলামের নামে আমরা অবাস্তব জগতে বাস করি, অলীক পরশপাথর খুঁজে বেড়াই। অতীব আশ্চর্য, একটা দেশের সামরিক বাহিনী তার সরকারি ওয়েবসাইটে প্রমাণ দিচ্ছে যে তার প্রধান শক্তি অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও ডিসিপ্লিন নয়, তার প্রধান শক্তি হলো ইসলামের নামে এক অবাস্তব স্বপ্ন।

মুসলিম উম্মাহ'র ভ্রাতৃত্ব শুধু বর্তমানেই ব্যর্থ হয়নি। ইমাম আবু হানিফাকে কারাগারে প্রহার করে হাড় ভেঙে বিষ দিয়ে খুন করেছিল খলিফা আল মনসুর। ইমাম তাইমিয়াকে দামেস্কের কারাগারে খুন করেছিল খলিফা, ইমাম হাম্বলকে কারাগারে অমানুষিক প্রহার করা হয়েছিল, ইমাম মালিকের হাত মুচড়ে ভেঙে দিয়েছিল মদিনার শাসক, ইমাম শাফি'কে খুন করেছিল ইমাম মালিকের অনুসারী ফিতিয়ান (ইমাম মালিকের নির্দেশে নয়), লোকচক্ষুর অন্তরালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত ইমাম বুখারি, দু'হাত তুলে হাহাকার করতেন ইসলামের যুগশ্রেষ্ঠ এই ইমাম: "হে আল্লাহ! আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও, এ দুনিয়া আমার জন্য ছোট হয়ে গেছে"।

মুসলিমের হাতে মুসলিমের রক্তের বন্যায় স্তব্ধ হয়ে আছে ইতিহাস। আমরা শুধু যুদ্ধের কথাই পড়ি কিন্তু খেয়াল করি না সেইসব কোটি কোটি মৃতদেহ এবং সেই সাথে কোটি কোটি আহতের আর্তনাদ, উজাড় বসতি ও বিধবা-এতিমের হাহাকার। খেয়াল করুন, এ তালিকা কিন্তু শুধু মুসলিমের সাথে মুসলিমের যুদ্ধের। সূত্রভেদে বিভিন্ন দলিলে নাম, জায়গা ও সালের কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

সাল

- ৬৬১–হজরত আলী নিহত–সিরিয়ার শাসক মাবিয়া উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা,
- ৬৮০–মাবিয়ার মৃত্যু, এজিদ খলিফা হল–কারবালায় নবীজির প্রিয় নাতি হজরত হোসেন (রা.) সহ পরিবারের অনেকে নিহত,
- ৬৮৪–মক্কায় আবদুল্লা বিন জুবায়ের-এর খলিফা হবার ঘোষণা, মার্জ রাহাত-এর যুদ্ধ,
- ৬৮৭–৬৯২–কুফায় মুখতার নিজেকে খলিফা ঘোষণা করলে মক্কায় জুবায়ের, কুফায় মুখতার ও সিরিয়ায় এজিদের বংশধর আবদুল মালিক, একসাথে এই তিন খেলাফতের উদ্ভব ও রক্তাক্ত যুদ্ধে মুখতার ও জুবায়ের নিহত। আবদুল মালিকের সেনাপতি হিসাবে ইতিহাসের কুখ্যাত নৃশংস হত্যাকারী হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ক্রমাগত গণহত্যা। সাহাবিসহ লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে সে খুন করেছে,
- ৬৯৫–জাজিরা, আহয়াজ ও কারুন-এর তিনটে যুদ্ধ,
- ৭০২–ইরাকে আশাথ বিদ্রোহ, দায়রুল জামিরা'র যুদ্ধ,
- ৭০২ থেকে ৭৩৭ পর্যন্ত মুসলিম সৈন্যদের বহু দেশ জয় ও ফ্রান্সের সীমানায় পরাজয়–আবার মুসলিমের গৃহযুদ্ধ শুরু,
- ৭৪০–(ক) ইরাবে শিয়া বিদ্রোহ। (খ) উত্তর আফ্রিকায় বারবার

বিদ্রোহ,

- ৭৪৩–খোরাসানে শিয়া বিদ্রোহ,
- ৭৪৪–বিদ্রোহীদের অভ্যুত্থানে খলিফা ২য় ওয়ালিদ নিহত,
- ৭৪৫–খোরাসানে আবার শিয়া বিদ্রোহ–খারাজি দ্বারা কুয়া ও মসুল দখল,
- ৭৪৬–খোরাসানে আবু মুসলিমের বিদ্রোহ,
- ৭৪৯–ইস্পাহান ও নিহাওয়ান্দ-এর যুদ্ধ,
- ৭৫০–(ক) আব্বাসীয়দের দ্বারা রক্তাক্ত গণহত্যায় উমাইয়া খেলাফতের অবসান। (খ) যাব-এর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ,
- ৭৫৫–খোরাসানে আবার বিদ্রোহ,
- ৭৬২–ইব্রাহিম ও নাফউজ জাকিয়া-র নেতৃত্বে শিয়া বিদ্রোহ,
- ৭৬৭–সিজিলমাসায় খারেজি শাসনের শুরু,
- ৭৭২–উত্তর আফ্রিকায় জানবির যুদ্ধ, মরক্কোতে বিদ্রোহী রুস্তমিদ খেলাফত শুরু,
- ৭৮৮–মগরেব-এ ইদ্রিসিদ খেলাফত শুরু,
- ৭৯৯–খাজারদের বিদ্রোহ দমন,
- ৮০০–উত্তর আফ্রিকায় আঘলাবিদ খেলাফত শুরু,
- ৮০৩–ইমাম জাফর বারমকির খুন,
- ৮১৪–খলিফা হারুন রশীদের মৃত্যুতে দুই পুত্র আল্ আমিন ও আল্ মামুনের ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ। আল্ আমিন নিহত,
- ৮১৫–ইবনে তুবার নেতৃত্বে শিয়া বিদ্রোহ–কয়েক বছর যুদ্ধের পর সেনাপতি হুরমুজান নিহত,

- ৮২০–খোরাসান-এ তাহিরিদ খেলাফত শুরু,
- ৮২৭–মুতাজিলাদের সাথে অন্যান্যদের বিরোধ শুরু,
- ৮৩৭–জাট (ভারতের নয়) বিদ্রোহ,
- ৮৩৮–আজারবাইজান-এ বাবেক বিদ্রোহ দমন,
- ৮৪৩–তাবারিস্তান-এ মাজাইর বিদ্রোহ,
- ৮৬১–বিদ্রোহী অভ্যুত্থানে খলিফা মুতাওয়াক্কিল নিহত,
- ৮৬৪–তাবারিস্তান-এ যায়দি খেলাফত শুরু,
- ৮৬৬–খলিফা মুতাসিম বিতাড়িত–নতুন খলিফা মুতা'জ,
- ৮৬৭–সিস্তান-এ সাফারিদ খেলাফত শুরু,
- ৮৬৮–মিসরে তুলুনিদ খেলাফত শুরু,
- ৮৬৯–খলিফা মুতা'জ বিতাড়িত–নতুন খলিফা দাসী-পুত্র আল মুহতাদি,
- ৮৭০–তুর্কি বিদ্রোহে আল্ মুহতাদি নিহত–নতুন খলিফা আল্ মুতামিদ,
- ৮৭৩–রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তাহিরিদ খেলাফতের উচ্ছেদ,
- ৮৭৪–দক্ষিণ ইরাকে জাঞ্জ বিদ্রোহ,
- ৮৯১–কেন্দ্রীয় খেলাফত অস্বীকার করে বাহরায়েন-এ কামাতিয়ান শাসনের উদ্ভব,
- ৮৯৭–কামাতিয়ান দ্বারা বসরায় গণহত্যায়,
- ৯০৫–মসুল ও জাজিরা-য় হামদানিদ খেলাফত শুরু–মিসরে তুলুনিদ খেলাফতের উচ্ছেদ,
- ৯০৮–সামানিদ খেলাফত দ্বারা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সাফারিদ খেলাফতের

অবসান...

মুসলিমের হাতে মুসলিমের গণহত্যা একাত্তরেও শেষ হয়নি। এখনো সৌদি আক্রমণে মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষের শিকার ইয়েমেনের কোটি কোটি মুসলিম আর তাদের জন্য দুনিয়ার কাছে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে দুনিয়ার অনেক অমুসলিম মানবিক সংগঠন, দানও করছেন বহু উদার অমুসলিম। আমাদের সমস্যাসংকুল গরিব দেশ, তবুও আমরা মিয়ানমারের নির্যাতিত মুসলিমদের আশ্রয় দিয়েছি, খাওয়া পরা চিকিৎসায় প্রাণান্ত চেষ্টা করছি। কিন্তু এ ব্যাপারে কী করেছে মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশগুলো? কয়টা পয়সা পাঠিয়েছে রোহিঙ্গাদের জন্য? গণহত্যার শিকার সিরিয়ার হাজার হাজার মুসলিমদেরকে আশ্রয় ও নাগরিকত্ব দিয়েছে পশ্চিমা বিশ্ব, যাদের বিরুদ্ধে হরহামেশা গালাগালি ও গর্জন ওঠে আমাদের ওয়াজ মাহফিলে–কয়জন সিরিয়াবাসীকে আশ্রয় দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশগুলো?

কাউকে না।

বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ'র স্বপ্নটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সেই কবে!

২৮ আগস্ট, ২০১৯

তিন তালাকের 'তালাকপ্রাপ্তি', উত্তাল ভারত

নিয়তির পরিহাস! ১৪০০ বছর আগে ইসলাম মুসলিম নারীদেরকে যে অধিকার দিয়েছিল তা হরণ করেছি আমরা আর আজ সেই অধিকার মুসলিম নারীদেরকে ফিরিয়ে দিল অমুসলিম ভারত! তিন তালাক অর্থাৎ তাৎক্ষণিক তালাকের কথা বলছি।

ভারতের বহু আলেম তিন তালাকের বিরুদ্ধে, কিন্তু সর্বোচ্চ সংগঠন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের (AIMPLB) আলেমরা তিন তালাক নিষিদ্ধের ঘোর বিরোধী। ২৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে সংসদে পাস হলো তিন তালাক নিষিদ্ধের বিল, তাৎক্ষণিক তালাক দিলে স্বামীর ৩ বছরের জেল ও জরিমানা হবে। এ নিয়ে ভারতে তোলপাড়–মুসলিম নারীরা ও মানবাধিকার কর্মীরা উৎসবে ফেটে পড়েছেন, বিক্ষুব্ধ AIMPLB মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তিন তালাকের কুফল কতদূর যেতে পারে? খবর: "বারবার তিন তালাক স্বামীর–নিকাহ হালালার অছিলায় লাগাতার ধর্ষণ করেছে শ্বশুর–ইন্ডিয়ান টাইমস–এই সময়–১৯ জুলাই ২০১৮। ভারতে আপাতত ধোঁয়াশা রয়েছে এগুলো নিয়ে:

১. স্বামীর তিন তালাক উচ্চারণ কি এক তালাক ধরা হবে?

২. স্বামীর জেল হলে সংসারের খরচ কে দেবে?

৩. জেল থেকে ফিরে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে কী ব্যবহার করবে, তা সহজেই অনুমেয়। কাজেই, এই আইন করে মুসলিম নারীদেরকে আরো বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হলো না কি?

৪. এটা দেওয়ানি মামলা, এটাকে কেন ফৌজদারি বিভাগে ফেলা হলো?

৫. তিন তালাক উচ্চারণে তালাক হবে না। তাহলে, যে উচ্চারণের

কোনো প্রভাব সমাজ বা জীবনের ওপর নেই তা কেন অপরাধ হবে?

৬. বহু ধর্মের বহু সংস্কৃতির ভারতে এটা কি "ইউনিফর্ম সিভিল কোড" অর্থাৎ "সবার জন্য এক আইন"- সেদিকে পদক্ষেপ?

এগুলোর জবাব পেতে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। এখন দেখা যাক এ ব্যাপারে ইসলাম নারীকে কী অধিকার দিয়েছে ও কীভাবে তা হরণ করা হয়েছে।

(১) কোরান কী বলে

দ্য ক্রাইটেরিয়ন, আল ফুরকান–সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণকারী গ্রন্থের সুস্পষ্ট মানদণ্ড–যে বিধানে নিরপরাধের কষ্ট হয় তা আল্লাহর বিধান হতে পারে না, পিরিয়ড. (বাকারা ১৮৫, মায়িদা ৬ ও হজ ৭৮)।

(ক) কোরানে দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোথাও তাৎক্ষণিক তালাকের প্রতি বিন্দুমাত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন নেই বরং উল্টোটা আছে। সূরা বাকারা ২২৯–তালাক পূর্ণ হতে কমপক্ষে দু'মাস লাগে।

(খ) তিন তালাক সাধারণত ঘটে স্বামীর রাগের মাথায়, পরে স্বামী প্রায়ই অনুশোচনা করে। কোরান তাকে অধিকার ও সুযোগ দিয়েছে ওই দুমাসের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করার কিন্তু তাৎক্ষণিক তালাকে পুনর্বিবেচনার সুযোগ নেই। এ আইন স্বামীর কোরান-প্রদত্ত অধিকার হরণ করে। ফলে সন্তান ও নারীর জীবনের ক্ষতি হয়, ইসলামের বদনাম হয়।

(গ) সূরা ত্বালাক আয়াত ২ অনুযায়ী তালাক বৈধ হতে দুইজন সাক্ষীর দরকার, যা প্রায়ই তাৎক্ষণিক তালাকের ক্ষেত্রে থাকে না। হাদিসেও আছে সাক্ষী ছাড়া তালাক অবৈধ–সুনান আবু দাউদ হাদিস ২১৮১। অথচ শারিয়া আইনে কী আছে দেখে নিন নিচে শারিয়া আইন অংশে।

২. রাসুল (সা.) কী বলেন

এ ব্যাপারে আমরা সহি সিত্তার ভেতরে থাকব, সেখানে পরস্পর-বিরোধী হাদিস আছে।

- **তিন তালাকের বিপক্ষে হাদিস**

(ক) সহি মুসলিম হাদিস ৩৪৯২- "আবু সাহবা ইবনে আব্বাসকে (রা.) বলিলেন, 'আপনি কি জানেন যে আল্লাহর রাসুলের (সা.) সময়ে, হজরত আবু বকরের (রা.) সময়ে এবং হজরত ওমরের (রা.) প্রথম তিন বছরের খেলাফতকালে তাৎক্ষণিক তিন তালাককে এক তালাক ধরা হতো?' ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, 'হ্যাঁ'।"

এই একই হাদিস আছে সহি মুসলিম ৩৪৯১ ও ৩৪৯৩ ও সুনান আবু দাউদেও–হাদিস ২১৯৪। সর্বপ্রথম তিন তালাকে পুরো তালাকের বিধান চালু করেন। দলিলে আমরা পাই হজরত ওমর (রা.) তিন তালাক দেনেওয়ালা স্বামীকে ৪০ বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়েছেন অথচ সেই শাস্তি শারিয়া আইন দেখি না।

(খ) "এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক একসাথে দিয়েছে শুনে রাসুল (সা.) রাগে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঠাট্টা করছ? অথচ আমি এখনও তোমাদের মধ্যেই রয়েছি!" –মওলানা মুহিউদ্দিনের অনূদিত বাংলা-কোরান পৃষ্ঠা ১২৭।

(গ) "এক সাহাবি তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক বলেছে শুনে রাসুল (সা.) বললেন, 'এই তিন তালাক মিলে হলো এক তালাক। ইচ্ছে হলে এই তালাক বাতিল করতে পারো"।–মওলানা ওয়াহিদুদ্দিনের 'Women in Islami Sharia'তে ফতহুল বারীর সূত্রে, পৃষ্ঠা ১০৮ ও ১০৯।

- **তিন তালাকের পক্ষে হাদিস:**

(ঘ) "একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যদিও রাসুলের (সা.) অসন্তুষ্টির কারণ, যা পূর্ববর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এ জন্য সমগ্র উম্মত একবাক্যে একে নিকৃষ্ট পন্থা বলে উল্লেখ করেছে এবং কেউ কেউ নাজায়েজও বলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ এ পদক্ষেপ নেয়,

তবে এর ফলাফলও তাই হবে বৈধ পথে অগ্রসর হলে যা হয়। অর্থাৎ তিন তালাক হয়ে যাবে, এবং শুধু প্রত্যাহার নয়, বিবাহবন্ধন নবায়নের সুযোগও আর থাকবে না।" (সহি হাদিসের সূত্রে মওলানা মুহিউদ্দিনের অনূদিত বাংলা-কোরানের তফসির, পৃষ্ঠা ১২৭-১২৯)

(ঙ) "রাসুল (সা.) এরশাদ করেছেন তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, হাসি-তামাশার মাধ্যমে করা ও বাস্তবে করা দুই-ই সমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তালাক... হাসি-ঠাট্টার ছলে হলেও এবং অন্তরে বিয়ে, তালাক ও তালাক-প্রত্যাহারের ইচ্ছা না থাকলেও মুখের কথা দ্বারা বিয়ে, তালাক এবং প্রত্যাহার বাস্তবায়িত হয়ে যাবে... জবরদস্তি অবস্থায় যদিও সে তালাক দিতে আন্তরিকভাবে সম্মত ছিল না, অক্ষম হয়ে তালাক শব্দ বলে দিয়েছে, তবুও তালাক হয়ে যাবে।" (সহি হাদিসের সূত্রে মওলানা মুহিউদ্দিনের অনূদিত বাংলা-কোরানের তফসির, পৃষ্ঠা ১২৮ ও ৭৫৮) ।

আমরা তিন তালাকের বিপক্ষের হাদিসগুলোই মানব কারণ সেগুলো কোরানের বিধান ও নারীর অধিকার রক্ষা করে। আমাদের বুঝতে হবে স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক না-ও দেয়, তবু তার সেই অধিকারটাই স্ত্রীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস।

(৩) ইসলামি বিশেষজ্ঞেরা কী বলেন

শরিয়ার তাৎক্ষণিক তালাকের এ আইনের নাম "বিদাতি তালাক", এটা বানানো হয়েছে নবীজির (সা.) অনেক পরে। এ আইন ইসলামবিরোধী সেকথা বলেছেন অনেক বিখ্যাত শরিয়া সমর্থক আলেমই। যেমন:

(ক) বিশ্বের সর্বোচ্চ আলেমদের অন্যতম ডক্টর ইউসুফ কারযাভী বলেন, "একই সময়ে এক এক করে তিন তালাক কিংবা এক বাক্যে তিন তালাক দেয় তবে তা শরিয়ত প্রদত্ত নিয়ম ও পন্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী হবে। সে লোক হেদায়েতের পথ ত্যাগ করে গুমরাহীর পথ অবলম্বন করে চলেছে, সিরাতুল মুস্তাকিমকে সে হারিয়ে ফেলেছে। সহিহ হাদিসে বলা হয়েছে, রাসুলে করিম (সা.) জানতে পারলেন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়েছেন। তিনি ক্রোধে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন–'আমি

তোমাদের মধ্যে বর্তমান অবস্থায়ই এ লোকটি আল্লাহর কিতাব নিয়ে তামাশা খেলছে'?–"ইসলামে হালাল-হারামের বিধান"–পৃষ্ঠা ৩০০।

(খ) ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, "আহলে হাদিস" আন্দোলন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও আমির বলেন: "কুরআন-হাদিসে বর্ণিত উপরোক্ত তালাক বিধানকে 'সুন্নতি তালাক' ও আবিষ্কৃত একত্রিত তিন-তালাককে 'বেদ'ঈ তালাক' নামে অভিহিত করা হয়েছে... অথচ মুসলমান 'সুন্নত' মানতে পারে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই 'বিদ'আত' মানতে পারে না।... বিদ'আতের একমাত্র পরিণাম জাহান্নাম...অথচ বিদ'আতি তালাককে আইনসিদ্ধ করার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে গোনাহের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে... যার সরাসরি ও অসহায় শিকার হচ্ছে এদেশের সরল-সিধা মুসলিম নারী সমাজ"–"তালাক ও তাহলীল"–পৃষ্ঠা ৯ ও ১০।

(গ) ভারতের বর্ষীয়ান আলেম মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন বলেন–"নবীজি (সা.) থেকে শুরু করে হজরত আবু বকর (রা.) ও হজরত ওমরের (রা.) সময় পর্যন্ত একসাথে তিন তালাক উচ্চারণকে এক তালাক ধরা হতো... হজরত ওমর একসাথে তিন তালাক বৈধ করেন এবং এই আইন চালু করেন।"–"Women in Islami শরিয়া" পৃষ্ঠা ১১০)।

(ঘ) বিশ্ববিখ্যাত শারিয়াবিদ ড. আবদুর রহমান ডোই বলেন–"নবীজির মৃত্যুর বহু পরে তালাকের এক নতুন নিয়ম দেখা যায়। স্বামী একসাথে তিন তালাক উচ্চারণ করে বা লিখিয়া দেয়। এই তালাকে অনুতাপ বা পুনর্বিবেচনার সুযোগ নাই। অজ্ঞ মুসলমানেরা এইভাবে গুনাহ্ করে। নবীজি তীব্রভাবে ইহাতে বাধা দিয়াছেন"–'শরিয়া দি ইসলামিক ল', পৃষ্ঠা ১৭৯।

অন্য গবেষকেরাও এর ওপরে বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ কাজ করেছেন যেমন "তিন তালাক–নিকাহ ও হালালা"–লিখেছেন মো. শহিদুল ইসলাম। নিবন্ধটা ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। তিন তালাকবিরোধী আলেমরা আরো সোচ্চার হলে এ ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টি হবে।

এবারে দেখা যাক ইসলামে নারীর সেই অধিকার কীভাবে হরণ করা

হয়েছিল।

(৪) শারিয়া আইন

শারিয়ার সবগুলো আইন যোগ করলে আমরা এগুলো পাই:

(ক) "স্বামী তাহার স্ত্রীকে একই সময়ে একই বাক্যে অথবা পৃথক পৃথক সময় ও বাক্যে তিন তালাক দিলে তৎক্ষণাৎ বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় এবং স্বামী তাহাকে ফিরাইয়া লইতে পারে না... (স্বামীর) সুস্পষ্ট বাক্যে অথবা পরোক্ষ বক্তব্যে অথবা ইশারা-ইঙ্গিতে অথবা লিখিতভাবে প্রদত্ত তালাক সংঘটিত হইবে... তালাক বলার সময় স্বামীর মনের যে সংখ্যা নির্ধারিত করে তাহা বা দেখানো আঙুল দিয়া তালাকের সংখ্যা ধরা যায়... যদি স্বামী বলে তোমাকে তালাক দিলাম, তবে বলিবার সময় স্বামীর মনে যে সংখ্যা থাকে তাহাই বলবৎ হইবে"।

সূত্র: বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড ধারা ৩৪৩ ও ৩৫১, হানাফি আইন হেদায়া পৃষ্ঠা ৮১; শাফি'ই আইন উমদাত আল সালিক আইন নং এন.৩.৫।

ওপরের সূত্রগুলোর সাথে যদি আমরা নিচের শারিয়া কিতাবগুলো যোগ করি তাহলে এসব আইন পাই: স্বামী যদি অত্যাচারের চাপে, নেশার ঘোরে, রোগের কষ্টে অধীর হয়ে, হাসি-ঠাট্টায়, নোট লিখে বা টেলিফোনের অ্যান্সারিং মেশিনেও তালাক বলে রাখে তবু তালাক পুরো হয়ে যায়।

সূত্র: মওলানা মুহিউদ্দীনের বাংলা-কোরানের তফসির পৃষ্ঠা ১২৮; মওলানা আশরাফ আলী থানভীর 'দ্বীন কি বাতে' পৃষ্ঠা ২৫৪, আইন # ১৫৩৭, ১৫৩৮, ১৫৪৬ ও ২৫৫৫; ইউরোপিয়ান ফতোয়া কাউন্সিল ও কানাডার মওলানার ফতোয়া, বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড ধারা ৩৪৭ ও ৩৪৯; মকসুদুল মুমেনিন ইত্যাদি।

(খ) সূরা ত্বালাক আয়াত ২ অনুযায়ী তালাক বৈধ হতে দুইজন সাক্ষীর দরকার যা প্রায়ই তাৎক্ষণিক তালাকের ক্ষেত্রে থাকে না। হাদিসেও আছে সাক্ষী ছাড়া তালাক অবৈধ–সুনান আবু দাউদ হাদিস ২১৮১। অথচ শারিয়া আইনে আছে:

(১) "তালাক সংঘটিত হওয়ার জন্য সাক্ষী শর্ত নহে"–বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত "বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন" ১ম খণ্ড ধারা ৩৪৪,

(২) "বিয়ে ব্যতীত অন্য সব ব্যাপার সমাধা করার জন্য সাক্ষী শর্ত নয়"—মওলানা মুহিউদ্দিনের অনূদিত বাংলা-কোরানের তফসির, পৃষ্ঠা ১২৪)

(গ) কোরান বলছে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে হবে (বাকারা ২৪১) কিন্তু শারিয়া আইনের কারণে তাৎক্ষণিক তালাকে স্ত্রীর ভরণপোষণ আদায় করা অসম্ভব। আইনটা হলোঃ

(১) "স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর জিম্মায় ওয়াজিব (বাধ্য), তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ—আহার, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশি কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ, অপরিহার্য নয়"—মুহিউদ্দীন খানের অনূদিত বাংলা কোরান পৃ. ৮৬৭।

(২) "খাবার, বাসস্থান ও পোশাক দিতে স্বামী বাধ্য থাকিবে শুধুমাত্র বাধ্য স্ত্রীকে, অবাধ্য স্ত্রীকে নহে। ইহার বাহিরে সমস্ত খরচ এমনকি ডাক্তারের, ওষুধের বা সৌন্দর্য-চর্চার খরচ ইত্যাদি হইবে স্বামীর করুণা ও দয়া"—হানাফি আইন হেদায়া পৃঃ ১৪০; শাফি'ই আইন উমদাত আল সালিক আইন #স.১১.৪.

অর্থাৎ, স্বামী ওই আইনের বলে তাকে "অবাধ্য স্ত্রী" দাবি করে খরচ দেবে না।

(ঘ) শারিয়া আইনে বলে এক বা দুই তালাক দেবার পরে স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে, "স্ত্রীর সম্মতি থাকুক বা না থাকুক"—বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড ধারা ৩৫২। এ আইন সরাসরি লঙ্ঘন করে কোরান (নিসা ১৯) ও রাসুল (সা.)-এর হুকুম, নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা যাবে না। এ বিষয়ে অন্য নিবন্ধে বিস্তারিত লিখব।

(৫) কালতামামী

বাংলাদেশ সহ অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে তাৎক্ষণিক তালাক নিষিদ্ধ। কিন্তু এটা যে কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেকও অবৈধ, সে ব্যাপারে

দেশে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়নি, করা দরকার। যে আইন প্রতিটি বিবাহিতা মুসলিম নারীকে স্বামীর ইচ্ছের অধীন করে রাখে, যে আইনে মুসলিম নারীর জীবন সন্তান-সংসার ধ্বংস হয় ও ইসলামের বদনাম হয় সে আইন কি ইসলামি হতে পারে? সরকারের উচিত অনতিবিলম্বে এইসব অমানবিক ব্যাখ্যার ব্যাপারে জাতিকে সচেতন করা এবং মুসলিম বিশেষজ্ঞদের লেখা ইসলামের মানবিক ব্যাখ্যার বইগুলো প্রচার করা। যে নারীকে তাৎক্ষণিক তালাকের মধ্যে পড়ে পর-পুরুষ দ্বারা ধর্ষিতা হতে হয় তার অপমান, তার ক্ষোভ-দুঃখ কবে আমরা বুঝব? এ কোন ইসলাম যে নিরপরাধের জীবন এত নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করে?

কোষ্ঠকাঠিন্য কেবল পেটেই নয়,

বুদ্ধি ও বিবেকেও এই রোগটা হয়।

০২ আগষ্ট, ২০১৯

সমান উত্তরাধিকার : প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ও হজরত ওমরের (রা.) শাসন

> "তিনি রোববার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানিয়ে পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের সমান অধিকার নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্যও সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানিয়েছেন"–ভয়েস অব আমেরিকা ২৮ এপ্রিল, ২০১৯।
>
> (সরাসরি এ কথা প্রধানমন্ত্রী বলেননি। তিনি বলেছেন, 'মেয়েদের যে অধিকারটুকু সম্পদের সেখানেও অন্য কেউ এসে কেড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। শরিয়া আইনের দোহাই দিয়ে সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়। এর কোনো সুরাহা করা যায় কি না তা দেখতে হবে। যদি কারো দুই মেয়ে হয় তাহলে আইনের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়। তাই মেয়ে বা ছেলে না লিখে সন্তান লিখে দিলে, সেখানে সন্তান ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক তার অধিকারটুকু সে পাবে।'–সম্পাদক)

সে যা-ই হোক, সমান উত্তরাধিকার বা উত্তরাধিকার আইনটি সংস্কারের প্রস্তাবটা যতবারই উঠেছে আলেম সমাজ এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছেন সুরা নিসা ১১ ও ১৭৬ আয়াতের ভিত্তিতে যেখানে কন্যাকে অর্ধেক উত্তরাধিকার দেওয়া আছে। তাদের দাবি, কোরান-রাসুলের (সা.) কোনও আইন বিন্দুমাত্র বদলানো যাবে না। এদিকে বিশ্ববরেণ্য অনেক ইসলামি বিশেষজ্ঞ দেখিয়েছেন কোরান-রসূলের (সা.) কিছু হুকুম শাশ্বত এবং কিছু হুকুম শুধু সেই সমাজের জন্য। পরিবর্তিত সমাজে সেগুলো প্রয়োগ করলে বিপর্যয় ঘটবে। সেজন্যই ১৪০০ বছরে মুসলিম নেতৃত্ব বাইরের কোনো চাপ ছাড়া নিজেরাই সেগুলোকে সমাজ বদলের সাথে সাথে ক্রমাগত পরিবর্তন করেছেন। এর অগ্রপথিক হলেন হজরত ওমর (রা.)। কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি বিশ্ববরেণ্য ইসলামি বিশেষজ্ঞ থেকে, জানি না মাদ্রাসায় এগুলো পড়ানো হয় কি না। কেউ চাইলে কেতাবগুলোর পৃষ্ঠাগুলোর স্ক্যান পাঠানো যেতে পারে।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ শারিয়া-বিশেষজ্ঞের একজন ড. হাশিম কামালি। তিনি বলেছেন, "নবী (সা.)-এর সময়েই কোরান ও সুন্নাহ-তে কিছু সম্পূর্ণ

ও কিছু আংশিক পরিবর্তন করা হয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনই ইহার মূল কারণ"। তাঁর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ 'প্রিন্সিপালস অব ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স' এ এমনটাই বলেছেন ড. কামালি।

যেমন, (ক) "ইবনে উমর এই আয়াত পড়িত–'তাহাদের সুযোগ ছিল রোজা রাখা অথবা কোনো দরিদ্রকে প্রতিদিন খাওয়ানো' এবং বলিয়াছে এই আয়াতের আদেশ রহিত করা হয়–বুখারি ৩য় খণ্ড ১৭০। (খ) "বার মাউনাতে যাহারা নিহত হইয়াছিল তাহাদের উপর নাজেলকৃত আয়াতটি আমরা পড়িতাম কিন্তু পরে তাহা বাতিল করা হয়" - বুখারি ৪র্থ খণ্ড ৬৯। (গ) নবীজির সাথে একান্তে কথা বলতে হলে কিছু সদকা দিতে হবে এ আয়াতও আল্লাহ পরে রহিত করেন–মুহিউদ্দিন খানের অনূদিত বাংলা-কোরান পৃষ্ঠা ১৩৪৭।

পরের পরিবর্তনগুলো অনেক, কিছু উদাহরণ দিচ্ছি:

১. অমুসলিমদের ওপরে জিজিয়া কর–সুরা তওবা ২৯।

আয়াতটা স্পষ্ট, এতে কোনও শর্ত নেই, পরিমাণও দেয়া নেই। রাসুল (সা.) নিজেই জিজিয়া কর নিতেন। কিন্তু হজরত ওমর (রা.) বিভিন্ন কারণে কিছু ব্যক্তি ও ইরানের এক গোত্রের কাছ থেকে জিজিয়া কর নেননি। তিনি নারী, শিশু, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ ও যাজকদের কাছ থেকেও জিজিয়া নেয়া বন্ধ করে দেন–বিস্তারিত দেখুন মুহিউদ্দিন খানের অনূদিত বাংলা-কোরান, পৃষ্ঠা ৫৬৭।

অন্যান্য সূত্রে আমরা দেখি এমনকি এক মুসলিম গোত্রের কাছ থেকেও তিনি জিজিয়া কর নিয়েছেন। আরও দেখুন–

"সামরিক চাকরি হইতে রেহাই দিবার জন্য সক্ষম মুসলিম পুরুষদের উপর জিজিয়া ধার্য করা হইয়াছিল। খ্রিস্টান গোত্র আল্ জুরাজিমাহ-কে এই চুক্তিতে জিজিয়া হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল যে তাহারা মুসলিমদিগের সহিত যোগ দিয়া যুদ্ধ করিবে ও গণিমতের অংশীদার হইবে"–'ইসলাম দ্য মিস্আন্ডারস্টুড রিলিজিয়ন', বিশ্ববিখ্যাত শারিয়া-নেতা সৈয়দ কুতুব।

উসমানীয় খেলাফত ১৯শ শতকে জিজিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। সুরা তওবা আয়াত ৬০-এর ভিত্তিতে নবীজি (সা.) মুয়ালাফা গোত্রকে যে জাকাত দিতেন সেটাও হজরত ওমর (রা.) বন্ধ করে দেন–ড. হাশিম কামালি, পৃ. ২০৩।

এগুলোকে কি আমরা কোরান-রাসুলের (সা.) লঙ্ঘন বলব? মোটেই নয়। কারণ যে মঙ্গলের জন্য বিধানগুলো এসেছিল তা আর সম্ভব হচ্ছে না সমাজ পরিবর্তনের ফলে। তাই বিধানগুলোর পরিবর্তনে সমাজের মঙ্গল হয়েছে যেজন্য বিধানগুলো এসেছিল।

২. চোরের হাত কেটে দিতে হবে–মায়েদা ৩৮–কোনো শর্তের উল্লেখ নেই।

কিন্তু হজরত ওমর (রা.) দুর্ভিক্ষের সময় চোরের হাত কাটা বন্ধ করেছিলেন–ড. হাশিম কামালি, পৃ. ৩২৫। ইমাম শাফি-কে যখন প্রশ্ন করা হলো চুরি প্রমাণিত হলে চোরের হাত কাটা বাধ্যতামূলক কি না, তিনি জবাব দিয়েছিলেন–"হ্যাঁ, সঠিক"–'আল শাফি'স রিসালা' পৃষ্ঠা ২৯০, অনুবাদ ড. মজিদ খাদ্দুরী।

ইমাম শাফি কোনো শর্ত বা পরিমাণের উল্লেখ করেননি। শতাব্দী ধরে আলেমরা এতে অনেক শর্ত যোগ করেছেন। যেমন– চুরির জিনিস এক-চতুর্থাংশ স্বর্ণমুদ্রা বা তিন রৌপ্যমুদ্রা বা ওই মূল্যের কিছু বা সফরের সময়ে চুরি হলে শাস্তি প্রয়োগ হবে না ইত্যাদি। এসব পরিবর্তনের একমাত্র কারণ পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সমাজ। মুসলিম নেতৃত্ব বহু আগেই চোরের হাত কাটা বন্ধ করেছেন।

৩. মুসলিম পুরুষদেরকে অনুমতি দেয়া হলো ইহুদি-খ্রিস্টান নারীকে বিয়ে করার–মায়েদা ৫। কিন্তু হজরত ওমর (রা.) বিশেষ ক্ষেত্রে ইহুদি-খ্রিস্টান নারীকে বিয়ে করা বন্ধ করেছেন– ড. হাশিম কামালি, পৃঃ ৩২৫।

হাদিসেও আছে অনেক, যেমন: "আলী ইবনে আবু তালিব বলিয়াছেন–মদ্যপানের জন্য আল্লাহ'র রাসুল (সা.) এবং আবু বকর (রা.) চল্লিশ বেত্রাঘাত দিয়াছেন এবং ওমর (রা.) তাহা আশি করেন"–সহি আবু

দাউদ হাদিস নং ৪৪৬৬। নবীজির (সা.) সময়ের তামাত্তু হজের পদ্ধতিও বদল করেছেন হজরত ওসমান (র)- সহি বুখারি ২য় খণ্ড হাদিস ৬৩৪।

নবীজি (সা.) পরের নেতা জনগণের ইচ্ছের ওপর ছেড়ে গিয়েছিলেন, হজরত আবু বকর (রা.) রাসুলের অনুকরণ না করে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হজরত ওমরকে (রা.)। হজরত ওমরও (রা.) রাসুলের (সা.) অনুকরণ না করে ছয়জনের কমিটি বানিয়ে তার ওপর ভার দিয়েছিলেন ওই কমিটির ভেতর থেকেই পরের খলিফা ঠিক করতে। সমাজ বদলের সাথে কোরান-রাসুলের (সা.) কিছু বিধানের এই পরিবর্তনে সমাজের স্থিরতা বজায় ছিল ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

মওলানা মওদুদি বলেছেন–"বিভিন্ন পয়গম্বরের প্রচারিত বেহেশতি কেতাবে নির্দেশিত ইবাদতের পদ্ধতিতে, হালাল-হারামের বিধানগুলিতে ও সামাজিক আইনগুলির বিস্তারিত কাঠামোতে ভিন্নতা আছে কেন? (কারণ) স্বয়ং আল্লাহ বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াইবার জন্য আইনের ধারা বদলাইয়াছেন"–(It is God Himself Who altered the legal prescriptions to suit different nations at different times and in different circumstances) –তাফহিমুল কুরান, মায়েদা ৪৮-এর ব্যাখ্যা। গত ১৪০০ বছরে সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তাই কোরানের উত্তরাধিকার বিধানও বিদ্যমান পরিস্থিতি অনুযায়ী সংশোধন করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

"আমি কোন আয়াত রহিত করিলে বা ভুলাইয়া দিলে তাহা অপেক্ষা উত্তম বা সমপর্যায়ের আয়াত আনি"–বাকারা ১০৬ এবং "যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত আনি এবং আল্লাহ যা নাজিল করেন তা তিনিই ভালো জানেন"–নাহল আয়াত ১০১। একে বলে নখ্স্। এর মধ্যেই নিহিত আছে ইসলামের গতিময়তা, এজন্যই ইসলাম চির-আধুনিক।

ড. কামালি বলেছেন, "মানুষের উপকারের জন্য সমাজের বিদ্যমান পটভূমি ও আইনের সমন্বয় করার প্রয়োজনে নখ্স্ আসিয়াছে। কোরান ও হাদিসে নখ্স্-এর সর্বপ্রধান কারণ হইল স্থান-কালের বিষয়টি–নবী (সা.)-এর

সময়েই কোরান ও সুন্নাহ-তে কিছু সম্পূর্ণ ও কিছু আংশিক পরিবর্তন করা হয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনই ইহার মূল কারণ।”–প্রিন্সিপালস অব ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স। এই গতিময়তার কারণেই কোরান-রাসুলের (সা.) অনেক নির্দেশ এখন মওলানারাও হয় মানবেন না বা ইচ্ছে করলেও মানতে পারবেন না যেমন রাসুলের সামনে উঁচু গলায় কথা না বলা (হুজরাত ২), দাসীসংসর্গ (মুমিনুন ৫, ৬), সম্মানিত মাসে যুদ্ধ (বাকারা ২১৭), উটের মূত্র পান করা (বুখারি ৮ম খণ্ড ৭৯৭) ইত্যাদি।

মওলানা মুহিউদ্দিনের কোরানের অনুবাদেও এটা আছে ৩৩৪ ও ৫৩ পৃষ্ঠায়- “নাসিখ ও মনসুখের অবস্থা একজন বিজ্ঞ হাকিম ও ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মতো। ডাক্তার যখন পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপত্র রহিত করে নতুন ব্যবস্থাপত্র দেন তখন এরূপ বলা ঠিক নয় যে পূর্বের ব্যবস্থাপত্রটি ভুল ছিল। বরং আসল সত্য হচ্ছে এই যে, বিগত দিনগুলোতে সে ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরি ছিল এবং পরবর্তী পরিবর্তিত অবস্থায় পরবর্তী পরিবর্তিত এ ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরি”।

৪. কোনো কোনো পরিস্থিতিতে কোরান অনুযায়ী মৃতের কে কে কী কী উত্তরাধিকার পাবে সেই চিত্রগুলো উল্লেখ করে অনেকে দেখান যে সবগুলো পরিস্থিতি একত্রে দেখলে নারীরাই বেশি পান। কাগজের হিসেবে অঙ্কটা ঠিক। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে নারীরা বেশি পান সেগুলো প্রায় ঘটেই না, প্রায় ১০০ শতাংশ ক্ষেত্রেই মৃতের পুত্রকন্যা ও স্ত্রী বা স্বামী থাকে যেখানে কন্যারা অর্ধেক পায়।

৫. স্বামীর ভরণপোষণের দায়িত্বের যুক্তিটা সর্বগ্রাসী বেকারত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদির ঝড়ে উড়ে গেছে সেই কবে! আর, শারিয়া আইনে সেই দায়িত্ব হলো–“স্বামী খাবার, বাসা ও পোশাক দিবে বাধ্য স্ত্রীকে, অবাধ্য স্ত্রীকে নহে। বাচ্চা হইবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ডাক্তার-ওষুধের খরচ বা সাবান-প্রসাধন কিংবা অর্থ দিতে স্বামী বাধ্য নহে”–(হানাফি আইন হেদায়া পৃষ্ঠা ১৪০ ও শাফি' আইন এম-১১-৪)। বলা বাহুল্য স্ত্রী বাধ্য কিনা তা কিন্তু ঠিক করবে ওই স্বামীই। মুহিউদ্দিন খান অনূদিত কোরান পৃষ্ঠা ৮৬৭–“স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর

জিম্মায় ওয়াজিব, তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ–আহার, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশি কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ, অপরিহার্য নয়"।

এসব আইন 'ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছে' এ দাবি নস্যাৎ করে ফেলে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী খোরপোশ পাবে তিন মাস, তাৎক্ষণিক তালাকে খোরপোশের কোনো বালাই-ই নেই। তারপর সে কী খাবে, পরবে তার হদিস নেই; তার সম্ভাব্য গন্তব্য পতিতালয়। এইসব কারণে নারীকে আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করার দরকার আছে।

৬. স্ত্রীর মোহরানা তার রক্ষাকবচ হলে ভালো হতো কিন্তু শারিয়া আইনে দেনমোহর টাকা ছাড়াও হতে পারে একজোড়া জুতো বা কোরান থেকে কিছু তেলাওয়াত–শারিয়া দি ইসলামিক ল' পৃষ্ঠা ১৬৩, ১৬৪ ও বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৯৭৬, বুখারি ৭ম খণ্ড ২৪ ও তিরমিজি ৯৫১। তাছাড়া নারীর সারাজীবনের খরচ চালাবার মতো দেনমোহর কমই ধার্য করা হয়, নারী তা কম ক্ষেত্রেই পায়।

৫. সুরা নিসা আয়াত ১১ অবতীর্ণ হয় সাহাবি আউস বিন সাবেত নাবালক এক পুত্র ও বালেগ দুই কন্যা রেখে মারা গেলে–মওলানা মুহিউদ্দিনের অনূদিত কোরান পৃষ্ঠা ২৩৪। আইন দুর্বলকে অগ্রাধিকার দেবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্বের সব মুসলিম পুরুষ নাবালক নয়, তাই আয়াতটাকে সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। নিসা ১৭৬-এর পটভূমি ইমাম ওয়াহিদি'র "আসবাব আল নুযুল" কিতাবেও পেলাম না, কেউ জানালে বাধিত হব।

অতীতের গোত্র-ভিত্তিক পারিবারিক কাঠামো পার হয়ে একান্নবর্তী কাঠামোতে বহু সদস্যের কারণে নারীর কিছুটা হলেও সাহায্যকারী ছিল। বর্তমানের একক পরিবারে সেটা নেই, নারীর ওপর আজ বহু দায়িত্ব। দুজনের আয় ছাড়া সংসার চলে না, বাচ্চাদের শিক্ষার খরচ জোটে না। বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মায়ের যত্নও কন্যারা পুত্রের চেয়ে কম নেয় না। তাই তার আর্থিক শক্তির দরকার আছে। দায়িত্ব থাকবে অথচ অধিকার থ াকবে না তা হয়না। রাসুলের (সা.) পরে পরেই সমাজকল্যাণের কারণে

কোরান-রাসুলের (সা.) তাৎক্ষণিক কিছু বিধানকে যদি হজরত ওমর (রা.) পরিবর্তন করতে পারেন, তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যদি ৯৮ শতাংশ মুসলিমের দেশ তিউনিশিয়ার আলেমদের সহায়তায় সরকার সমান উত্তরাধিকারের আইন করতে পারে, তাহলে সেটা আমাদের সরকার ও আলেমরাও পারবেন।

২ মে, ২০১৯

বিশ্ব বেকুব দিবসঃ ১ এপ্রিল নাকি ২২ জুন?

"১ এপ্রিল মুসলিম গণহত্যার মর্মান্তিক ইতিহাস এপ্রিল ফুল পালন থেকে বিরত থাকুন–বিভিন্ন ইসলামি নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, ১৪৯২ সালের 'পহেলা এপ্রিলে' রাণি ইসাবেলা কর্তৃক মুসলমানদের চরম ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে ঘোষণা দিয়ে বলে যদি বাঁচতে চাও কর্ডোভার জামে মসজিদে সমবেত হলে প্রাণভিক্ষা দেয়া হবে। অতঃপর এই বলে সম্মিলিত হাজার হাজার আলেম-উলামা, সাধারণ মুসলমান, নারী-শিশু, বৃদ্ধ ও নিরীহ নাগরিক মসজিদে অবস্থান নিলে তাদেরকে অগ্নিসংযোগ করে পৈশাচিকভাবে হত্যা করা হয়। একইভাবে প্রতারণার মাধ্যমে জাহাজে চড়িয়ে আগুন লাগিয়ে হত্যা করা হয়। খৃষ্ট জগতে বা মুসলিমবিদ্বেষী খৃষ্টান রাজ-রাণির এ আনন্দঘন পৈশাচিকতার ঐতিহাসিক স্মারক দিবসই হচ্ছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 'এপ্রিল ফুল'।

আচ্ছা ! সত্যি সত্যিই কি তাই?

কর্ডোভা ছিল স্পেনে মুসলিম খেলাফতের রাজধানী। শেষ খলিফা আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ১২ (স্প্যানিশ নাম বোয়াবদিল) ছিলেন আফ্রিকার মুর গোত্রের লোক। তিনি যুদ্ধে পরাজয়ের পরে রানি ইসাবেলা ও তার স্বামী রাজা ফার্ডিনান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ১৪৯২ সালের ২ জানুয়ারি। প্রতিটি ইতিহাস বইতে এ ঘটনাটা বিখ্যাত হয়ে আছে 'দি লাস্ট সাই অব দি মুর' অর্থাৎ 'মুর-এর শেষ দীর্ঘশ্বাস' নামে। পরাজয়ের পর তিনি স্পেন ছেড়ে যাবার পথে কর্ডোভার দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন, তাই এ নাম।

কেউ কেউ বলেন মুসলিম নিধনের সময় রাজা ফার্ডিনান্ড ও তার স্ত্রী ইসাবেলা আনন্দ করে বলেছিলেন "ওহ মুসলিমস! হাউ ফুল ইউ আর" অর্থাৎ "ওহ মুসলিমস, তোমরা কী বেকুব"! দাবিটা কোন দলিল থেকে এলো জানি না তবে ঘটনাটা সত্যি হলেও হতে পারে। কারণ যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ সাধারণত পরাজিতদের ওপরে অত্যাচার করে, মশকরা করে। রানি

ইসাবেলা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন, তিনি লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে হত্যা ও স্পেন থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, সবই আছে পশ্চিমা গবেষকদেরই লেখা ইতিহাসে।

কিন্তু কর্ডোভায় মুসলিম জনতাকে প্রাণভিক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মসজিদে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে মারার মতো এতবড় ঘটনা কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বিজয়ীরা সাধারণত পরাজিতদের ওপরে প্রতিশোধ নেয়া বা ক্ষমা করা যাই হোক, করে থাকে বিজয়ের উত্তেজিত দিনেই, তিনমাস পরে নয়। যেমন নবীজি (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় (আটজনকে ছাড়া) সবার প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন বিজয়ের দিনেই, তিন মাস পরে নয়। তারপরেও, নিশ্চয় করে বলা না গেলেও, ঘটনাটা ঘটে থাকতে পারে। 'এপ্রিল ফুল' দিবস কোত্থেকে এলো, তার ওপরে বিশদ কাজ করেছেন পূর্ব-পশ্চিমের মুসলিম-অমুসলিম গবেষকেরা, এ ব্যাপারে অনেক থিওরি আছে কিন্তু নিঃসন্দেহ হওয়া যায়নি।

'এপ্রিল ফুল'-এর উৎস প্রশ্নবিদ্ধ। কিন্তু বেকুব বানাবার প্রমাণিত ঘটনা আছে ইতিহাসে। মধ্যপ্রাচ্যে একটি রাজবংশ ৬৬১ সাল থেকে ক্রমাগত ৮৯ বছর রাজত্ব করেছিল। তারপর তাদেরই সাথে রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় এক বিদ্রোহী দল বেশ কয়েকটা যুদ্ধের পর 'যাব' স্থানের যুদ্ধে সেই রাজবংশকে উচ্ছেদ করে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বিজয়ী দলের আশঙ্কা ছিল পরাজিত দলের আর কেউ আবার যুদ্ধ শুরু করে কিনা, কারণ সেই সময়ের আগে-পরে বহু বছর ধরে রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছাড়াও এই দলের বিরুদ্ধে ওই দলের আর ওই দলের বিরুদ্ধে অন্য দলের বহু যুদ্ধ, বিগ্রহ হচ্ছিল। তাই বিজয়ী রাজা তার ক্ষমতায় স্থিত হবার পর 'সমঝোতা'র জন্য পরাজিত রাজবংশের সবাইকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে এক ডিনার পার্টিতে আমন্ত্রণ জানান।

পরাজিত রাজবংশের ৮০ জন সদস্য উপস্থিত হলে তাদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করে সুবিশাল ডিনার হলে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে ডিনার টেবিলে প্রচুর সুস্বাদু খাদ্য সাজানো ছিল। ওদিকে পাশের ঘরে ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল অস্ত্রধারী ঘাতকের দল। পরাজিত রাজবংশের সবাই

খেতে বসার সাথে সাথে ইঙ্গিত পেয়ে ঘাতকের দল ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে কিছু বুঝবার আগেই নৃশংসভাবে তাদেরকে কচুকাটা করে। সেই হুলুস্থুলের মধ্যে মাত্র একজন পালাতে পেরেছিলেন।

সেই পরাজিত রাজবংশ উমাইয়াদ খলিফারা, সেই বিজয়ী বংশ আব্বাসীয় খলিফারা। দু'দলই মক্কার কুরাইশ বংশের দুই উপধারা। বোকা বানাবার এই নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা যে শহরে ঘটেছিল তার নাম আবু ফুর্টাস, মুসলিমের হাতে মুসলিম-গণহত্যার সেই মর্মান্তিক তারিখটা ছিল ২২ জুন, ৭৫০ সাল। যিনি পালাতে পেরেছিলেন তিনি আইবেরিয়ান উপদ্বীপ হয়ে স্পেনে চলে যান। তিনিই স্পেনের খেলাফতের বাদশাহ 'আল দাখিল' যাকে আমরা খলিফা আবদুর রহমান-১ বলে জানি।

তাহলে বিশ্ব-বেকুব দিবস কোনটা? প্রশ্নবিদ্ধ ১ এপ্রিল, নাকি প্রমাণিত ২২ জুন?

কিছু আলেম-মওলানা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যখনই আমরা আত্মসমালোচনার জন্য খেলাফত আমলে মুসলিম-মুসলিমে হানাহানি রক্তপাতের উদাহরণ দিই, যাতে আমরা সেই হিংস্রতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। তারা কি খেলাফত আমলে বিশ-বাইশটা "আমিরুল মুমেনিন" নামে রাজরাজড়ার মুসলিম-মুসলিমে ক্রমাগত হানাহানি রক্তপাতের ইতিহাস এড়িয়ে যেতে চান?

দুনিয়া হানাহানি-হিংস্রতায় ভরে গেছে। অতীতের সত্য-মিথ্যা, যত হিংস্রতা সেসব অতীতেই থাকুক, এখন কোনো ধর্মের কোনো ধর্মগুরু যেন সে আগুন আবার টেনে এনে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দগ্ধ না করেন। তারা যেন আমাদেরকে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা হানাহানি নয় বরং সহযোগিতায় অতীতের হিংস্রতা অতিক্রম করে যাবার পথ দেখান। তাহলেই আমরা সব ধর্মের সাধারণ মানুষেরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে এই সুন্দর গ্রহটা ভাগাভাগি করে বাঁচতে পারব। দেশে কিছু ইসলামি বক্তার হিংস্র হুংকার ইসলামের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তারা ব্যর্থ করেছেন কোরানের হুকুম–"ধর্মে বাড়াবাড়ি কোরো না"–সুরা মায়িদা ৭৭ ও নিসা ১৭১।

ক্রমাগত এতো হিংস্রতা প্রচার করার পরেও দেশে সবচেয়ে বেশি বাক-স্বাধীনতা তারাই ভোগ করেন, তাদের লাগাম টেনে ধরার কেউ নেই। অনতিবিলম্বে এটা বন্ধ হওয়া দরকার এবং দায়িত্বটা প্রধানত শান্তিকামী আলেমদেরই। পহেলা এপ্রিল এক খবরে দেখলাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছয়টি সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে আছে বক্তাদের আয়ের ওপর আয়কর বসানো এবং ওয়াজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট ও রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য প্রদানকারীদের আইনের আওতায় আনা। কিন্তু দায়িত্বটা শুধু সরকারের নয়, দায়িত্বটা শান্তিকামী আলেমদেরও, কারণ তারা দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠীর ওপরে প্রভাব রাখেন। আইনের এই নিয়ন্ত্রণ খুব দরকারি এবং মুসলিম বিশ্বে এটা নতুন কিছু নয়।

১. ওয়াজে খুতবায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের বিরুদ্ধে আইন করেছে আরব আমিরাত– সূত্রঃ আমেরিকা ও কানাডার প্রাচীনতম বাংলা পত্রিকা দেশে-বিদেশে, ২১ জুলাই ২০১৬।

২. সৌদি আরব আইন করেছে ওয়াজে খুতবায় রাজনীতি মেশানো যাবে না, বলেছেন ইসলামি-বিষয়ক মন্ত্রী সালেহ আল শেখ–এশিয়া নিউজ ১ এপ্রিল, ২০১৪।

৩. "ইমামদের ওপরে কুয়েত ও সৌদি আরব নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করছে ... কুয়েত সরকার ওয়াজগুলোকে পর্যবেক্ষণ (মনিটর) করছে, এক ইমামকে টিভিতে নিষিদ্ধ করেছে ও এক বিদেশি ইমামকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে"–রয়টার্স, ২৫ নভেম্বর ২০১৩।

ওটাই শান্তির পথ। ইসলাম যদি শান্তি হয়, তবে ওটাই সিরাতুল মুস্তাকিম।

৬ এপ্রিল, ২০১৯

দৈনিক ইনকিলাব ১ এপ্রিল, ২০১৯

নিউজিল্যান্ড: প্রতিশোধের করাত-চক্র ও 'বিদায় হজ'-এর ভাষণ

(প্রেক্ষাপট: ১৫ মার্চ ২০১৯ শুক্রবার ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসী ব্রেন্টন টারান্ট নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে আল নূর মসজিদ ও লিনউড মসজিদে ঢুকে নির্বিচারে গুলি করে। ৫০ জনকে খুন করেছিল। হামলার সময় সে মাথার হেলমেটে লাগানো ক্যামেরা চালু করে পুরো ঘটনাটি অনলাইনে সরাসরি সম্প্রচার করে।)

পর্বত-অরণ্য মরু-সমুদ্র, পশু-পাখি, মাছ মাছালি-গাছ গাছালির এই শতরূপে অপরূপা গ্রহে মানুষ চিরকাল কষ্ট পেয়েছে বন্যা, খরায়, ভূমিকম্প-সাইক্লোনে, রোগে-শোকে। কিন্তু মানুষের হাতেই মানুষ যে কষ্ট পেয়েছে তা অবর্ণনীয়, অকল্পনীয়। লক্ষ-কোটি নিহতের বীভৎস মৃতদেহ, সংখ্যাহীন বিধবা-এতিমের আর্তনাদ-হাহাকার, কোটি কোটি দগ্ধ-ধ্বংস বসতির দুঃসহ স্মৃতি বুকে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে মানুষের ইতিহাস।

এখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস। এখন 'ইসলাম-ভীতি', 'হোয়াইট সুপ্রিমেসি', 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব', 'ইউজফুল ইডিয়টস', 'ইসলামের শত্রু', 'ইসলাম বাঁচানেওয়ালা', 'রাইট ও লেফট উইং'... উথাল-পাথাল দুনিয়া। কোনটা মিথ্যে কোনটা সত্যি, কোন "সত্যি"র মধ্যে কী কী ভেজাল, কোন পক্ষের কে ও কারা কী মুখোশ পরে কী মতলবে কী করছে তা বুঝে ওঠা অসম্ভব। এই ধরনের সন্ত্রাস আগে ছিল স্থান-কালে সীমাবদ্ধ। এখন অরক্ষিত প্রতিটি দেশে প্রতিটি মানুষ তাদের বাড়ি বা হোটেল-দালানে, মিউজিক কনসার্টে, স্টেডিয়ামে, শিক্ষাঙ্গনে, রাস্তা-ঘাটে এমনকি উপাসনালয়েও। কেউ জানে না হঠাৎ কখন কোথায় নিরীহ মানুষের ওপরে উঠে পড়বে ঘাতক ট্রাক বা ছুটে আসবে ঘাতক বুলেট। এই দাবানল কি আদৌ বন্ধ হবে? নাকি শান্তির সময়টুকু আসলে পরবর্তী রক্তপাতের প্রস্তুতির সময়মাত্র?

সমস্যাটা অতিকায় এবং বহুমাত্রিক। মাঠে দৃশ্য-অদৃশ্য খেলোয়াড়ের দল,

টেবিলে দৃশ্য-অদৃশ্য তাসের ধূম্রপাহাড়, আকাশে-বাতাসে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের ঘূর্ণিঝড়। সেই সাথে মিডিয়ার তেলেসমাতি তো আছেই। ওদিকে আবার ইসলামিক স্টেট মুসলিম সন্ত্রাসীদের কিছু হামলার দায় স্বীকার করাতে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামভীতি বেড়েছে। বিশ্ব-মুসলিম নেতৃবৃন্দ বলেছেন ওটা ইসলাম নয় ওরা মুসলিম নয় কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হয়নি। ধোঁয়াশার এই উৎকণ্ঠায় একটুখানি স্বস্তির হাওয়া–নিউজিল্যান্ড পার্লামেন্টে কোরান তেলাওয়াত, প্রধানমন্ত্রীর মাথায় হিজাব, সংসদে তড়িৎগতিতে অস্ত্র-আইন পাস, দু'মিনিটের জন্য নীরব পুরো দেশ, রেডিও-টিভিতে জোহরের আজান, সন্ধ্যায় পার্কে প্রদীপ প্রজ্জলন, জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা, দেশজুড়ে পশ্চিমা হিজাবি নারীরা, দেশে দেশে অমুসলিমরা মুসল্লিদের নামাজ পাহারা ইত্যাদি ইত্যাদি...।

স্যালিউট !

কিন্তু !!!

এখানে এসেই আত্মসমালোচনা করাটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। দেশ-বিদেশের বহু মওলানার বক্তব্যে কাউকে উল্লেখ করতে শুনলাম না মুসলিম সন্ত্রাসীদের হাতে পশ্চিমা বিশ্বে আহত-নিহতদের প্রতি সমবেদনা, নাইজেরিয়া, মিসর, ইন্দোনেশিয়ায় শত শত চার্চ ভাঙা ও হাজার হাজার খৃষ্টানদের হত্যা, সৌদির আক্রমণে ইয়েমেনের কোটি মানুষের ভয়াবহ ধ্বংস, দুর্ভিক্ষে অসংখ্য শিশুর আসন্ন মৃত্যু। বাংলাদেশেও অমুসলিমদের ওপর শত শত অত্যাচার, সম্পত্তি উপাসনালয় ভাঙা হয়েছে কিন্তু সমবেদনায় ছুটে যাননি কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতা। সভ্য-অসভ্যের এই লক্ষ্মণরেখা দুনিয়ার নাকের ডগায় তুলে ধরা আছে তা আমরা মুখে বলি বা না বলি।

অনেক দেশে সন্ত্রাসীরা ধরা পড়েছে এবং আদালতে আইন অনুযায়ী তাদের শাস্তি হয়েছে, হচ্ছে, হবে। আত্মসমালোচনায় এসে পড়ে সংশ্লিষ্ট শারিয়া আইনটাও। আইনটা এতই সুস্পষ্ট যে তার মধ্যে "এর মানে ওই আর ওর মানে তাই" করে পানি ঘোলা করার সুযোগ নেই। উদ্ধৃতি দিচ্ছি বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত ৩ খণ্ডের "বিধিবদ্ধ ইসলামী

আইন" থেকে, কেউ চাইলে পৃষ্ঠাগুলোর স্ক্যান পাঠাব।

১. "যে কোনো কর্মের বাস্তব সংঘটনই উহাকে অপরাধকর্মে পরিণত করে... বাস্তবে সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো কর্মের জন্য কাহাকেও দায়ী করা যায় না।"–১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২০৮।

২. "কোনো ব্যক্তির অপরাধ প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে গ্রেপ্তার বা আটকের মাধ্যমে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যাইবে না।"–৩য় খণ্ড ধারা পৃ. ১২৮২।

অর্থাৎ সন্ত্রাসীদের প্ল্যান, মিটিং, যোগাযোগ, ষড়যন্ত্র, অস্ত্র জোগাড় ইত্যাদি প্রমাণিত হলেও তাদেরকে গ্রেপ্তার করা যাবে শুধু "বাস্তবে সংঘটিত" অর্থাৎ খুন হবার পরেই, আগে নয়। এসব আইন দিয়ে কাজ হবে? এক'শ বছর আগেও প্রতিশোধপরায়ণতার হিংস্র দানব মোটামুটি বন্ধ ছিল বোতলে, এখন স্বার্থের কারণে তাকে ছিপি খুলে মুক্ত করেছেন বিশ্বনেতারা। রক্তপিপাসু সে দানব দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বিশ্বময়, এখন ইচ্ছে করলেও তাকে তারা আবার বোতলে ছিপিবন্ধ করতে পারবেন না। মানুষের রক্তে প্রবাহিত ষড়রিপু (ছয় শত্রু)–কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য–এই তালিকায় যোগ হয়েছে আরেক মারাত্মক শত্রু–প্রতিশোধপরায়ণতা।

প্রতিটি সন্ত্রাসের পর আহত-নিহতদের জন্য বিশ্বের সাধারণ মানুষের অশ্রু ঝরেছে, সমবেদনার সাগর বয়েছে কিন্তু অক্ষত রয়ে গেছে প্রতিশোধ-চক্র। নিউজিল্যান্ড গণহত্যার কদিনের মধ্যেই হল্যান্ডে মুসলিম গোকমেন তানিস খুন করেছে তিনজন অমুসলিমকে। হল্যান্ডের পরেই ক্যালিফোর্নিয়ায় মসজিদে আগুন দিয়েছে কেউ, ডেনমার্কে প্রকাশ্যে কোরান পুড়িয়েছে একজন। সবারই মাথায় একই আগুন–"প্রতিশোধ"! এখানেই নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞেরা আজ অসহায়। আগে সন্ত্রাসীরা সংঘবদ্ধ হয়ে প্ল্যান করত, মিটিং, ইমেইল, টেলিফোন, ফেসবুক ইত্যাদি ট্র্যাক করে তাদের ধরা যেত। এখন সন্ত্রাসী একাই প্ল্যান ও সন্ত্রাস করছে। তাই তাকে চিহ্নিত করা কঠিন। টারান্ট একাই দীর্ঘ দুইটি বছর ধরে এই হামলার প্ল্যান করেছে, তার কোনো দল লাগেনি, লাগেনি অর্থায়ন

বা কোনো "সহযোদ্ধা"। কে জানে হয়তো এখনো "প্রতিশোধ" নিতে গোপনে একা তৈরি হচ্ছে অন্য কোনো ট্যারেন্ট, রহমত আলিকভ বা তানিস! প্রতিশোধ-চক্রটা এরকম:

** ব্রেন্টন ট্যারেন্ট ২০১৭ সালে স্টকহোমের সন্ত্রাসী রহমত আলিকভ-এর হামলায় নিহতদের প্রতিশোধ নিতে নিউজিল্যাণ্ডে মানুষ খুন করেছে।

** ২০১৭ সালে রহমত আলিকভ আগের সন্ত্রাসের প্রতিশোধ নিতে স্টকহোমে মানুষ খুন করেছে।

** তার আগের সন্ত্রাসীরাও তাদের আগের সন্ত্রাসের প্রতিশোধ নিতে মানুষ খুন করেছে।

** এর পরে যদি আবার হামলা হয়, এবং না হবার কোনো কারণ নেই, তবে সেই সন্ত্রাসীরাও আগের সন্ত্রাসের প্রতিশোধ নিতে মানুষ খুন করবে।

হায় ! ব্রেন্টন টারান্ট কোনোদিন জানবে না, স্টকহোমের যে সন্ত্রাসী রহমত আলিকভ-এর হামলায় নিহতদের প্রতিশোধ নিতে নিউজিল্যান্ডে সে মানুষ খুন করেছে, তার নিজের হাতে আহত-নিহত মুসলিমেরা রহমত আলিকভকে তার মতোই ঘৃণা করেছে। রহমত আলিকভ কোনোদিনই জানবে না যেই সন্ত্রাসের প্রতিশোধ নিতে সে মানুষ খুন করেছে, তার হাতে আহত-নিহতেরা সেই সন্ত্রাসকে তার মতোই ঘৃণা করেছে। ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক ইনফরমেশন গ্যাপ এটা, এর শেষ কোথায়? প্রতিশোধের এই করাত-চক্র কি অনন্তকাল ধরে এখানে-ওখানে এদেশে-ওদেশে ছিন্নভিন্ন করতেই থাকবে সাধারণ মানুষের দেহ? এ অভিশাপ থেকে পরিত্রাণের কি কোনোই উপায় নেই?

আছে। বহু শতাব্দী আগে ছিল একই রকম অন্তহীন প্রতিশোধ-চক্র। তোমার দলের কেউ একজন আমার দলের কেউ একজনকে খুন করেছিল, তাই এখন আমিও তোমার দলের যতজনকে পাব খুন করব। এই চক্রে খুন হয়েছে কত শত মানুষ কত শত যুগ ধরে। তারপর এক মাহেন্দ্রক্ষণে

খানখান হয়ে ভেঙে পড়েছিল বহু শতাব্দীর সেই অভিশপ্ত প্রতিশোধ-চক্র, মানুষ বেরিয়ে এসেছিল অন্তহীন প্রতিশোধস্পৃহা থেকে। এখনো মহাকালের ওপার হতে অস্ফুটকণ্ঠে ভেসে আসছে সেই বুলন্দ ঘোষণা, কেউ শুনবে কি?

“জাহিলি যুগের সকল রক্তের দাবি রহিত করা হইল। সর্বপ্রথম আমি রবিয়া ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের শিশুপুত্রের রক্তের দাবি রহিত করিলাম”- (বিদায় হজের ভাষণ)।

শুধু মুখের কথা নয় বরং নিজেও সেটা পালন করার কঠিন উদাহরণ। মুসলিমদের জন্য এ হুকুম কোনো মুসলিম নেতা পালনের আহ্বান জানান নি। বিশ্ব-মানবের জন্য এটা কার্যকরী বাতিঘর অথচ সে আলো কোনো অমুসলিম নেতা কাজে লাগান নি।

ইতিহাসের ওপার থেকে আজ হয়তো তিনি করুণ চোখে তাকিয়ে আছেন আমাদের রক্তাক্ত বিশ্বের দিকে।

কী ভাবছেন কে জানে!

৩০ মার্চ, ২০১৯

পাক-ভারত যুদ্ধ: "গাজোয়া-এ হিন্দ" হাদিস কী বলে?

"কাশ্মীরের আকাশে জঙ্গি বিমানের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার পরমাণু শক্তিধর দুই প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে... দুই দেশই পরস্পরের জঙ্গি বিমান ভূপাতিত করার পাল্টাপাল্টি দাবি করেছে... পাকিস্তান দাবি করেছে, বুধবার সকালে কাশ্মীরে তাদের নিয়ন্ত্রিত অংশে ভারতীয় দুটো মিগ-২১ জঙ্গি বিমানকে গুলি করে ভূপাতিত করেছে তারা। আটক করা হয়েছে ভারতীয় বিমানবাহিনীর এক বৈমানিককে। অন্যদিকে ভারতের দাবি, তাদের আকাশসীমায় প্রবেশ করা একটি পাকিস্তানি এফ-১৬ জেট ফাইটারকে গুলি করে ভূপাতিত করেছে ভারতীয় বিমানবাহিনী... ওই আকাশযুদ্ধে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি মিগ-২১ এবং পাইলট নিখোঁজ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান তাদের পুরো আকাশসীমায় বিমান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। ভারতও তাদের উত্তরাংশের নয়টি বিমানবন্দর বন্ধ রেখেছে"–২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম।

পরমাণু শক্তিধর দুদেশের মধ্যে টানটান উত্তেজনা বিরাজমান। দ্রুত ঘটছে ঘটনা, সারা বিশ্বের দৃষ্টি এর ওপরে নিবদ্ধ, এ নিবন্ধ ছাপা হবার আগে নিশ্চয় ঝিলাম, বিয়াস, চেনাব, রাভি ও শতলেজ দিয়ে অনেক পানি গড়িয়ে যাবে। এই সামরিক রাজনৈতিক ডামাডোলের পেছনে পাকিস্তানে অলক্ষ্যে শক্তিশালীভাবে দাঁড়িয়ে আছে একটি হাদিস যা প্রথম থেকেই পাকিস্তানিদের মন-মগজ সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে রেখেছে। সেটার নাম "গাজোয়া-এ হিন্দ" অর্থাৎ হিন্দুস্তান বিজয়ের জিহাদ, যাতে স্বয়ং নবীজি (সা.) নেতৃত্ব দেবেন (তার সশরীরে উপস্থিত থেকে যে জিহাদ তাকে গাজোয়া বলে)। পাকিস্তানিরা এমনিতেই প্রচণ্ড ভারত-বিরোধী। তার ওপরে মাওলানারা যখন ওয়াজ মাহফিলে মহা উত্তেজিতভাবে এই হাদিস জাতিকে শোনান তখন ঘৃণার সে আগুনে ঝড়ো হাওয়া বয়ে জাতি আরো বেশি ভারত-বিদ্বেষে ফেটে পড়ে। "গাজোয়া-এ হিন্দ" হাদিসটা সহি বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ-তে পাওয়া যায়

না। বিভিন্ন নিবন্ধে ওটার উল্লেখ আছে নাসাঈ ও অন্যান্য বইতে ৫টি হাদিসে, একটার অনুবাদ দিচ্ছি। রাসুল (সা.) নাকি বলেছেন –

“অবশ্যই তোমাদের একটি সৈন্যবাহিনী হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, আল্লাহ তাহাদিগকে বিজয় দান করিবেন এবং তাহারা উহাদের রাজাদিগকে শিকলে বাঁধিয়া টানাহ্যাঁচড়া করিয়া আনিবে... এবং সেই মুসলিমেরা ফিরিয়া আসিয়া শাম দেশে (সিরিয়া) হজরত ঈসা ইবনে মরিয়মকে দেখিতে পাইবে”।

এর ভিত্তিতেই পাকিস্তানি মওলানারা দৃঢ়ভাবে ভারত-বিজয়কে অভ্রান্ত ও অবশ্যম্ভাবী সত্য হিসেবে বিশ্বাস করেন ও জাতিকে বিশ্বাস করান, ওদের সেনাবাহিনীও দৃঢ়ভাবে এ হাদিস বিশ্বাস করে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ওয়েবসাইটে ইংরেজি অনুবাদের সাথে হাদিসগুলোর আরবি স্ক্যান দেয়া আছে। সেই সাথে কোরান হাদিসের সুগভীর গবেষণা (‘কা’না যাহুকা’ শব্দ, সুরা বনি ইসরাইল আয়াত ৮১, ইমাম মেহেদী, হজরত ঈসা আ: ইত্যাদি) ও পশ্চিমা বই “সিনারিওজ অব দ্য ফিউচার টেকনোলজি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশন্যাল ডেভেলপমেন্ট” (রকফেলার ফাউন্ডেশন)-এর উল্লেখ করে বলা আছে যে এই বিজয় হবে ২০২৭–২০২৮ সালে।

From Pakistan Defense Force's website

আরো একধাপ এগিয়ে সেখানকার এক মেগা মওলানা ইরফানুল হক বলেছেন, “আল্লাহ পাকিস্তানি মুসলিমকে ভারত ও কাফিরকে ধ্বংস করার সম্মান দিয়াছেন... পাকিস্তানিদের উচিত নিজেদেরকে সম্মানিত বোধ করা কারণ আল্লাহ তাহাদিগকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সম্মান দিয়াছেন... ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে মুসলিমের হাতে ভারত ও হিন্দুত্বের পরাজয়ের জন্যই পাকিস্তানের জন্ম হইয়াছে”।

তার এই ভয়াবহ উস্কানিমূলক হিংস্র বক্তৃতাটা সম্প্রতি ইউটিউব থেকে মুছে দেয়া হয়েছে।

পাকিস্তানে এই হুংকারের বিপরীতে ঠিক পাশের দেশ ভারতের মওলানাদের অবস্থান বড়ই লবেজান। তারা জাতির সামনে এ হাদিস কখনো উল্লেখ করেন না। কারণ ভারতে পাকিস্তানের মতো কথাবার্তা বললে হিন্দুরা, বিশেষ করে উগ্র হিন্দুরা তাদেরকে পিটিয়ে তক্তা করে দেবে। ভারতীয় টিভিতে অনেকবার দেখেছি কেউ এ হাদিস নিয়ে প্রশ্ন করলে তারা স্রেফ কথা পেঁচিয়ে পিছলিয়ে যান কিংবা "হিন্দু-মুসলিমের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে" বলে গালাগালি শুরু করেন। দিল্লি জামে মসজিদের ইমাম সৈয়দ বুখারি কিংবা কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম নুরুর রহমান বরকতীর মতো নামকরা মওলানাদের সাধারণ বক্তব্য হলো, কোনও রকম হিংস্রতা বা হিন্দুদেরকে কাফের বলাটা কোরান-সমর্থিত নয়। যখন এই হাদিসটা তাদের দেখানো হয় তখন তারা বলেন- এটা ইসলামি নয়, 'ব্যস'। কিন্তু ভারতের কোনো মওলানাকে পাকিস্তানের মওলানাদের নাম ধরে কিংবা কোনও বিশেষ বক্তৃতা উল্লেখ করে দাবি করতে শুনিনি, এটা একটা জাল হাদিস।

এই উপমহাদেশে প্রথম থেকেই অন্য সব দেশের ঘাড়ে ভারত 'বড় ভাই' হয়ে বসে আছে। এবং সেটা মোটেই স্নেহময় কোনও বড় ভাই নয়, সেটা একটা মারাত্মক স্বার্থপর এবং হিংস্র বড় ভাই। আপাতত আমাদের সেটা রাজনীতি দিয়ে সামলানো ছাড়া উপায় নেই। ওদিকে ভারতের পরাক্রান্ত সামরিক শক্তির সামনে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কিছুই নয়। দেশটা প্রায় সর্বদাই হয় আর্মির বুটের নিচে বা আর্মি সমর্থিত ছায়া সরকার দ্বারা শাসিত। তাছাড়া মুখে যত ফুটানি-ই করুক চারবার ভারতের কাছে আর একাত্তরে আমাদের কাছে পরাজয়ের কলঙ্কতিলক তাদের সেনাবাহিনীর ললাটে রক্তাক্ত হয়ে ফুটে আছে, ফলে তাদের মনোবলও ভাঙা। গরিব পাকিস্তানের বাক্যনবাব সেনাবাহিনী এ ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি:

জনতা ঘোরায় পরিশ্রমে অর্থনীতির চাকা,

ওদের শুধু লেফট-রাইট আর মুখের বুলি ফাঁকা।

প্রতিরক্ষা শিকেয় তুলে গদির লোভে ক্রমে,

নিজেরই দেশ জয় করে সে বিপুল বিক্রমে !

আহার-বিহার, পোশাক-বাড়ি খাচ্ছে মুফৎ সব,

গরিব জাতির রক্তমাংসে ওদের মহোৎসব।

খায় যত তার কোনো কিছুই দেয় না ফেরত তো,

নিরস্ত্র জনতার ওপর ওদের বীরত্ব !!

পাক-ভারতের বিস্ফোরক সামরিক পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে হুংকারী মওলানারা আবারো "গাজোয়া-এ হিন্দ" নিয়ে দাপাদাপি করছে, জনগণকে উসকে ভারত-বিজয়ের অবাস্তব স্বপ্নে ভোলাচ্ছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তাদের গায়ে এখন হাত দেবেন বলে মনে হয় না। কারণ মাত্র কিছুদিন আগে তিনি আসিয়া বিবি মামলায় "তেহরিক-এ লাব্বায়েক" দলের বিকট হিংস্র মওলানাদের জেলে ঢুকিয়েছেন, এখন তিনি আর কোনও মওলানাকে ঘাঁটাবেন বলে মনে হয় না। এই থিন রেড লাইন থেকে আমাদের রাজনীতিকদের কি শেখার আছে?

প্রবাদ থেকে শেখার আছে কারণ সব দেশের প্রবাদগুলো আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ফসল। সেটা হলো, ধর্মগুরুদেরকে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করাটা "বাঘের পিঠে সওয়ার" হবার মতো। সওয়ার হওয়াটা হয়তো সোজা ও স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে, কিন্তু ওই বাঘের পিঠ থেকে নামা যায় না, নামলেই সেই বাঘ তোমাকেই খেয়ে ফেলবে।

ইতিহাস আমাদের কানে কানে ফিসফিস করে কিছু একটা সতর্কসংকেত শেখাচ্ছে, আমাদের রাজনীতিকেরা কি কিছুই শিখবেন না?

২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

অ-তে অতুলপ্রসাদ, আ-তে আলতাফ মাহমুদ!

‘মি. স্পিকার! আজ আমি আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে ইন্ডিয়ান আবাসিক স্কুলের তখনকার ছাত্রছাত্রীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি”–কানাডার সংসদে প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপারের বক্তৃতার অংশ, ১১ জুন ২০০৮।

দেশ, জাতি ও সরকারের পক্ষ থেকে সংসদে ক্ষমা চাইতে হলো প্রধানমন্ত্রীকে। ১৮৭০ সালের দিকে ফরাসি ও ব্রিটিশ শক্তি কানাডা দখলের পর আদিবাসী সব শিশুকে আবাসিক স্কুলের হোস্টেলে বন্দি করে তারা নিজেদের বানানো সিলেবাস ছাড়া অন্য সব শিক্ষা অবৈধ ঘোষণা করে। ইংরেজিতে ছাড়া নিজেদের ভাষায় কথা বলার অধিকার পর্যন্ত বাচ্চাদের ছিল না। সিলেবাস বদলের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক গণহত্যার সেই অবর্ণনীয় অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন হ্যালিফ্যাক্সের গবেষক ফারহানা নাজ শম্পা–‘আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসিক স্কুল: কানাডার ইতিহাসে কালিমাময় এক অধ্যায়”–প্রথম আলো ২৫ ডিসেম্বর ২০১৮।

একটা জাতিকে তার ইতিহাস-ঐতিহ্য ভুলিয়ে দেওয়া তাকে খুন করার সমান, তার চেয়েও আত্মঘাতী হলো বাচ্চাদের উল্টো ইতিহাস শেখানো। ওই স্কুলগুলোর অধ্যক্ষেরা কোনো স্যুট-টাই পরা ‘ভদ্দন্নোক’ ছিলেন না–তারা ছিলেন ধর্মগুরু পাদ্রি। গণহত্যার মধ্যে হিংস্র ধর্মগুরুরা স্বর্গের সিঁড়ি খোঁজেন, এ থেকে শান্তিময় ধর্মগুরুরা জাতিকে রক্ষা করতে পারেন। আরেক উদাহরণ পাকিস্তান, যার সাথে আমাদের রাজনৈতিক-ধর্মনৈতিক অতীত, বর্তমান প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত। আজ হাতে গোনা কিছু পাকিস্তানি ছাড়া সবাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে–

উদাহরণ ১–একাত্তর আমাদের স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধ ছিল না, ওটা ছিল ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ।

উদাহরণ ২–মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ভারতের মুসলিমেরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে।

দুটোই ডাহা মিথ্যে। এমন উল্টাপুরাণ তুঘলকি কাণ্ড কীভাবে সম্ভব হলো? পুরো জাতিকে ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার মুণ্ডু কীভাবে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেয়া সম্ভব হলো? ইতিহাস থেকে এই বিচ্ছিন্নতার কারণেই জাতটা ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষাই নেবার সুযোগ পায়নি, এখনো মৌলবাদের খপ্পরে রক্তাক্ত হচ্ছে আর বেলুচিস্তানে আমাদের মতোই শোষিত, বঞ্চিত, স্বাধীনতাকামী বেলুচদের ওপরে ক্রমাগত গণহত্যা করছে। আর আমরা? আমরা ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর লক্ষবাগ আমবাগানের যুদ্ধে মীরজাফরের ইতিহাস জানি বলেই পঁচাত্তরের মুশতাককে চিনতে আমাদের সময় লাগে এক সেকেন্ড বা তারও কম।

জাতিকে ইতিহাস ভোলানোর অব্যর্থ অস্ত্র হলো শিক্ষা-সিলেবাস। বাচ্চারা তাদের প্রাইমারি থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গন পর্যন্ত যদি একই তথ্য শেখে, সেটা আবার পিতামাতা, শিক্ষক, টিভি-রেডিও, ম্যাগাজিন খবরের কাগজ, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের সভা-সমিতির বক্তৃতায় ক্রমাগত শুনে বড় হয়, তখন তাদের কাছে সেটাই মোক্ষ সত্য হয়ে দাঁড়ায়, এর বাইরে কিছু তারা চিন্তাও করতে পারে না। কী শিখেছে পাকিস্তানিরা ছোটবেলা থেকে?

উদাহরণ ১–মুক্তিযুদ্ধের ওপরে তরুণ বলিষ্ঠ গবেষক আরিফ রহমানের "ত্রিশ লক্ষ শহীদ : বাহুল্য নাকি বাস্তবতা" বইয়ের 'কেন আজও পাকিস্তানকে ঘৃণা করতে হয়'–অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে পাকিস্তানি শিশুরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে কীভাবে পড়ছে–সূত্র–আজাদী, ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৮। (সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি):

"১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর ভারত পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের সহযোগিতায় সেখানকার অধিবাসীদের পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলে...১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে। ভারতের ষড়যন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে যায়...পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বহু সংখ্যক হিন্দু শিক্ষক ছিলেন... হিন্দু শিক্ষকেরা বাঙালিদের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করে...ভারত তাদের স্বার্থ বাস্তবায়নে এই

হিন্দুদেরকে ব্যবহার করে... অনেক হিন্দুই ভারতের চর হিসেবে কাজ করে...মার্শাল ল কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ... ডিসেম্বর ৩, ১৯৭১ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। স্থানীয় জনগণের সমর্থনের অভাব, সামরিক বাহিনী ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের দুর্বল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কারণে পাকিস্তানের সৈন্যরা ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।" (উদ্ধৃতি শেষ)

২য় উদাহরণটাও মিথ্যে। ১৯৪৬ সালে ভারতে "ইনফরমাল রেফারেন্ডাম" নির্বাচন হয়েছিল। অর্থাৎ মুসলিম লীগ যদি মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে জেতে তাহলে প্রমাণ হবে ভারতীয় মুসলিমেরা পাকিস্তান চায়। সে নির্বাচনে মুসলিম লীগ পাঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হেরে গিয়েছিল, শুধু সিন্ধু প্রদেশে সমানে সমান ভোট পেয়েছিল। সাংবিধানিক ক্ষমতায় স্পিকার তার ভোটটা মুসলিম লীগকে দিলে তবেই সেখানে সে সরকার গঠন করতে পেরেছিল। আর বাংলায় মুসলিম লীগ ভূমিধস জিতে সরকার গঠন করেছিল। অর্থাৎ পাকিস্তানের বেশির ভাগ জনগণই পাকিস্তান চায়নি, পাকিস্তান এনেছিলাম আমরাই। অথচ ওখানকার বাচ্চারা সিলেবাসে উল্টো ইতিহাস শিখে বড় হয়েছে।

নিজের মা-বোন ধর্ষিতা না হলে নাকি অপরাধটা ধর্ষকের মাথায় ঢোকে না। সিলেবাস বাংলাদেশেও বদলানো হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য দেশে অসংখ্য মাদ্রাসা থাকার পরেও যারা সাধারণ শিক্ষা-সিলেবাসে ধর্ম ঢুকিয়ে দিয়েছেন তারা ভুলে যান যে বাংলাদেশের বাইরে বিশাল বিস্তীর্ণ দুনিয়া আছে, সেখানে এক ধর্মের উগ্রতা অন্য ধর্মের উগ্রতাকে শক্তিশালী করে। তারা খেয়াল করেননি যে তাদেরকে অনুসরণ করে ভারত ও পশ্চিমা বিশ্ব সিলেবাসে বেদ-পুরাণ-উপনিষদ-বাইবেল ঢুকিয়ে দিলে মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের কী ভয়ানক অবস্থা হবে। পাকিস্তানের স্কুল-কলেজে বাচ্চাদের ওপরে রাষ্ট্রের এই হিংস্রতা বহু আগে থেকেই চলছে।

'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' যদি সত্য হয় তাহলে যে প্রকৃতির শিক্ষাঙ্গন সেই প্রকৃতির সিলেবাস হওয়াই দরকার। আমাদের সিলেবাসের ঐতিহ্য ছিল সরকারি সিলেবাসে অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা ও

ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গনের সিলেবাসে ধর্মীয় শিক্ষা। পরে শুরু হয় সিলেবাসে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির অনুপ্রবেশের অপচেষ্টা। সেই আটচল্লিশ-বাহান্নতেই আরবি অক্ষরে বাংলা লেখার মতো উদ্ভট ও উৎকট চেষ্টা হয়েছিল, সম্ভবত সরকারি অর্থায়নও করা হয়েছিল। ফ্রন্টাল লাইনে সেই অপচেষ্টা বিফল হবার পর সেই একই উদ্দেশ্যে এখন সাইড লাইনে শুরু হয়েছে নতুন আক্রমণ। অ-তে 'অজগর' এগুলো উবে গিয়ে হয়েছে–উদ্ধৃতি: অ-তে 'অজু করে পাক হও', আ-তে 'আজান শুনে জামাতে যাও', ই-তে 'ইসলাম চায় শান্তি', ঈ-তে 'ঈমান বাড়ায় শক্তি', এ-তে 'এক হও মুসলমান', ঐ-তে 'ঐশী বাণী আল কোরআন...' গ-তে 'গান শোনা ভালো নয়...' 'জেড' বর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন করা হয়েছে 'জু' আর বাক্য গঠনে লেখা হয়েছে, 'চিড়িয়াখানাতে আল্লাহর কুদরত দেখো...'

৫০টি বর্ণের মধ্যে ২৯টি দিয়ে ধর্মীয় বাক্য গঠন করা হয়েছে।–কালের কণ্ঠ–কিন্ডারগার্টেনে কী পড়ানো হচ্ছে! ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আয়াতুল্লাহ খোমেনি, মাওলানা আবদুর রহিম এমনকি মাওলানা মওদুদীর জীবনী ও দর্শনচিন্তা। অথচ মওদুদীর চিন্তাধারা পাকিস্তানে ধর্মীয় ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে খুনোখুনির ঘটনা ঘটিয়েছিল এবং এ চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েই একশ্রেণির তথাকথিত ধার্মিক আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের বিরোধিতা করে হানাদার বাহিনীর দালালিতে লিপ্ত হয়েছিল। এ দেশের আল-বদর, আল-শামস ও রাজাকার বাহিনীর উৎপত্তি মওদুদীর চিন্তাধারারই ফসল–সমকাল, সম্পাদকীয়, ২৪ জুন ২০০৮।

সিলেবাস পরিবর্তনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী। ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরে এর প্রভাব অনুভূত হবে যখন আমাদের বাচ্চারা বড় হয়ে দেশ-জাতির হাল ধরবে। বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা যায় জাতির ইতিহাস স্কুল সিলেবাসে ঠিকমত অন্তর্ভুক্ত না করার ফলে তরুণ প্রজন্ম ইতোমধ্যেই ভয়াবহ জগাখিচুড়ী করে ফেলেছে শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস আর বিজয় দিবসের মধ্যে। অলক্ষ্যে অট্টহাসি হাসছে বাংলাদেশের নিয়তি, ধ্বনিত হচ্ছে ইঙ্গিত–আমরাও কি অসাম্প্রদায়িকতার শেকড়চ্যুত হয়ে পাকিস্তান মার্কা ভবিষ্যতের দিকে হাঁটছি?

দেশে এই সাংস্কৃতিক গণহত্যার বিরুদ্ধে আজ সোচ্চার অনেক মেধা, চিন্তা, কণ্ঠ ও লেখা, এর মধ্যে উঠে এসেছে মৌলিক এক অনন্য প্রতিরোধ। কলমের বিরুদ্ধে চাপাতির হিংস্রতা নয়, কলমের বিরুদ্ধে কলম এবং বইয়ের বিরুদ্ধে বই। এ বইয়ের নাম "বর্ণে বর্ণে বাঙালী"। ২৪ পৃষ্ঠার এ বইতে প্রায় ৬০ জন বাঙালি মনীষীর মুখচ্ছবির সাথে রয়েছে ছড়া যাতে বাচ্চারা অক্ষরের সাথে সাথে আমাদের আলোকিত বাতিঘরদের সাথেও পরিচিত হয়, তাদের মতো হবার উৎসাহ পায়।

অ- তে অতুলপ্রসাদ সেন

বাংলা ভাষার গুণী শিল্পী, গানের মানুষ তিনি,

দেশের গান মানুষের গান গজল লিখেছেন যিনি।

আ- তে আলতাফ মাহমুদ

আলতাফ মাহমুদ গানের পাখী, দেশ রক্ষায় বীর,

ভাষা আন্দোলন বা মুক্তিযুদ্ধ, উন্নত তার শির।

এ- তে এস এম সুলতান

রং তুলিতে আঁকতেন ছবি, আঁকতেন দেশের মুখ,

বাংলাদেশের শিল্পী তিনি, গর্বে ভরে বুক ।

ঋ-তে ঋত্বিক ঘটক

বাঙালির পরম বন্ধু সিনেমা অন্তঃপ্রাণ,

সিনেমার মাঝে গেয়ে গেছেন মানুষের জয়গান।

প্রকাশক রাকিবুল হাসানের ভাষায়—"যে বই শিশুকে তার শিক্ষাজীবনের সূচনায় 'অজ' বা ছাগল চেনাবে না, অজগরের ভয় দেখাবে না বা শিশুমনে ঢুকিয়ে দেবে না সাম্প্রদায়িকতা। এই বই শিশুদের পরিচয় ঘটাবে বাঙালি মনীষীদের সাথে। শিশুরা চিনবে কাজী নজরুল, লালন, ক্ষুদিরাম, সুলতান, মেঘনাথ সাহা প্রমুখকে। ওরা জানবে ভাষাশহীদ এবং

বীরশ্রেষ্ঠদের সম্পর্কে। ওদের মনে তৈরি হবে অদম্য কৌতূহল এবং নানান প্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তর খুঁজে খুঁজে ঘটবে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ"।

হোক পথ দুঃসহ, দুর্গম, ভয়াবহ–দু'এক পথিক পথ চলবেই,

বোধের বন্ধদ্বারে, নিকষ অন্ধকারে–বিদ্রোহী কিছু দীপ জ্বলবেই !!

মাভৈ !

(ইন্টারনেটে "বর্ণে বর্ণে বাঙালী" সার্চ করলে ফেসবুকসহ বিস্তারিত পাওয়া যাবে)

২২ *ফেব্রুয়ারি*, ২০১৯

ধর্মানুভূতি: কঠিন সংকটে পাকিস্তান (আসিয়া বিবি মামলা)–দেখে শিখব নাকি ঠেকে?

জঙ্গি দমনে বাংলাদেশ সরকারের সাফল্য প্রশংসনীয়। কিন্তু জঙ্গিদের শিকড় মৌলবাদ উচ্ছেদে দরকার কার্যকর একটা পদ্ধতি, সেটা গুলি-বন্দুক-গ্রেপ্তার দিয়ে হয় না। সমস্যাটার চরিত্র পাকিস্তানের উদাহরণ থেকে শেখা দরকার। কারণ দেশে মৌলবাদ প্রথম থেকেই পাকিস্তানি মৌলবাদীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিচালিত। দু'দলের ধর্মবিশ্বাস, গ্রন্থগুলো, কর্মপদ্ধতি ও উদ্দেশে একই। "পাকিস্তান কী ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগোচ্ছে তা তিরিশ বছর পর টের পাবে"–বলেছিলেন পাঞ্জাবের নিহত গভর্নর সালমান তাসির-এর সদ্য স্বামীহারা স্ত্রী–জানুয়ারি ২০১১। তিরিশ বছর লাগেনি, এখনই সেই ভয়াবহ পরিণতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, স্বঘোষিত 'নায়েবে রাসুল'-দের তাণ্ডবে টালমাটাল পাকিস্তান।

একাত্তরের পর এত গভীর সংকটে পাকিস্তান পড়েনি কখনো। অলক্ষ্যে ধ্বনিত হচ্ছে ইঙ্গিত, বাংলাদেশের কানে কানে কিছু বলছে নিয়তি–দেখো, দেখে শেখো, নতুবা ও রকম চড়া মূল্য দিয়ে ঠেকে শিখতে হবে।

সংক্ষিপ্ত ঘটনাক্রম, প্রধানত পাকিস্তানের বিভিন্ন টিভি থেকে।

১. ২০০৯ সাল। পাঞ্জাবে ৪৪ বছর বয়স্ক দুই কন্যার জননী খ্রিস্টান আসিয়া বিবি (আসিয়া নওরীন) তার কাপ দিয়ে বালতি থেকে পানি নেবার পর দুজন মুসলিম নারী ঝগড়া শুরু করে এই বলে যে ওই পানি অপবিত্র হয়ে গেছে। ঝগড়া বেড়ে গেলে তারা আসিয়া বিবিকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ দেয় এবং অভিযোগ করে যে আসিয়া নবীজিকে (সা.) নিয়ে আপত্তিকর কথা বলেছে। কথাটা চাউর হলে উত্তেজিত ক্রুদ্ধ জনতার জমায়েতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং ভীতসন্ত্রস্ত আসিয়া বিবি জনতার ও মুরুব্বিদের সামনে আপত্তিকর কথার স্বীকারোক্তি করে ক্ষমা চায়। তারপর সে গ্রেপ্তার হয় ও তার বিরুদ্ধে ধর্মানুভূতিতে আঘাতের

মামলা হয় (আইন নং ২৯৫সি)।

২. নিম্ন আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন ২০১০ সালে, সেই থেকে সে কারাগারে একা নির্জন কক্ষে বন্দি। আপিল করলে হাইকোর্ট তার মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছন ২০১৪ সালে, আবার আপিল করলে সুপ্রিম কোর্ট তাকে খালাস দিয়েছেন গত ৩১ অক্টোবর, ২০১৮। এই তারিখটা পাকিস্তানে উগ্র মাওলানাদের ও গণমানসে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, কারণ পাঞ্জাবে ১৯২৯ সালে এদিনেই ফাঁসি হয়েছিল ভারতবর্ষের প্রথম ধর্মানুভূতি মামলার খুনি ইলমুদ্দীনের, যে এখনো পাকিস্তানে বিরাট হিরো।

লাহোরের ছাপাখানার মালিক রাজপাল নবীজির (সা.) নারীসঙ্গ নিয়ে "রঙ্গীলা রসুল" বই বের করলে ইলমুদ্দীন তাকে খুন করেছিল। আসিয়ার পক্ষে ও ব্লাসফেমি আইনের বিরোধী পাঞ্জাবের গভর্নর সালমান তাসিরকে ২০১১ সালে তার দেহরক্ষী মুমতাজ কাদির প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করলে তার মৃত্যুদণ্ড হয়, সেও পাকিস্তানে বিরাট হিরো। (দেখুন "আবার জঙ্গি: পাকিস্তানি বনাম বাংলাদেশি গণমানস অধ্যায়)। উগ্রপন্থীরা খুন করেছে ব্লাসফেমি আইনের বিরোধী সংখ্যালঘু মন্ত্রী শাহবাজ ভাট্টিকে এবং আরেক অভিযুক্ত বন্দি প্রফেসর জুনায়েদ হাফিজের উকিলকেও।

৩. সুপ্রিম কোর্ট আসিয়াকে খালাস দিলে উগ্র ইসলামি রাজনৈতিক দল তেহরিক-এ লাব্বায়েক-এর হুংকারী ইমাম খাদিম হোসেন রিজভী উন্মত্ত জনতাকে রাস্তায় নামিয়ে দেশজুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে। মিটিং-মিছিল স্লোগান কাকে বলে তা বাংলাদেশিরা ভালো করেই জানেন। কিন্তু পাকিস্তানে যা হয়েছে তাকে উন্মাদের তাণ্ডব বললেও কম বলা হয়। তারা প্রকাশ্য ঘোষণায় দেশের সর্বোচ্চ তিন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বলতে গেলে যুদ্ধ ঘোষণা করে–(ক) প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে "ইহুদির চর" ঘোষণা করে, (খ) মামলার বিচারপতিদের "কতলযোগ্য" ঘোষণা করে, প্রধান বিচারপতির গৃহভৃত্যদের আহ্বান জানায় তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে (হার্ট অ্যাটাক হয়ে তিনি হাসপাতালে ছিলেন) এবং (গ) সেনাপ্রধান জাভেদ বাজোয়া-কে "কাফের" ও "কাদিয়ানি" ঘোষণা করে অন্য জেনারেলদের আহ্বান জানায় বিদ্রোহ করে তাকে উৎখাত করতে।

পরে প্রকাশ পায় যে তারা সুপ্রিম কোর্টের রায়টা পড়েও দেখেনি যেখানে পরিষ্কার লেখা আছে কেন আসিয়াকে খালাস দেয়া হলো। তারা হুংকার দিতে দিতে বড় শহরগুলোর রাস্তা অবরোধ করে আগুন লাগিয়েছে, বহু জায়গায় যান-চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, অসংখ্য গাড়ি ও দোকান ভস্মীভূত ও লুট হয়, সরকারও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে অনেক জায়গায় বন্ধ করে দেয় মোবাইল ও ইন্টারনেট, পাঞ্জাব সরকার জারি করেছে ১৪৪ ধারা।

৪. এ রকম উন্মাদ আগ্রাসনের প্রতি দেশের সর্বোচ্চ এই তিন প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ভেজা পাউরুটির মতো মিনমিনে। হিংস্রতাকে আইনের আওতায় না এনে বরং তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে তারা রাসুল-প্রেমিক খাঁটি মুসলিম। তারা উগ্র ইমামের সাথে সমঝোতা বৈঠক করে তার তিনটে দাবি মেনে নিয়েছেন–রায় পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত ও আসিয়া বিবিকে 'একজিট কন্ট্রোল লিস্ট'-এ অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে তিনি পাকিস্তান ছেড়ে যেতে না পারেন। এই দুটো ইতোমধ্যে করা হয়েছে। অথচ এক মন্ত্রী বলেছেন আইন মোতাবেক যার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই, তাকে অন্য দেশের ভিসা পেলে বিদেশ গমনে বাধা দেবার অধিকার সরকারের নেই।

৫. এই সমঝোতা বৈঠকের সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শহীদ খাকান আব্বাসী। তার আমলে এক উগ্র ইমামের নেতৃত্বে এরকম তাণ্ডব হলে তিনি হার্ডলাইনে গিয়ে পুলিশ ও আর্মি প্রয়োগের চেষ্টা করেন। কিন্তু দুই প্রতিষ্ঠানই তাকে স্রেফ না করে দেয়। সেনাপ্রধান তাকে বলেছিলেন–'স্বজাতির ওপরে গুলি চালাব না'। কথাটা একাত্তরে মাথায় ঢুকলে ভালো হতো। ফলে তিনি সমঝোতা বৈঠকে বাধ্য হন। জাতি, প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর বড় একটা অংশ ইসলামের উগ্র জঙ্গিবাদের কতখানি সমর্থক হয়ে উঠলে একজন সরকারপ্রধানকে এভাবে নাকে খত দিয়ে উগ্র মাওলানাদের হুংকারের সামনে মাথা নত করে পিছু হটে আসতে হয়, তা বুঝতে আইনস্টাইন হতে হয় না। এর মধ্যে আসিয়া বিবির স্বামী-সন্তানেরা গোপন জায়গায় পালিয়ে আছেন এবং তাকে সরকার গোপন জায়গায় নিয়ে রেখেছে। এখন হিংস্র মৌলবাদীরা ঘরে ঘরে হানা দিয়ে তার পরিবারকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে–দ্য গার্ডিয়ান, ২১ নভেম্বর।

৬. প্রথম থেকেই সংবাদমাধ্যম ওই ভেজা পাউরুটির মতোই মিনমিন করে সরকারের পক্ষে আছে, তারাও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে তারা রাসুল-প্রেমিক খাঁটি মুসলিম। সম্প্রতি কিছু আলেম রায়ের পক্ষে মত দিয়েছেন, তাদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত আলেম মুফতি শফি'র পুত্র পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শারিয়া কোর্টের এবং সুপ্রিম কোর্টের "শারিয়া আপিল বিভাগ"-এর প্রাক্তন বিচারক, অনেক ইসলামি সংগঠনের সদস্য ও ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রবক্তা-নেতা মওলানা ত্বকী উসমানী। সাথে অনেক আলেমও বলেছেন, এ আইন সাধারণ জনগণের বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের কী সর্বনাশ করেছে। কয়েক বছর আগে এক মওলানা চাউর করে দিল গরিব খ্রিস্টান মহল্লায় এক বালিকা কোরানের পোড়া পৃষ্ঠা আবর্জনায় ফেলেছে। যা হবার তা-ই হলো, উন্মত্ত জনতা হুংকার দিয়ে ছুটে এল, পুরো মহল্লার খ্রিষ্টানেরা প্রাণভয়ে বৌ-বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে গেল, ওই মওলানা তাদের জমি দখল করল। পরে তদন্তে প্রমাণ হলো ওই মওলানাই জমি দখল করার জন্য ষড়যন্ত্র করে আবর্জনায় কোরানের পোড়া পৃষ্ঠা ফেলে দিয়ে ঘটনাটা সাজিয়েছে। শত শত ভয়াবহ ঘটনার এ একটা মাত্র।

৭. আসিয়া বিবির সমর্থনে বহির্বিশ্বে যতই অসংখ্য কণ্ঠ, সংগঠন ও সরকার সোচ্চার হচ্ছে, ততই সেগুলোকে উগ্র মাওলানারা "ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র" হিসেবে প্রচার করছে–জনগণের একাংশ তা বিশ্বাসও করছে। আসিয়া বিবির উকিল হল্যান্ডে পালিয়ে গেছেন, নিরাপত্তার জন্য হল্যান্ড সরকার পাকিস্তান দূতাবাস থেকে তাদের কর্মচারীদের ফেরত নিয়ে গেছে।

৮. উগ্র ইমামেরা জাতির বিরাট অংশকে এতই হিংস্র করে তুলেছে যে কারো বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনলেই তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যার জন্য জনতা পাগল হয়ে হামলে পড়ে। এই দানবেরা গত ২৮ বছরে ৬২ অভিযুক্তকে খুন করেছে, এ ধরনের অভিযোগ করা হয়েছে ১৩০০ জনের বিরুদ্ধে–(ডন, ১ জুলাই ২০১৬)। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আছে সাক্ষীদের বক্তব্যগুলোতে এত পার্থক্য ও পরস্পর-বিরোধিতা আছে যে তার ভিত্তিতে কোনো সাজা দেয়া অসম্ভব–দৈনিক ডন, ৬ নভেম্বর ২০১৮ থেকে সংক্ষেপে:

(ক) ঘটনার সময় উপস্থিত নারী ছিল ২৫-৩০ জন। কিন্তু আসমা বিবি ও মাফিয়া বিবি ছাড়া আর কেউ ঘটনাটা সম্বন্ধে কারো কাছেই কিছু বলেনি। তার ওপর, আসমা বিবি ও মাফিয়া বিবি কোর্টে এসেও সাক্ষ্য দেয় নি।

(খ) যে কোনো মামলায় প্রথমেই এফআইআর করার বিধান অথচ এ মামলায় ওটা করা হয়েছে ঘটনার দীর্ঘ পাঁচ দিন পরে, তা-ও আবার পুলিশ তদন্তেরও পরে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই, ষড়যন্ত্র করে ঘটনা সাজানোর সম্ভাবনা অবশ্যই থেকে যায়। এটা সব দেশেই প্রযোজ্য। কানাডার এক স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ও বোর্ডের সভাপতিকে আজ বরখাস্ত করা হয়েছে শুধু স্কুলে এক হিংস্রতার রিপোর্ট পুলিশকে দুদিন পরে দেবার জন্য।

(গ) বাদী কারি মুহাম্মদ সালাম বলেছেন, এফআইআর-এর প্রাথমিক দরখাস্ত লিখেছিলেন এক উকিল, কিন্তু তিনি তার নাম পর্যন্ত বলতে পারেননি। তাই, "বর্ণিত ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে"।

(ঘ) যে জমায়েতে আসিয়া বিবি স্বীকারোক্তি করে ক্ষমা চেয়েছে বলা হয়েছে, সেখানে উপস্থিত লোকের সংখ্যা মাফিয়া বলেছে ১০০০ জন কিন্তু আসমা বলেছে ২০০০-এর বেশি।

(ঙ) আসমা বলেছে, জমায়েতটা হয়েছিল প্রতিবেশী রানা রাজ্জাকের বাসায়, মাফিয়া বলেছে সেটা হয়েছিল তাদের নিজেদের বাসায়, আরেক সাক্ষী মুহাম্মদ আফজাল বলেছে সেটা হয়েছিল মুখতার আহমদের বাসায়।

(চ) অন্য সাক্ষীরা বলেছে বাদীকে ঘটনাটা জানানো হয়েছে ঘটনার দিনই অর্থাৎ ১৪ জুন, ২০০৯ সালে, কিন্তু বাদী নিজেই বলেছে ঘটনাটা তাকে জানানো হয়েছে ১৬ জুন, ২০০৯ সালে।

(ছ) ঝগড়াটা আদপেই হয়েছিল কিনা, কে কোথায় কবে বেলা কয়টার সময় কী করেছে এমন অনেক কিছুতেই সাক্ষীদের একের কথা অন্যের সাথে মেলেনি। একটা উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি। রায়ে এটাও বলা হয়েছে–"আসামিকে শত শত উত্তেজিত লোকের সামনে একা আনা

হয়েছে, সেটা খুব ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি ছিল। আসামি নিজেকে হুমকির সম্মুখীন ও ভীত বোধ করে থাকতে পারে, এ অবস্থায় সে যদি স্বীকারোক্তি করেও থাকে, তবু তা স্বেচ্ছায় করেছে বলা যাবে না। এক্সট্রা জুডিশিয়াল স্বীকারোক্তি একটি ভঙ্গুর প্রমাণমাত্র"।

তাহলে সাক্ষীদের সাক্ষ্যে এত অমিলের পরেও আগের দুটো কোর্ট মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলো কীভাবে? অনেকে বলেছেন, পাকিস্তানে এ ধরনের মামলার বিচারকেরা ভয় পান ও অরক্ষিত বোধ করেন, সেটা কারণ হতে পারে। তবে কারণ যা-ই হোক না কেন সাক্ষ্যপ্রমাণে এত ভজকট থাকলে তার ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড কেন কোনো শাস্তিই দেয়া যায় না।

কালতামামি–সাবধান বাংলাদেশ!

কয়েক দশক ধরে পাকিস্তানে প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের স্বার্থে মৌলবাদীদেরকে যতই প্রশ্রয় দিয়েছে ততই সে ক্ষমতাশালী হয়েছে। যুগ যুগ ধরে নিঃশব্দ কৌশলে তারা শক্তিশালী হয়ে এখন সশব্দে ফেটে পড়েছে। কৌশলগুলোর মধ্যে আছে ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করা, আর্মিসহ সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও জাতির মন-মানসকে নিজেদের উগ্র ধর্মতত্ত্বে প্রভাবিত করা, ক্ষমতার সাথে দোস্তি, অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, যা থেকে তারা নিমেষে অসংখ্য উন্মত্ত কিশোর-তরুণকে রাস্তায় নামাতে পারে, সিলেবাস পরিবর্তন, যাতে বাচ্চারা শৈশব থেকেই 'মগজ-ধোয়া' হয় (এর ওপরে আলাদা করে লিখব) ইত্যাদি। এ পর্যন্ত তারা অনেকটাই সফল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেই একই পথে ধাবমান এবং এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না।

প্রতিবাদ করার অধিকার সবারই আছে, কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা প্রতিবাদীর চরিত্র প্রমাণ করে।

২৫ নভেম্বর, ২০১৮

আইয়ুব বাচ্চু বনাম আমাদের ইমামেরা

(১৮ অক্টোবর ২০১৮ সালে কিংবদন্তি গায়ক আইয়ুব বাচ্চুর মৃত্যুর পর অনেক আলেম ওয়াজ মাহফিলে বলেছেন তিনি সংগীতশিল্পী বলে দোজখে যাবেন। সত্যি কি তাই? সংগীতের বিষয়ে কী বলে হাদিস-কোরান ও বিশ্বনন্দিত আলেমরা?)

প্রয়াত গায়ক আইয়ুব বাচ্চুর বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছেন আমাদের কিছু আলেম। বাচ্চু নাকি দোজখে যাবেন। কাউকে জাহান্নামে পাঠাবার আগে, নিজেদের জান্নাতে যাবার গ্যারান্টি পেলে ভালো হয় না কি ? ইসলামে নাকি সংগীত হারাম। হালাল-হারাম করার মালিক যিনি কিছুই ভোলেন না (ত্বাহা–২০) এবং যিনি ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন (মায়েদা–৩) সেই আল্লাহ হারামের সুস্পষ্ট তালিকা কোরানে দিয়ে রেখেছেন। এ ব্যাপারে অত্যন্ত দিকনির্দেশনা দিয়েছেন বর্তমান বিশ্বের সর্বোচ্চ ইসলামি বিশেষজ্ঞদের একজন ড. ইউসুফ কারজাভি:

'আল্লাহ'র ইসলাম দ্বিতীয় মৌল নীতি হিসেবে ঘোষণা করেছে যে, হালাল-হারাম ঘোষণা করার অধিকার কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'লার। সৃষ্টির হাত থেকে এ কর্তৃত্ব কেড়ে নেয়া হয়েছে ... আলেম, পীর, দরবেশ, রাজা-বাদশাহ, নেতা, আল্লাহর বান্দাদের ওপর কোনো কিছু হারাম করার কোনো অধিকার কারো নেই। যদি কেউ তা করার দুঃসাহস করে তাহলে বুঝতে হবে সে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করেছে। দ্বীনি আইন-বিধান প্রণয়নে আল্লাহর নিরঙ্কুশ অধিকারকে যারা কেড়ে নিতে চাচ্ছে, তাদের এ কাজকে যারা খুশি মনে মেনে নেবে ও গ্রহণ করবে, অনুসরণ করবে, তারা আল্লাহর সাথে তাদের শরিক করার মতো মারাত্মক অপরাধ করবে। শিরকের এ অপরাধ আল্লাহ কিছুতেই ক্ষমা করবে না"–ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, পৃষ্ঠা ৩৫, ৩৬।

এ সত্ত্বেও কেন যেন অতীত-বর্তমানে সেই তালিকায় আরো অসংখ্য হারাম আলেমরা যোগ করেছেন এবং করছেন। ব্যাপারটা দুর্বোধ্য। অথচ

ওয়াজ মাহফিলে হাজারো শ্রোতা তাদের কথাগুলোই ইসলামি বলে বিশ্বাস করেন। ইসলামে সংগীত হারাম কিনা তা নিয়ে আলেমরাই বিভক্ত, ফলে জনতাও বিভক্ত। জাতির মানসে পরস্পরবিরোধী এই বিরোধের সুরাহা হওয়া দরকার, ভিন্নমতের আলেমদের তত্ত্বতথ্য এবং মতামতও শোনা দরকার। কারণ সংগীত আমাদের সাংস্কৃতিক শিকড়, সেখানে কোনও রকম দ্বিধা জাতিকে অতল গহ্বরে ফেলে দেবে।

আমাদের আধুনিক, পঞ্চকবি, লোকগীতি, ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালি-মুর্শিদী, ব্যান্ড, বিয়ে, বাউল ও ধান ভাঙার গান, বিভিন্ন ধর্মীয় সংগীত থেকে শুরু করে সাপ-ধরা বেদে ও ছাদ-পেটানো পেশার গান, দেবর-ভাবির পরিহাস, নানা-নাতির গম্ভীরা বা কবিয়ালের তাৎক্ষণিক গান-যুদ্ধ- আশ্চর্য সম্পদ। আর, একাত্তরে? একাত্তরে গান আমাদের 'দৃপ্ত স্লোগান, ক্ষিপ্ত তির-ধনুক'।

কোরান-হাদিস-দলিলে যাবার আগে কিছু ভিন্নমতের বিশ্ববিখ্যাত বিশেষজ্ঞের কথা শোনা যাক। বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ ইসলামী নেতা ড. ইউসুফ কারজাভি, বিশ্বময় ইসলামি ব্যাংক, আন্তর্জাতিক বহু শারিয়া সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতা। তার বই 'দ্য লফুল অ্যান্ড প্রোহিবিটেড ইন ইসলাম'-এর 'সিংইং অ্যান্ড মিউজিক' অধ্যায় থেকে, পৃষ্ঠা ২৯৬-৩০০। এর পরেও কেউ গান হারাম বললে আমাদের সাথে নয়, সাধ্য থাকলে তার সাথে বিতর্ক করে তাকে পরাজিত করুন। প্রতিটি শব্দ গুরুত্বপূর্ণ, উদ্ধৃতি:

"সঙ্গীত এমন বিনোদন যাহা প্রাণে আনন্দ দেয়, হৃদয় তৃপ্ত করে এবং শ্রবণকে আরাম দেয়... উত্তেজনাপূর্ণ না হইলে ইহার সহিত বাদ্যযন্ত্র থাকিলে ক্ষতি নাই... আয়েশা বলিয়াছেন যখন এক আনসারের সাথে এক মহিলার বিবাহ হইতেছিল তখন রাসুল (সা.) বলিলেন, 'আয়েশা, তাহারা কি চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করিয়াছে ? আনসারেরা চিত্তবিনোদন ভালোবাসে' (বুখারি)।" ইবনে আব্বাস বলিয়াছেন আয়েশা তাহার এক আত্মীয়াকে এক আনসারের সাথে বিবাহ দিলেন। রাসুল (সা.) আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহার সাথে কি কোনও গায়িকা দিয়াছ?'

আয়েশা বলিলেন, 'না।' তখন রাসুল (সা.) বলিলেন, 'আনসারেরা কবিতা ভালোবাসে। এমন কাউকে পাঠানো তোমার উচিত ছিল যে গাহিবে–আমরা আসিলাম তোমাদের কাছে, আমাদের সম্ভাষণ করো, আমরাও তোমাদের সম্ভাষণ করি' (ইবনে মাজাহ), আয়েশা বলিয়াছেন- ঈদুল আজহা'র দিনে মিনা'তে তাহার সহিত দুইজন বালিকা ছিল যাহারা 'দফ' বাজাইয়া গান গাহিতেছিল। রাসুল (সা.) মুখ চাদরে ঢাকিয়া তাহা শুনিতেছিলেন (হাদিসে আছে তিনি মুখ ঢেকে শুয়েছিলেন), আবু বকর আসিয়া বালিকাদিগকে বকাবকি করিলেন।

রাসুল (সা.) মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, 'উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, আবু বকর, আজ ঈদের দিন।' (বুখারি ও মুসলিম)।

ইমাম গাজ্জালি তাহার 'এহিয়ে উলুম আল্ দ্বীন' কেতাবে ('গান শোনা' অধ্যায়ে 'অভ্যাস' পরিচ্ছেদে) গায়িকা-বালিকার উল্লেখ করিয়াছে–'... ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে গান গাওয়া ও খেলাধুলা করা হারাম নহে... দলিলে আছে বহু সাহাবি ও পরের প্রজন্মের মুসলিম বিশেষজ্ঞরা গান শুনিতেন ও ইহাতে কোনো দোষ দেখিতেন না। গবেষকদের মতে গান গাহিবার বিরুদ্ধে যেসব হাদিস আছে তাহা নির্ভরযোগ্য নহে।'

আইনবিদ আবু বকর আল্ আরাবি বলেন, 'সংগীত নিষিদ্ধের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনওই হাদিস নাই।' ইবনে হাজম (১১শ শতাব্দীর স্পেন খেলাফতের বিখ্যাত শারিয়াবিদ–লেখক) বলিয়াছেন, 'এই বিষয়ে (সংগীত নিষিদ্ধের বিষয়ে–লেখক) যাহা কিছুই লেখা আছে সকলই মিথ্যা ও ভেজাল।'

(সুরা লোকমান ৬-এর ব্যাপারে) ইবনে হাজম বলেন, "এই আয়াতে আল্লাহর পথ নিয়া ঠাট্টা করার অভ্যাসকেই আল্লাহ নিন্দা করিয়াছেন, উহাকে নহে যেই অলস কথাবার্তা মানুষ করে মানসিক প্রশান্তির জন্যই, কাউকে আল্লাহর পথ হইতে পথভ্রষ্ট করার জন্য নহে। সুরা ইউনুস, আয়াত ৩২-এর ভিত্তিতে যাহারা বলেন সঙ্গীত যেহেতু 'সত্য' নহে তাই সংগীত নিশ্চয়ই 'মিথ্যা', তাহাদের যুক্তিকেও ইবনে হাজম ভুল প্রমাণ করিয়াছেন। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ'র প্রতি দায়িত্ব পালন ও ভালো

কাজের শক্তিলাভের জন্য চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে গান শোনে সে আল্লাহ'র অনুগত বান্দা এবং তাহার এই কর্ম সত্য। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহ'র প্রতি বাধ্য বা অবাধ্য হইবার চিন্তা না করিয়া গান শোনে, সে নিরপেক্ষ ও ক্ষতিকর নহে এমন কাজ করে যেমন পার্কে যাওয়া বা হাঁটিয়া বেড়ানো, কিংবা জানালায় দাঁড়াইয়া আকাশ দেখা, কিংবা নীল বা সবুজ কাপড় পরা ইত্যাদি। যাহা হউক, সংগীতের ব্যাপারে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, যেমন গানের কথায় যদি মদ্যপানের প্রশংসা থাকে ও লোককে মদ্যপানে উৎসাহিত করা হয়, তবে উহা গাওয়া বা শোনা হারাম। গানের পরিবেশনাও উহা হারাম করিতে পারে যেমন গানের সাথে শারীরিক উত্তেজক অঙ্গভঙ্গি।" –উদ্ধৃতি শেষ।

মওলানা মওদুদি বলেছেন, "সংগীত, নৃত্য ও চিত্রশিল্পকলা হইল অশ্লীল শিল্প ও কঠিনভাবে ইসলামবিরোধী"–'এ শর্ট হিস্ট্রি অব দ্য রিভাইভালিস্ট মুভমেন্ট ইন্ ইসলাম' পৃ. ৩০।

তাই ? 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' হারাম ? 'আমি বাংলার গান গাই', 'বাড়ির পাশে আরশিনগর', 'কান্দে হাছন রাজার মন ময়না' অশ্লীল শিল্প ? বাংলার মা'দের মধুকণ্ঠে 'আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা' কঠিনভাবে ইসলাম-বিরোধী? কী হাস্যকর!

স্পষ্টতই, গানের কুৎসিৎ কথা, কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গি বা গানের অতিরিক্ত নেশায় জীবনের ক্ষতি ইত্যাদির সীমা টানেননি তাঁরা, পুরো সংগীতকেই ঢালাওভাবে বাতিল করেছেন কিছু হাদিস ও কোরানের দুটো আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে। আয়াত দুটো হলো (১) সুরা লোকমান ৬–"একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ'র পথ হইতে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে...", এবং (২) বনি ইসরাইল ৬৪ (আল্লাহ শয়তানকে বলছেন)–"তুই তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়াজ দ্বারা, অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে সত্যচ্যুত করে তাদেরকে আক্রমণ কর।"

তারা বলেন, সুরা লোকমান ৬-এর 'অবান্তর কথাবার্তা'-ই নাকি 'সংগীত' (মওলানা মুহিউদ্দিনের কোরানের অনুবাদ, পৃ. ৭৮৩ ও ১০৫৩-৫৪)।

কী হাস্যকর। আম জিনিসটা আমই, জামও নয় কাঁঠালও নয়। 'অবান্তর কথাবার্তা' অবান্তর কথাবার্তাই, অন্যকিছু নয়। একই খেলা করা হয়েছে বনি ইসরাইলের ৬৪ নম্বর আয়াত নিয়েও ।

এর অনুবাদ করা হয়েছে: "তুই তোর চেলাবেলা, লোক-লস্কর দ্বারা ও রাগ-রাগিণী গান-বাজনা ও বাদ্যবাজনা দ্বারা মানুষকে বিপথগামী করার চেষ্টা চালিয়ে যা।"

অনুবাদটা ডাহা মিথ্যা। সংগীতের আরবি শব্দ "মুসিকি", আয়াতটায় আছে 'সাওত' অর্থাৎ 'আওয়াজ'। কিছু সত্যনিষ্ঠ অনুবাদও আছে, যেমন–"তুই সত্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়াজ দ্বারা... "–হাবিবুর রহমান।

তাদের হাদিসগুলো কারজাভি, আবু বকর আল্ আরাবি, ইবনে হাজম প্রভৃতি ইমামেরা সরাসরি বাতিল করেছেন, যা ওপরে দেখিয়েছি, এবারে চলুন সেই বিশেষজ্ঞদের কথা শুনি যা আমাদের ইমামেরা বলেন না।

১. "রাসুল (সা.) বিবাহ-অনুষ্ঠানে গানের শুধু অনুমতিই দেন নাই বরং বালিকাদের গান শুনিয়াছেন। এমনি এক অনুষ্ঠানে যখন তাহারা গাহিতেছিল–'আমাদের মধ্যে এক রাসুল আছেন যিনি জানেন আগামীকাল কী ঘটিবে'–তখন তিনি তাহাদিগকে থামাইয়া বলিয়াছেন 'এই বাক্যটি বাদ দাও এবং গাহিতে থাকো।' ইহাকে শুধু বিবাহ-অনুষ্ঠানের অনুমতি মনে করিবার কোনোই কারণ নাই।" (অর্থাৎ বিয়ের অনুষ্ঠান ছাড়াও গানকে নবীজি অনুমতি দিয়েছেন)। কানাডার সুবিখ্যাত ইমাম শেখ আহমেদ কুট্টি।

২. "হজরত ওমর (রা.)-এর আবাদকৃত শহরের মধ্যে দ্বিতীয় হইল বসরা। আরবি ব্যাকরণ, আরুয শাস্ত্র এবং সংগীতশাস্ত্র এই শহরেরই অবদান"–বিখ্যাত কেতাব 'আশারা মোবাশশারা', মওলানা গরীবুল্লাহ ইসলামাবাদী, ফাজেল-এ দেওবন্দ, পৃষ্ঠা ১০৬।

৩. অখণ্ড ভারতের সর্বোচ্চ ইসলামি নেতাদের অন্যতম, ভারতীয় কংগ্রেসের দু' দু'বারের সভাপতি, কলকাতার ঈদের নামাজ পড়ানোর

পেশ ইমাম মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন : "পয়গম্বর দাউদ (আ.)-এর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মিষ্টি ছিল। তিনি সর্বপ্রথম হিব্রু সংগীতের সংকলন করেন ও মিসরের ও ব্যাবিলনের গাছ হইতে উচ্চমানের বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবন করেন"–তাঁর তর্জুমান আল্ কুরান, ২য় খণ্ড পৃ. ৪৮০।

৪. যাঁদের পড়ার ধৈর্য নেই কিন্তু নাটক-সিনেমার পোকা তাঁরা দেখুন পাকিস্তানি ছায়াছবি 'খুদা কে লিয়ে'–নাসিরুদ্দীন শাহ্ দুর্ধর্ষ অভিনয় করেছেন দরবেশের ভূমিকায়। ওটাতেও সহি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হয়েছে ইসলামে গান হারাম নয়।

৫. ইমাম গাজ্জালি: "নবী করিম (সা.) হজরত আবু মুসা আশআরী (রা.) সম্পর্কে বলিয়াছেন–তাঁহাকে হযরত দাউদ (আ.) এর সংগীতের অংশ প্রদান করা হইয়াছে"–মুরশিদে আমিন, পৃষ্ঠা ১৭০–এমদাদিয়া লাইব্রেরি।

ফেরা যাক প্রয়াত আইয়ুব বাচ্চুর কাছে। "কথাগুলো বলে তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিলেন... অনুরোধ করলেন যে উনি জীবিত থাকা অবস্থায় আমরা যাতে ওনার এই আর্থিক সহযোগিতার কথা কাউকে না বলি।"

হ্যাঁ, এরই নাম আইয়ুব বাচ্চু। গরিব মারা যাচ্ছে, ফেসবুকে এ খবর পেয়েই যিনি বারবার ছুটে যেতেন হাসপাতালে, তার লক্ষ লক্ষ টাকার গোপন দানে বেঁচে গেছে অনেক গরিবের প্রাণ। এরই নাম আইয়ুব বাচ্চু, যিনি নাকি দোজখে যাবেন। তার মৃত্যুর পর আজ যে ইমামেরা তাঁর গিবত করছেন (তাদের উৎকট ভঙ্গি আর কদর্য ভাষার কথা নাই বা বললাম) তারাও নিশ্চয় গোপনে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে অনেক গরিবের প্রাণ বাঁচাচ্ছেন, তারা গত হলে আমরা তা-ও জানব আশা করি!

আর, বাড়াবাড়ি করা? 'সংগীত হারাম' বলাও তো সেই বাড়াবাড়ি–মায়েদা ৭৭, নিসা ১৭১ ও বিদায় হজের ভাষণ। সংগীত আমাদের সসীম জীবনে এক টুকরো অসীমের ছোঁয়া। গান যে ভালোবাসে না সে মানুষ খুন করতে পারে। সংগীত আজ বিশাল ইন্ডাস্ট্রি, সেখানে লক্ষ লোক পরিবার পালছেন, বাচ্চাদের বড় করছেন, প্রতিভার বিকাশ ঘটাচ্ছেন।

আলেমরা খেয়াল করছেন না যে, যা তারা বলছেন তা তাদেরই বিরুদ্ধে যায়। কারণ তারাই দাবি করেন ইসলাম 'ফিতরাত'-এর অর্থাৎ স্বভাবের ধর্ম। তারা খেয়াল করছেন না, যে আদিকাল থেকে সংগীত মানুষের ফিতরাত অর্থাৎ স্বভাব। মানুষ কখনোই সংগীত ছাড়া থাকেনি, থাকবেও না। প্রমাণ অতীতের গুহার দেয়ালে-চিত্রে ও বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সংগীতের প্রবল বন্যায়। তাই প্রাকৃতিক আইনেই তাদের দাবি টিকবে না।

তাদের বলার অধিকার আছে, তারা বলেছেন, বলছেন, বলতে থাকুন, জাতি শোনেনি শুনবে না। কিন্তু পরিবর্তন তাদের হাত দিয়েই আসবে, ধৈর্য ধরতে হবে। হ্যাঁ, গ্যাপ একটা আছে বটে। সাধারণত এ রকম নিবন্ধের পাঠক তাদের ওয়াজে যান না এবং ওয়াজের শ্রোতারা এ রকম নিবন্ধ পড়েন না।

তাই সমাজ এগোয় না কারণ চিন্তার সংঘাতই সামাজিক অগ্রগতির চালিকাশক্তি। সবাই যদি এরকম দলিলগুলো ওই আলেম ও তাদের শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেন তবে সময়ের সাথে কিছুটা ফল আশা করা যায়।

আলেমরাও একদিন গত হবেন কিন্তু কিংবদন্তির মৃত্যু নেই...

২৯ অক্টোবর, ২০১৮

গ্রেনেড হামলার শারিয়া-বিচার !

(২০০৪ সালের ২১ আগস্ট শনিবার বিকেলে ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে একটি ট্রাকে তৈরি করা অস্থায়ী মঞ্চে আওয়ামী লীগের প্রধান এবং তখনকার বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা বক্তৃতা শেষ করার পর ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা হয়। সেই ঘটনায় মহিলাবিষয়ক সম্পাদক আইভি রহমান সহ ২৪ জন নিহত ও শেখ হাসিনাসহ প্রায় ৩০০শ নেতা-কর্মী আহত হন। আদালত ১০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বিএনপি'র সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর এবং আব্দুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ড ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমান ও হারিছ চৌধুরীসহ ১৯ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। শারিয়া কোর্টে কেমন হতো সেই মামলার বিচার? কোনও অছিলায় কী পার পেয়ে যেতেন আসামিরা? শারিয়া আইনের উদ্ধৃতিসহ সেই বিচারিক প্রক্রিয়ার দৃশ্যকল্পই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এই লেখায়।)

বিচারক, বাদীপক্ষের ও আসামিপক্ষের ব্যারিস্টার।

বাদীপক্ষ: ইয়োর অনার। ২১ আগস্ট ২০০৪ সালে এক রাজনৈতিক দলের কয়েক হাজার লোকের জনাকীর্ণ সভায় গ্রেনেড হামলায় খুন হন ২৪ জন, আহত কয়েক'শ। সেখানে নিহত হতে পারত কয়েক'শ এবং আহত কয়েক হাজার। দুনিয়ার রাজনীতির ইতিহাসে এমন হৃদয়হীন নৃশংসতা আর নেই। সবদিক দিয়েই এটা স্রেফ গণহত্যা। আল্লাহ'র কাছে হাজার শোকর যে এই গণহত্যার বিচার শারিয়া কোর্টে আল্লাহ'র আইনে হচ্ছে, কাজেই ন্যায়বিচারের গ্যারান্টি আছে। এটা সাধারণ ক্রাইম নয় ইয়োর অনার। ঘটনার ধরন, উদ্দেশ্য, সাক্ষী ও দলিলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়েছে এটা কারা করেছে এবং কেন করেছে। সারা জাতি এই খুনিদের সর্বোচ্চ শাস্তি আশা করছে ইয়োর অনার।

আসামীপক্ষ: কিছুই প্রমাণ হয়নি ইয়োর অনার। আমার বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ ভালো করেই জানেন যে দলিল ও সাক্ষী হিসেবে যা পেশ করা হয়েছে, তা আরব্য রজনীর মতোই অলীক রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেগুলো

নিয়ে বিস্তারিত তর্কবিতর্ক হয়েছে, মিডিয়াতে প্রকাশ হয়েছে, ওসব নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। আমি শুধু দেখাব এ ব্যাপারে শারিয়া আইনের উপেক্ষিত দিকটা, কেন শারিয়া আইনগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। সেটা প্রমাণ করার জন্য আমি শারিয়া বই নিয়েই এসেছি, আমাদের বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত তিন খণ্ডের বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন অর্থাৎ কোডিফায়েড ইসলামিক ল'। আমাদের ছয়জন ইসলামি বিশেষজ্ঞের কমিটি এটা মূল শারিয়া আইনের বই থেকে সংকলন করেছেন। ইচ্ছে করলে যে কেউ আইনগুলো মিলিয়ে দেখতে পারেন।

বিচারক: প্লিজ প্রসিড।

আসামীপক্ষ: ইয়োর অনার, ২১ আগস্ট ২০০৪ সালের ঘটনাটা হঠাৎ হয়নি, কোনো একজনের দ্বারাও হয়নি। এটা আবেগের মুহূর্তে উত্তেজনার বশেও হয়নি, এটা একটা সংঘবদ্ধ দলের ঠাণ্ডা মাথায় পূর্বপরিকল্পিত নিষ্ঠুর গণহত্যা। আমরা জানি, ইচ্ছেকৃত ও পরিকল্পিত হত্যা 'হুদুদ আইনে'র আওতায় পড়ে। আমরা এও জানি, হুদুদ আইনে প্রমাণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আইনের দরকারি অংশগুলো আমি বইতে হাইলাইট করেই এনেছি। আমি বিজ্ঞ প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করব এই বই, বিধিবদ্ধ ইসলামি আইনের ২য় খণ্ড থেকে ধারা ৬০০-এর হাইলাইটেড অংশটুকু পড়ে শোনাতে। আমি নিজে পড়ব না কারণ তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকবে।

বাদীপক্ষ: ইয়োর অনার। আমার বিজ্ঞ প্রতিপক্ষের সাথে আমি বহু মামলায় লড়েছি, ওনার মামলা পরিচালনার পদ্ধতি আমার জানা আছে। উনি বুঝে গেছেন যে দলিল প্রমাণ যেভাবে তার মক্কেলদের ঘিরে ধরেছে, তাতে শাস্তি তাদের হবেই। এখন তিনি আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে তাদের রক্ষা করতে চান। ওনাকে বলছি, শারিয়া আইনের যে বইগুলো আপনি এনেছেন হাতে করে, আমি সেগুলো এনেছি মগজে করে। আমি জানি ঠিক কোন আইনটা আপনি হাইলাইট করেছেন। আইনের হাইলাইটেড অংশটুকু আমি বলে দিচ্ছি, ভুল হলে ধরিয়ে দেবেন। বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৯২ ধারা ৬০০ - "হদ্দ ও কিসাসের বেলায় শুধুমাত্র

আলামতের ওপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা যাইবে না"। কারেক্ট?

আসামি পক্ষ: কারেক্ট।

বাদীপক্ষ: পরের পৃষ্ঠাতে আছে: "এই ক্ষেত্রে শাস্তি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ অথবা অপরাধীর স্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকিতে হইবে"- কারেক্ট?

আসামি পক্ষ: কারেক্ট ইয়োর অনার! শারিয়া আইন বিশ্ব-মুসলিমের ওপরে প্রযোজ্য। অপরাধ প্রমাণ করতে হলে হুদুদ আইনের অপরিহার্য শর্ত হলো চাক্ষুষ সাক্ষী। এর প্রেসিডেন্সও আছে। সাংবিধানিকভাবে ঘোষিত এক শারিয়া রাষ্ট্রের সরকারি শারিয়া কোর্টে ব্যভিচারের মামলার বিস্তারিত দলিল আমি দিতে পারব। মামলাটা হলো, প্রবাসী স্বামী কয়েক বছর দেশে আসেননি এদিকে দেশে তার স্ত্রী এক শিশুর জন্ম দিয়েছে। আমরা জানি ব্যভিচারের মামলা হুদুদের মধ্যে পড়ে। স্বামী মামলা করলেন বাচ্চাটা তার নয় বরং অমুক লোকের। তিনি দাবি করলেন, সেই লোক ও বাচ্চাটার ডিএনএ টেস্ট করা হোক, তিনি খরচ দেবেন। কিন্তু বিচারক সেটা খারিজ করে দিয়ে বললেন–"যদিও ডিএনএ টেস্ট বিজ্ঞানের দিক থেকে অমোঘ প্রমাণ কিন্তু হুদুদ আইনের নিজস্ব প্রমাণ পদ্ধতি আছে, যা হলো অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি বা চাক্ষুষ সাক্ষী"। ২১ আগস্টের হামলার কোনো চাক্ষুষ সাক্ষী নেই, কেউ কাউকে গ্রেনেড মারতে বা গুলি চালাতে দেখেনি। এখানেই এ মামলার সব অভিযুক্তেরা বেকসুর খালাস পাবার অধিকারী ইয়োর অনার।

বাদীপক্ষ: এ মামলায় কোনো অপরাধীই স্বীকারোক্তি দেয়নি তা সত্য নয় ইয়োর অনার। তাছাড়া খুন জখম চুরি-ডাকাতি ব্যভিচারের কয়টা মামলায় চাক্ষুষ সাক্ষী থাকে? আলামতের ভিত্তিতেই তো বেশির ভাগ অপরাধীর শাস্তি হয়। এই আদালতই তো বহু অপরাধীকে শাস্তি দিয়েছে শুধু আলামতের ভিত্তিতে। এমনকি আমার বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ নিজেই বহু অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করেছেন শুধু আলামতের ভিত্তিতে।

আসামিপক্ষ: হোয়াট ? আপনি আল্লাহ’র আইন বদলাতে চান?

বাদীপক্ষ: আমি বদলাবার কে! আপনি হাতের ওই বিধিবদ্ধ ইসলামি আইনের ৩য় খণ্ডের ৮৮৮ পৃষ্ঠা থেকে একটু পড়ে

শোনাবেন, প্লিজ!

আসামিপক্ষ: আপনিই বলুন।

বাদীপক্ষ: ওখানে আছে, সপ্তম শতাব্দীর ইমাম হানিফার সাক্ষ্য-আইন সাতশ’ বছর পরে স্পেনের ইমাম ইবনে হাজম আপডেট করেছেন। আসলে হাজার বছর ধরেই ইমামেরা অনেক শারিয়া আইন পরিবর্তন করেছেন। অতীত-বর্তমানের ইসলামি বিশেষজ্ঞরাই তো বলেছেন কিছু শারিয়া আইন সর্বকালের ও কিছু আইন শুধু সেই সমাজের জন্য। কোরান হাদিসে দাস-দাসীর আইন এবং অমুসলিমদের ওপরে জিজিয়া ট্যাক্সের যে শারিয়া আইনগুলো আছে, সেগুলো তো বিশ্ব মুসলিম নিজেরাই এখন আর প্রয়োগ করেন না। তাছাড়া, সাক্ষ্য বা অপরাধীর স্বীকারোক্তি ছাড়া শুধু আলামতের ভিত্তিতে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া যাবে না এটা কোরানে কোথায় আছে স্যার?

আসামী পক্ষ: আমাদের ইমামেরা কোরান হাদিসের আলোকে লিখেছেন আইনগুলো, আমরা মেনে চলতে বাধ্য। মওলানা মৌদুদী বলেছেন দুনিয়ার সব মুসলিম একসাথে হলেও আল্লাহ’র আইন বিন্দুমাত্র বদলাতে পারবেনা।

বাদীপক্ষ: হ্যাঁ, কথাটা মওদুদী বলেছেন তাঁর ‘ইসলামি ল অ্যান্ডকনস্টিটিউশন’ বইয়ের ১৪০ পৃষ্ঠায়। শারিয়া আইনে নারী রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে না। কিন্তু ওই মওদুদীই তো নির্বাচনে আইয়ুবের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাকে সমর্থন করেছেন স্যার!

বিচারক: অর্ডার, অর্ডার! এখানে ইসলামি ধর্মতত্ত্বের জটিলতা টেনে আনবেন না, মামলাটির ব্যাপারে বলুন।

বাদীপক্ষ: শেষ চেষ্টা হিসেবে উনি বোধহয় বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন

কিতাবের ১ম খণ্ড ধারা ১৩-এর কথা বলবেন ইয়োর অনার। ঠিক বলিনি স্যার?

আসামিপক্ষ: হ্যাঁ, ইয়োর অনার। যদিও আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি যে আমাদের মক্কেলরা সবাই সম্পূর্ণ নির্দোষ, তবু যদি মাননীয় আদালত কোনো কারণে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেন তবু তাদের অধিকার আছে বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড ধারা ১৩ হিরাবাহ আইনটার সুযোগ নেবার। শারিয়া বই থেকে পড়ছি,–"হিরাবাহ বলিতে সংঘবদ্ধ শক্তির জোরে আক্রমণ চালাইয়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাইয়া জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করা বোঝায়। সম্পদ লুণ্ঠন, শ্লীলতাহানি, হত্যা ও রক্তপাত ইহার অন্তর্ভুক্ত। তওবা করলে হিরাবাহ অপরাধীদের শাস্তি হবে না"।

বাদীপক্ষ: এক্সকিউজ মি! "তওবা করলে হিরাবা অপরাধীদের শাস্তি হবে না", আইনটা কি হুবহু ওই শব্দে-বাক্যে লেখা আছে স্যার?

আসামি পক্ষ: না, ...মানে...অর্থাৎ হলো গিয়ে ... মানে ইয়ে... আর কি...

বাদীপক্ষ: তোতলানোর জন্য থ্যাংকস। আইনটার হুবহু উদ্ধৃতি দিচ্ছি ইয়োর অনার। ছয়জন সম্মানিত ইসলামি বিশেষজ্ঞের যে কমিটি ৩ খণ্ডের বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন সংকলন করেছেন তাঁরা সবাই খুব ভালো মানুষ। আইনটা নিয়ে নিশ্চয় তাদের মনে খটকা লেগেছিল। তাই তারা শব্দগুলো একটু ঘুরিয়ে এভাবে লিখেছেন–"হিরাবা'র অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধী তওবা করিলেও শাস্তি হইতে রেহাই পাইবে না।"

আসামি পক্ষ: কথা তো একই হলো ইয়োর অনার। আবারও বলছি, আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি যে আমাদের মক্কেলরা সবাই সম্পূর্ণ নির্দোষ। তবু যদি মাননীয় আদালত কোনো কারণে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেন তাহলেও এই বিশেষ শারিয়া আইন মোতাবেক তওবা করে খালাস পাবার অধিকার তাঁদের আছে ইয়োর অনার।

বিচারক: (বাদীপক্ষকে) আপনার আর কিছু বলার আছে?

বাদীপক্ষ: আমি দুই হাত তুলে সম্পূর্ণ সারেন্ডার করছি ইয়োর অনার। যেখানে একটা লোককে ইচ্ছাকৃত খুন করলে শারিয়া আইনে খুনির মৃত্যুদণ্ড হয়, সেখানে তওবা করলেই গণহত্যা গণধর্ষণকারীদের শাস্তি হবে না এটা যদি আল্লাহ'র আইন হয় তাহলে আল্লাহ মুসলিমদের হেফাজত করুন !!

বিচারক: কোর্ট ইজ অ্যাডজর্নড।

২১ অক্টোবর, ২০১৮

মুসলিম নারীর তালাকের অধিকার

‘মিরপুরের নিকাহ রেজিস্ট্রার মো. আমির হোসেন ১১ বছর ধরে বিয়ে এবং তালাক রেজিস্ট্রির কাজ করছেন তিনি ডয়চে ভেলেকে (জার্মানির রেডিও - বাংলা বিভাগ) বলেন, “বিচ্ছেদের হার প্রতি বছরই বাড়ছে, আবেদনের ৭০ ভাগই আসে নারীদের কাছ থেকে”–প্রথম আলো, ২৭ আগস্ট ২০১৮।

এ নিয়ে বিশেষজ্ঞ থেকে বিশেষ অজ্ঞ পর্যন্ত অনেকেই চিন্তিত। এটাও বলা হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্র হলে শারিয়া আইন হতো, তাহলে এত সংসার ভাঙত না। কথাটা ঠিক, শারিয়া আইন হলে এত সংসার ভাঙত না। ভাঙা সংসার বাচ্চাদের মাথায় বজ্র হয়েই পড়ে–এসব নিয়ে বিশেষজ্ঞেরা বলবেন–এ নিবন্ধ শুধু সমস্যাটার শারিয়া আঙ্গিক নিয়ে। বাংলাদেশ শারিয়া রাষ্ট্র নয়। কিন্তু প্রায় সব ইমাম এবং তাঁদের অসংখ্য ভক্ত শারিয়া আইন চান। এ নিয়ে দেশে শক্তিশালী এক অদৃশ্য টানাপোড়েন বিরাজ করছে। তাই এ সম্বন্ধে আলোচনা ও গণসচেতনতার বিকল্প নেই। আমরা দেখব সংশ্লিষ্ট (১) তালাকের শারিয়া আইন (২) কোরানের হুকুম এবং (৩) নবীজির (সা.) বিধান। নিবন্ধের সূত্রগুলো কেউ চাইলে শারিয়া বইয়ের পৃষ্ঠার স্ক্যান পাঠানো যেতে পারে।

(১) তালাকের আইন

স্বামী স্ত্রীকে তিন ধাপে কিংবা তাৎক্ষণিকভাবে তালাক দিতে পারবে (বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড ধারা ৩৫১, ৩৪৩; হানাফি আইন হেদায়া পৃ. ৮১; শাফি’ই আইন উমদাত আল সালিক আইন নং এন.৩.৫; মওলানা মুহিউদ্দীনের বাংলা-কোরানের তফসির পৃ. ১২৮; মওলানা আশরাফ আলী থানভী’র “দ্বীন কি বাতে” আইন # ১৫৩৭, ১৫৩৮, ১৫৪৬ ও ২৫৫৫; ইউরোপিয়ান ফতোয়া কাউন্সিল ইত্যাদি)।

অন্যদিকে, স্ত্রী তালাক চাইলে শারিয়া কোর্টে মামলা করতে হবে, এর নাম 'খুলা আইন'। স্বামীর শারীরিক বা আর্থিক অক্ষমতা, বেশি মারপিট ইত্যাদির প্রমাণ থাকলে কাজী বিবাহ বাতিল করতে পারেন। ওগুলো প্রমাণ করা কঠিন, প্রমাণ না থাকলে কোর্ট স্ত্রীর কাছ থেকে (দেনমোহরের) টাকা বা সম্পত্তি বা ন্যায্য অধিকার ত্যাগ করিয়ে নিয়ে স্বামীর অনুমতির চেষ্টা করবে, নাহলে তালাক হবে না (বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড ধারা ৩৫৫; শাফি'ই আইন– n.5.0, হানাফি আইন হেদায়া পৃষ্ঠা ১১২, শারিয়া দি ইসলামিক ল–ড. আবদুর রহমান ডোই, পৃ. ১৯২ ইত্যাদি)। ক'বছর আগে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের সিডো (নারী অধিকার) নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলে এক মুফতি ওইসব আইনের ভিত্তিতেই বিবিসি'র সাক্ষাৎকারে বলেছেন–"ইসলামি আইন অনুসারে নারী তালাক চাহিলে তালাকের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু ইহা নির্ভর করে স্বামী তাহার অনুরোধ রাখিবে কি না তাহার ওপর।"

মুফতির দাবি এবং এই শারিয়া আইন–এক বা দুই তালাক দেবার পরে "স্বামী তাহার স্ত্রীকে আবার ফিরাইয়া লইতে পারে, স্ত্রীর সম্মতি থাকুক বা না থাকুক"–(বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড ধারা ৩৫২)–এবারে আমরা দেখব এগুলো কোরান-রাসুল (সা.) লঙ্ঘন করে কিনা।

সংসার টিকিয়ে রাখা নারীর স্বভাবগত প্রবৃত্তি। সেই স্ত্রী যখন তালাকের আবেদন করে, তখন বুঝতে হবে তার পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। স্বামী বিলক্ষণ জানে তার 'অনুমতি' ছাড়া কোর্টের সাধ্য নেই বিয়ে বাতিল করার, সে 'অধিকার'-এর পূর্ণ সুযোগ সে নেয়। স্ত্রী যতক্ষণ দেনমোহর এবং নিজের ও বাচ্চাদের কাস্টডি বা ভরণপোষণ ইত্যাদি ত্যাগ না করছে ততক্ষণ সে তালাকের অনুমতি দেবে না। সে আবার বিয়ে করবে, কিন্তু স্ত্রী করতে পারবে না এবং ততদিনই বেচারা স্ত্রীকে ঐ স্বামীর সাথেই থাকতে হবে, ঘরবাড়ি বাচ্চাদের দেখাশোনা রান্নাবান্না করতে হবে। কখনো স্বামী উপরি কামাইয়ের ধান্ধায় আরো টাকা চেয়ে বসে, এর বাস্তব উদাহরণও আমাদের কাছে আছে। তার 'অনুমতি'র চেষ্টায় বেচারা কাজীর বছরের পর বছর লেগে যায়, ততদিনই স্ত্রীকে শারিয়া কোর্টে ছুটোছুটি করতে হয়, উকিলকে অজস্র টাকা ঢালতে হয়, অফিস থেকে বিনা বেতনের ছুটি

নিতে হয় বা চাকরি ছাড়তে হয়, অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চাদের এবং নিজের ভরণপোষণের ন্যায্য অধিকারও ত্যাগ করতে হয়। এ ছাড়াও আছে সামাজিক সমস্যা। তালাকের পর চতুর্দিক থেকে তার ওপরে নষ্ট মানুষের মাছি পড়ে, কেউ বাসা ভাড়া দিতে চায় না, তার ছোট বোনের বিয়ের সমস্যা হয় বলে, সে তার বাবা, মা, ভাইবোনেরও সমর্থন পায় না। এইসব মিলিয়ে এমন ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে অসহায় স্ত্রী মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করে, কোর্টে যায় না। তাছাড়া কাজিকেও ফেরেশতা মনে করার কোনো কারণ নেই। খেলাফত আমলেও নারীর ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দেবার জন্য শারিয়া কোর্টে নতুন এক ফর্ম বানানো হয়েছিল, যাতে নারীরা বাধ্য হয়ে সই করত। উদাহরণ দিচ্ছি খেলাফত আমলে শারিয়া কোর্টের শিকায়তে দফতরী (নালিশ বিভাগ) থেকে:

"সতেরো ও আঠারো শতাব্দীতে প্রচুর খুলা হইত। খুলা পদ্ধতিতে স্ত্রীকে যেকোনো প্রাপ্য, এমনকি স্ত্রীর নিজের ও সন্তানদের ভরণপোষণও পরিত্যাগ করিতে হইত। এই জন্য খুলার দলিলে এক অতিরিক্ত কাগজ সংযোজিত করা হয়। উহাতে সন্তানদের নাম, পিতার নাম ও সন্তানদের খরচের ব্যাপারে (স্বামীর দায়িত্ব নাই, এই ব্যাপারে) স্ত্রীর স্বীকৃতির কথা লিখা থাকে। ভিদিন অঞ্চলের হাওয়া খাতুন ১৭৮৩ সালে স্বামীকে খুলা তালাক দেয়। তাহাকে মোহরের ৪০০০ অ্যাক্সেসের (তৎকালীন তুর্কি টাকা) অপরিশোধিত ১০০০ অ্যাক্সেস এবং ভরণপোষণের অর্থ পরিত্যাগ করিতে হয়...জুলাই ১৮০২–ইস্তাম্বুলের হালিমা খাতুন আসিয়া দাবি করিল যে মোহর পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহার স্বামী আহমেদ তাহাকে খুলার জন্য চাপ দিতেছে... দুর্নীতিপরায়ণ কাজিরা ষড়যন্ত্র করিত ও ঘুষ খাইত" (পৃ. ৮৯, ৯২, ১০০, ১০৪, ইত্যাদি)–'উইমেন, দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড ডিভোর্স ল'জ ইন ইসলামিক হিস্ট্রি'–ড. আমিরা আজহারি–অনেক মামলার উদ্ধৃতি।

এবারে কোরান-রাসুল (সা.)।

(২) কোরান

খুলা আইনটা সরাসরি কোরানবিরোধী। কোরানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোথাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে সংসার করতে বাধ্য করার হুকুম তো নেই বরং নারীকে তালাকের একচ্ছত্র অধিকার দেয়া আছে, উদাহরণ দিচ্ছি।

(ক) বাকারা, আয়াত ২২৯–"সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী যা দিয়ে নিজিকে মুক্ত করে নেবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। এটা আল্লাহর সীমারেখা"। অর্থাৎ "স্ত্রী যা দিয়ে নিজকে মুক্ত করে নেবে"...চিন্তা করুন কোরান কি নিঃশর্ত অধিকার দিয়েছে স্ত্রীকে দেনমোহর ফেরত দিয়ে নিজেকে বিবাহবন্ধন থেকে মুক্ত করে নেবার! এর সাথে মিলিয়ে নিন আল্ আহজাব, আয়াত ২৮–"হে নবী, আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা করো, তবে আসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দিই।" খেয়াল করুন, এই আয়াত অনুযায়ী তালাক দেয়া বা না দেয়া স্বামীর ইচ্ছের ওপরে নির্ভর করে না, স্ত্রী চাইলে স্বামী তালাক দিতে বাধ্য। আল্লাহ নিজে নবী-পত্নীদেরকে সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছিলেন নবীজির (সা.) সাথে থাকার বা ছেড়ে যাবার। তাঁরা নবীজিকে (সা.) ছেড়ে যাননি সেটা তাঁদের সেই অধিকার প্রয়োগ।

(খ) নিসা আয়াত ১৯–(সংশ্লিষ্ট অংশ) "হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও।"

এখানে 'উত্তরাধিকারী' মানে জোর করে তাদেরকে দাসী বানিয়ে নিজে মালিক বনে যাওয়া নয় বরং স্ত্রীদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাদের স্বামী হয়ে বসা। বাংলায় যেমন 'হুক্কা-খাওয়া'র মানে হুঁকোটাকে কামড় দিয়ে খেয়ে ফেলা নয়। মওদুদী বলেন, তখন কেউ মারা গেলে তার বৌদেরকে ভাই-চাচারা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে যেত, তাই এ-আয়াত। কিন্তু মওদুদী

'তাদেরকে যা প্রদান করেছ' অর্থাৎ দেনমোহর কথাটা এড়িয়ে গেছেন, যা শুধু স্ত্রীর বেলায় খাটে। অথচ বিশ্বের বেশিরভাগ ইসলামি বিশেষজ্ঞ দেনমোহর কথাটার সমর্থন করেছেন যেমন বিশ্ববিখ্যাত শারিয়াবিদ ড. জামাল বাদাওয়ী। আবারও বলছি, কোরানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোথাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে সংসার করতে বাধ্য করার হুকুম নেই।

(৩) রাসুল (সা.)

খুলা আইনটা সরাসরি রাসুল (সা.) বিরোধী।

রাসুল (সা.) দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোথাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে সংসার করতে বাধ্য তো করেনইনি বরং তাঁর ইচ্ছে ও সুপারিশের বিরুদ্ধে হলেও নারীকে তালাকের একচ্ছত্র অধিকার দিয়েছেন। উদাহরণ দিচ্ছি।

(ক) "এখনো আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে যে, বরীরার স্বামী মুগিস কাঁদিতেছে এবং তাহার পিছু পিছু ছুটিতেছে। চোখের পানিতে তাহার দাড়ি ভিজিয়া গেল। এই দৃশ্য দেখিয়া নবী করীম (সা.) বলিলেন, 'হে আব্বাস! বরীরার প্রতি মুগিসের ভালোবাসা আর মুগিসের প্রতি বরীরার উপেক্ষা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক!' তিনি বরীরাকে বলিলেন, 'তুমি যদি মুগিসকে পুনরায় গ্রহণ করিতে!' সে বলিল, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! ইহা কি আপনার নির্দেশ ?' তিনি বলিলেন, 'আমি ইহা সুপারিশ করিতেছি।' বরীরা বলিল, 'মুগিসের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নাই'।"

কি মনে হয়? মুগিস বরীরাকে এতই ভালোবাসত যে সে "কাঁদিতেছে এবং তাহার পিছু পিছু ছুটিতেছে, চোখের পানিতে তাহার দাড়ি ভিজিয়া গেল।" এমন প্রেমময় স্বামী ক'জন নারী পায়? এত ভালোবাসার পরেও "মুগিসের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নাই",–নবীজি (সা.) কি বরীরাকে বাধ্য করলেন মুগিসের সাথে সংসার করতে? নোপ্ ! দেখুন মুহিউদ্দিনের অনূদিত কোরান, পৃষ্ঠা ২৭১: "বরীরা আরজ করলেন: ইয়া রাসুলুল্লাহ! এটি আপনার নির্দেশ হলে শিরোধার্য, পক্ষান্তরে সুপারিশ হলে আমার মন

তাতে সম্মত নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন : নির্দেশ নয়, সুপারিশই। বরীরা জানতেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) নীতির বাইরে অসন্তুষ্ট হবেন না। তাই পরিষ্কার ভাষায় আরজ করলেন : তাহলে এ সুপারিশ আমি গ্রহণ করব না। রাসুলুল্লাহ (সা.) হৃষ্টচিত্তে তাকে তদাবস্থায়ই থাকতে দিলেন।" সিদ্ধান্ত গিভেন, চ্যাপ্টার ক্লোজড।

এরই নাম ইসলামি নারী-অধিকার যা স্বয়ং রাসুলের (সা.) ইচ্ছে ও সুপারিশের বিরুদ্ধে তাঁর সমর্থনেই অভ্রভেদী দণ্ডায়মান। সেই বেহেশতি অধিকার ডাকাতি হয়ে গেছে শারিয়া আইনে, আল্লাহ রাসুলের (সা.) নামেই!

(খ) সুরা আল্‌ আহজাব, আয়াত–২৯-এর পটভূমি। আয়েশা (রা.) বলিয়াছেন–আল্লাহ'র রাসুল (সা.) আমাদিগকে সুযোগ দিয়াছেন এবং আমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসুলকে বাছিয়া লইয়াছি"–সহি বুখারি–মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহসিন খান অনূদিত, ৭ম খণ্ড ১৮৮, ৩য় খণ্ড ৬৪৮।

(গ) থাবিত বিন কায়েসের স্ত্রী রাসুলের নিকট আসিয়া বলিল, 'হে আল্লাহ'র রাসুল! থাবিত বিন কায়েসের চরিত্র বা দ্বীনদারীর ওপর আমার কোনো অভিযোগ নাই। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে আমি আল্লাহ'র অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে পারিব না' (অর্থাৎ স্বামীর প্রতি কর্তব্যে গাফিলতি হতে পারে)–সহি বুখারি হাদিস ২৪৮৩, হাফেজ আবদুল জলিল।

ইহাতে রাসুল বলিলেন, 'তুমি কি তাহার বাগানটা ফেরত দিতে রাজি ?' সে বলিল, 'হ্যাঁ।' অতএব সে তাহাকে বাগান ফেরত দিল এবং রাসুল (রা.) থাবিতকে তালাক দিতে বলিলেন। (এই স্ত্রীর নাম জামিলা)। অর্থাৎ স্বামী ভালোবাসলেও কিংবা সে দ্বীনদারী ভালো মানুষ হলেও নারী বাধ্য নয় সে সংসার করতে যা তার মন চায় না। সিদ্ধান্ত গিভেন, চ্যাপ্টার ক্লোজড।

(ঘ) শুধু স্ত্রীর ইচ্ছের ভিত্তিতে নবীজি বিয়ে বাতিল করেছেন এর প্রমাণ আরো আছে। যেমন- সহি ইবনে মাজাহ ৩য় খণ্ড, ১৮৭৪। বিয়ের পর এক মেয়ে এসে তাঁকে বলল তার বাবা তার মতের বিরুদ্ধে জোর করে

তাকে বিয়ে দিয়েছেন। নবীজি (সা.) কি করলেন? তাকে ধমক দিয়ে বললেন যাও সংসার করো? নোপ্ !! তিনি তাকে দিলেন কোরানে আল্লাহ'র দেয়া অধিকার–"ইচ্ছে হলে তুমি এই বিয়ে বাতিল করতে পারো"–সিদ্ধান্ত গিভেন, চ্যাপ্টার ক্লোজড।

এইসব দলিলের ভিত্তিতে বছর পনেরো আগে মিসরের সরকার আইন পাস করেছে যে, স্ত্রী তার দেনমোহর ফিরিয়ে দিয়ে তালাকের আবেদন করলেই তালাক বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, কারো ওপর স্ত্রীকে নির্ভর করতে হবে না। এ আইনের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাৎ আলেম উলামা গ্র্যান্ড মুফতি, ইনাদের কোনো বিরোধিতার খবর আমরা পাইনি।

কালতামামি–

হ্যাঁ, দেশে শারিয়া আইন থাকলে মা-বোনেরা অত্যাচারী স্বামীর সংসারে বন্দী হয়ে পিষ্ট হতেন, তালাকের আবেদনও করতে পারতেন না, এত তালাকও হতো না। কিন্তু সেটা কি মূল্যে? সেটা নারীর সম্মান ও অধিকারের মূল্যে। ইসলাম তো শান্তির সংসার চায়, জবরদস্তির সংসার কি শান্তির হতে পারে? কোরান-হাদিসের ওই উদাহরণগুলো কি সত্যতা প্রমাণ করে? আসলে এই প্রচণ্ড নারী-বিরোধী, কোরান রাসুল (সা.) বিরোধী 'খুলা' আইনটা এসেছে ইহুদি আইন থেকে, একে বলে 'গেট'। শারিয়া আইনের মতোই ওদের এই 'গেট' আইনেও স্ত্রী তালাক চাইলে ইহুদি কোর্টে আবেদন করতে হয়, নারীর একই সর্বনাশ ঘটে। স্রষ্টা ও প্রেরিত পুরুষের নাম ভাঙিয়ে এই যে নারীর ওপরে অত্যাচার–একে কীভাবে মূল্যায়ন করব আমরা?

কোষ্ঠকাঠিন্য শুধু পেটেতেই নয়,

এ কঠিন অসুখটা বিবেকেও হয়...

১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

মন্দিরে নামাজঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সাধারণ গণমানস

> সংক্ষিপ্ত–"ভারতের কেরালা রাজ্যে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় ঈদের দিন সকালেও অধিকাংশ মসজিদই জলাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। তারা মালায় জেলার পুরাপ্পিল্লিকাভু রক্তেশ্বরী মন্দির খুলে দিয়েছেন মুসলিমদের জন্য, ঈদের নামাজ পড়ার সুযোগ হয়েছে তাদের।" (কালের কণ্ঠ ২৩ আগস্ট ২০১৮)।

ধর্মদস্যুদের সাম্প্রতিক ধর্মীয় সন্ত্রাসের অন্ধকারে এটা নিশ্চয়ই আলোকের ঝরনাধারা, কিন্তু বিরল নয়। অতীত-বর্তমানে ধর্মগুরুরা তো বটেই, সব ধর্মের সাধারণ মানুষও মানবতার এ প্রদীপটা জ্বালিয়ে রেখেছেন। উদাহরণ অজস্র, সাম্প্রতিক কয়েকটা দেখা যাক।

১. পিটারবোরো শহরের রাম-ধাম মন্দির মেরামতে দশ হাজার ডলার চাঁদা তুলে দিয়েছিলেন টরোন্টোর মুসলিমেরা–১৮ নভেম্বর, ২০১৫।

২. ভারতের পাঞ্জাবে মসজিদ নির্মাণে চাঁদা তুলে দিয়েছিলেন অমুসলিমরা–৮ অক্টোবর ২০১৫।

৩. আমেরিকার ফিলাডেলফিয়াতে দুর্বৃত্তরা ইহুদি সিনাগগ ভাঙচুর করলে (১ মার্চ ২০১৭), ইংল্যান্ডের ব্র্যাডফোর্ডে প্রাচীন ইহুদি সিনাগগ ভেঙে পড়ার দশা হলে (২০ ডিসেম্বর ২০১৩), মুসলিমেরা সেগুলো মেরামত করার জন্য চাঁদা তুলে দিয়েছেন।

৪. আমেরিকার টেক্সাসে মসজিদে আগুন ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হলে মুসলিমদের নামাজ পড়ার জন্য ইহুদি সিনাগগের কর্তৃপক্ষ তাদের হাতে সিনাগগের চাবি তুলে দেন–২০ ডিসেম্বর ২০১৩।

অসংখ্য ধর্মবিশ্বাসী-অধ্যুষিত দুনিয়ায় সাম্প্রদায়িক শান্তির প্রয়োজন অসামান্য। কিন্তু সেই শান্তি মুফতে আসেনা, তার জন্য মূল্য দিতে হয়। দেখা যাক আমাদের নবীজি (সা.)-সহ ইতিহাসে সে মূল্য কারা কীভাবে

দিয়েছেন এবং তাতে মানুষের কী লাভ হয়েছে।

১। ৬২৮ সাল। হজ করার জন্য এক হাজার (দলিলভেদে ৭০০ থেকে ১৪০০) মুসলিম সাথে নিয়ে মক্কা'র উপকণ্ঠে এসে তাঁবু গেড়েছেন বিশ্বনবী (সা.)। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাঁকে ঢুকতে দেবে না, যুদ্ধ হয় হয় ভাব। তখন মক্কাবাসী ও তাঁর মধ্যে বিখ্যাত হোদায়বিয়া শান্তিচুক্তি হয়। সেটা লিখছিলেন হজরত আলী (রা.), 'বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম' দিয়ে শুরু করে। কোরেশ-প্রতিনিধি সোহেল তাতে আপত্তি করলে নবীজি (সা.) সেটা বদলে শুধু 'আল্লাহ'র নামে লিখতে বলেন। এটা লেখার পরে লেখা হলো, "এই চুক্তি করা হলো মুহাম্মদ-উর রাসুলুল্লাহ এবং কোরেশদের মধ্যে"। সোহেল "আল্লাহর রাসুল" কথাটায় আপত্তি করলে নবীজি (সা.) তা কেটে 'আবদুল্লা'র পুত্র মুহাম্মদ' লিখতে বলেন। কিন্তু হজরত আলী তাতে রাজি হলেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল এত বিরোধ হানাহানির একটা প্রধান কারণই হলো উনি যে আল্লাহ'র রাসুল সেটা প্রতিষ্ঠা করা। তখন নবীজি (সা.) নিজের হাতে সেটা কেটে দিলেন এবং 'আবদুল্লা'র পুত্র মুহাম্মদ' লিখতে বললেন। এভাবে সেই শান্তিচুক্তি কার্যকর হলো, যার মধ্যে কিছু ধারা মুসলমানদের জন্য অসম্মানজনক ছিল যার জন্য ইতিহাসে ঐ একবারই সাহাবিদের মন নবীজির সিদ্ধান্ত মানতে চাচ্ছিল না, তাঁদের মনঃপূত হচ্ছিল না। তারপরেও তিনি চুক্তি মোতাবেক হজ না করেই ফিরে গেলেন ৫০০ কিলোমিটার দূরের মদিনায়, যেখান থেকে এত কষ্ট করে এসেছিলেন। কোনো অর্জন ছাড়াই আসা যাওয়া মিলিয়ে মরুভূমিতে স্রেফ পায়ে হেঁটে হাজার কিলোমিটার পাড়ি দেয়া কম কথা নয়।

নবীজি (সা.) দলিলের প্রমাণে ইসলামের দু-দুটো মূল বাক্যের মূল্য দিলেন এবং কোরেশদের অন্যায় দাবি মেনে নিলেন। কেন নিলেন? কারণ ভবিষ্যৎ ছিল তাঁর কাছে স্পষ্ট, পরের বছর তিনি তিন হাজার মুসলিম নিয়ে বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করলেন। (সেদিন বিশেষ অপরাধের জন্য যে আটজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল তাদের চারজন ক্ষমাও পেয়েছিল)। এরই নাম নেতৃত্বের প্রজ্ঞা, এই হলো শান্তির মূল্য। কাবা'য় আরাধনার অধিকার সম্প্রদায়ের ছিল, মুসলমানদেরও

ছিল। কিন্তু অধিকার কখন কোথায় খাটাতে হয় এবং কখন কোথায় খাটাতে হয় না তা তিনি জানতেন।

২। ১৫৮৮ সাল। ভারতের শিখদের ধর্মগুরু অর্জুনদেব। আমাদের যেমন কাবা শরিফ, ক্যাথলিকদের যেমন ভ্যাটিকান, শিখদের তেমনি স্বর্ণমন্দির বানানো হচ্ছে। গুরুর আদেশ এলো 'লাহোর থেকে মুসলিম সুফি শেখ মিয়া মীরকে নিয়ে এসো, তাঁর হাতে এই স্বর্ণমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে।' সবাই অবাক। কেন তা হবে? আমাদের সর্বোচ্চ গুরু বেঁচে থাকতে আমাদের সর্বোচ্চ উপাসনালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর অন্য ধর্মের লোকের হাতে হবে কেন ? গুরুর আদেশ এলো, 'যা বলছি করো। ভবিষ্যতের মানুষকে ধর্মীয় ভক্তির শক্তিতে ধর্মীয় বিভক্তিকে অতিক্রম করে যাবার পথ দেখিয়ে যাব আমরা।' সেই স্বর্ণমন্দির আজ সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। এ নিয়ে বিশ্বাসীরা তর্ক করতে পারেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই হলো নেতৃত্বের অতুলনীয় প্রজ্ঞা, এই হলো শান্তির মূল্য।

৩। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২, অযোধ্যা। ধর্মোন্মাদ কিছু হিন্দু নেতার নেতৃত্বে ধর্মোন্মাদ হিন্দুর দল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল ৪৭৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদ। ওটা নাকি রামের জন্মস্থান, ওই মসজিদ নাকি মন্দির ভেঙে বানানো হয়েছিল, ওখানে তারা আবার মন্দির বানাতে চায়। পরের বছরগুলোতে ভয়াবহ দাঙ্গায় খুন হলো হাজারো নিরপরাধ, প্রধানত-মুসলিম। উজাড় গ্রাম, জ্বলন্ত ঘরবাড়ি, অসংখ্য বিধবা আর এতিমের আর্তনাদে কেঁপে উঠল ভারতবর্ষ। ২০০২ সালের ৩ মার্চে হিন্দুস্তান টাইমস জনমত জরিপ করল ওখানে জনতা মন্দির চায় নাকি মসজিদ। শতকরা ৬৯ দশমিক ১৩ জন সাধারণ মানুষ জানিয়ে দিলেন মসজিদটা যদি মন্দির ভেঙে বানানো হয়েও থাকে, তবু এত রক্তারক্তি করে মানুষ খুন করে মন্দির বানাবার কোনো দরকার নেই, মসজিদের জায়গায় মসজিদই থাকুক। এরই নাম ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, এরই নাম শান্তির মূল্য যা আজকের ধর্মীয় হিংস্রতার প্রেক্ষাপটে অবিশ্বাস্য মনে হবে।

এই হলো সব ধর্মের সাধারণ মানুষের চিরন্তন গণমানস। ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এরই নাম

মানবতার শক্তি। এপারে এক ফোঁটা রক্তের সাথে ওপারে এক ফোঁটা মর্মস্পর্শী অশ্রু গড়ায় এটা ইতিহাসের সত্য–তা সে বিভক্ত বার্লিনই হোক, ইংল্যান্ড-আয়ারল্যান্ডই হোক, বিভক্ত বাংলা-পাঞ্জাব-কাশ্মীরই হোক বা ইসরাইল-প্যালেস্টাইনই হোক। তাই তো ইতিহাসের প্রতিটি বার্লিন-প্রাচীর এত ভঙ্গুর।

'মানুষের মন চায় মানুষেরই মন'–কবিগুরু। তাই তো আন্তর্জাতিক সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে এত দেয়া-নেয়া, তাইতো বম্বের সিনেমায় অভিনয় করেন পাকিস্তানি সালমা আগা, 'শত্রুর দেশ' ভারতে কনসার্ট করেন মেহদি হাসান আর তাঁর সম্পর্কে সে দেশের উচ্চতমা পদ্মশ্রী বলেন–"উন্‌কা গলে মে ভগওয়ান ঝরতা হ্যায়" (উনার কণ্ঠে স্রষ্টা উৎসারিত হন–লতা মুঙ্গেশকর)।

তাইতো আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জর্জ হ্যারিসন গানে গানে টাকা তোলেন, ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের মন্ত্রণাসভা বসে এলিফ্যান্ট রোডে বাটা'র ম্যানেজার অডারল্যান্ড সাহেবের বাসায়। তাইতো বাংলার গায়ক সুমন চট্টোপাধ্যায় সুদূর নিকারাগুয়া'র স্যান্দিনিস্তা গণযুদ্ধে জীবনের ঝুঁকি নেয় এসএলআর হাতে, রবিশংকরের সেতারে ক্যারিবিয়ান পল্লীসংগীত আর পশ্চিমা কর্ড, হলিউডের ছবিতে জাকির হুসেন আর মেঘ রাগিণীর সা-রে-মা-পা-নি-সা আর চীনা ভাষায় গেয়ে ওঠেন বাঙালিনী সাবিনা ইয়াসমিন। আশ্চর্য নয় ? এত আগুনের মধ্যেও ইসরাইল-প্যালেস্টাইনের নাট্যকর্মীরা একসাথে নাটক করেন, পুরস্কারপ্রাপ্ত ইসরাইলি ডিরেক্টর অ্যামস্‌ গিতাই-এর ছবিতে অভিনয় করেন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্যালেস্টাইনি অভিনেতা ইউসুফ আবু ওয়ার্দা। তাইতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলিম 'ভাবি' আর হিন্দু 'মাতাজি'র সম্ভ্রম রক্ষায় বুকের রক্ত ঢেলে হিন্দু আর মুসলিম যুবক ইতিহাসে রেখে যায় মহামিলনের আর্ত আহ্বান। এ আহ্বান সাময়িক ক্ষতবিক্ষত হতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মেই একদিন সে অভ্রভেদী হবে।

বাগান হোক না শত, ঝড়ে ক্ষতবিক্ষত–নামহীন কোনো ফুল ফুটবেই,

দূরদূরান্ত থেকে, যুগযুগান্ত থেকে–কলিতে অলিরা এসে জুটবেই!

তীক্ষ্ণ খরার পরে, খালবিল নদী ভরে–উত্তাল জল ছল ছলবেই,
ক্ষুদ্র মরণ শেষে, রুদ্র জীবন এসে–জীবনের রূপকথা বলবেই!
হোক পথ দুঃসহ, দুর্গম ভয়াবহ–দু-এক পথিক পথ চলবেই,
বোধের বন্ধদ্বারে, নিকষ অন্ধকারে–বিদ্রোহী কিছু দীপ জ্বলবেই!!
মাভৈ!!

২৪ আগষ্ট ২০১৮

হুংকারী মওলানা ও জারার মসজিদ...

সমস্যায় সমস্যায় জাতির মন-মগজ কন্টকিত, মাথায় আর কিছু নেবার জায়গা নেই। কিন্তু এ সমস্যাটাও কম জরুরি নয়। একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পর পাকিস্তানি আর্মি শহীদ মিনারে সাইনবোর্ডে টাঙিয়ে দিয়েছিল, "মসজিদ"। মতলব, ওরা ওখানে মসজিদ বানাবে যাতে আমরা শহীদ দিবসে ওখানে ফুল না দিতে পারি, "আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো" গাইতে না পারি, শহীদ মিনার যেন আমাদের জাতীয় চেতনার মেরুদণ্ড ও সাংস্কৃতিক তীর্থকেন্দ্রের চরিত্র হারায়।

ষড়যন্ত্রের ফসল সে মসজিদ উড়ে গেছে কালের হাওয়ায়।

বেশ কবছর আগে ঢাকার বন্ধু ফোনে বলল এক কোটি-কোটিপতির ছয়তালা দালান জুড়ে সুবিশাল গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি। হঠাৎ একদিন মালিক হনহন করে এসে হেঁকে বলল দেশ গোল্লায় গেছে কারণ মানুষ নামাজ পড়ছে না। তাই সে পাঁচতলায় বানিয়েছে মসজিদ, দেখাশোনা ও ইমামতির জন্য এক ইমামকে চাকরি দেয়া হয়েছে। সবাইকে নামাজ পড়তে হবে, নামাজের সময়টা ব্রেক টাইমের বাইরে এক্সট্রা, সে সময়ের বেতন কাটা হবে না। কোনো মুসলমান নামাজ না পড়লে সটান চাকরি নট। ধন্য ধন্য পড়ে গেছে সারা কোম্পানিতে। বললাম–"ভালোই তো করেছে"। বন্ধু হেসে বলল, "ব্যাটা কতবড় ধান্ধাবাজ তুমি জানো না। দালানের অনুমতি ছিল চারতলা, করেছে ছয়তালা। রাজউক কীভাবে সেটা টের পেয়েছে, ইন্সপেকশন হবে শিগগিরই। তাই পাঁচতালায় করেছে মসজিদ যাতে রাজউক মসজিদ ভাঙার সাহস না পায়, দালানটা বেঁচে যায়"।

ষড়যন্ত্রের ফসল এ মসজিদও উড়ে গেছে কালের হাওয়ায়।

কোরানে উল্লেখিত মসজিদগুলোর একটা হলো মদিনার কোবা এলাকার জারার মসজিদ। ভেতর থেকে মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য খ্রিষ্টান পাদ্রি আবু আমীর-এর উসকানিতে কিছু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণের

ভান করে ওই মসজিদ বানায়। ওখানে ওরা নামাজ পড়ত ও ফিতনা অশান্তি সৃষ্টি, মুসলিমদের বিরুদ্ধে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ইত্যাদি নানারকম ষড়যন্ত্র করত। মসজিদটাকে আরো বৈধ করার জন্য ওরা নবীজিকে (সা.) অনুরোধ করে তিনি যেন সেখানে অন্তত এক ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি করেন। নবীজি (সা.) তখন তাবুক অভিযানে ব্যস্ত, বললেন পরে করবেন। তাবুক থেকে ফেরার পথে তাঁকে সতর্ক করে সুরা তওবা আয়াত ১০৭ আয়াত নাজিল হলোঃ

"আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফর ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এর আগে আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছে তার গোপন ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে, আমরা কেবল ভালো চেয়েছি; আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী"।

নবীজি (সা.) সাহাবিদের আদেশ দিলেন–"যাও, ওই মসজিদকে ভেঙে গুঁড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে এসো"। সাহাবিরা ওটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে এলেন। যুক্তিসংগত ভাবেই বলা যায় কোনো প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠান ইসলামের নামে হলেও সেখান থেকে জেনে বা না জেনে অশান্তি, ফিতনা, ঘৃণা ছড়ানো হলে সেটা ইসলামি হতে পারে না, সেটা জারার মসজিদের মতোই অবৈধ।

দেশে অজস্র ওয়াজ মাহফিল হয়, যার প্রভাব জনগণের ওপর ব্যাপক। জাতির ও মওলানাদের মাইন্ডসেট বুঝবার জন্য সেগুলো দেখার ও বিশ্লেষণ করার দরকার আছে। কিছু ওয়াজ মাহফিলে ইসলামের বিভিন্ন আঙ্গিক বা একই বিষয়ে বিভিন্ন আলেমের ভিন্ন মতামত নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে উপভোগ্য ও শিক্ষামূলক আলোচনা হয়। আবার কিছু ওয়াজে শুনি কম্পিউটার, মোবাইল, বিমান, মাইক, ফেসবুক ইত্যাদি কোরান থেকে গবেষণা করে আবিষ্কার করা হয়েছে, কিংবা রোহিঙ্গাদের নিয়ে আল্লাহ খুব চিন্তিত, কিংবা গত রাতে মোবাইলে আল্লাহর সাথে বক্তার কথা হয়েছে ইত্যাদি। এক মওলানা আবার জনতাকে মোবাইলে ধারণকৃত দোজখে অসংখ্য পাপীদের পুড়ে যাবার আর্তচিৎকার শোনালেন, ওটা

নাকি বিজ্ঞানীরা পাইপের সাথে ক্যামেরা লাগিয়ে সাইবেরিয়াতে মাটির অনেক গভীরে ঢুকিয়ে রেকর্ড করেছেন। আমরা যারা নববর্ষ পালন করি তাঁদের পরকাল নিয়ে আরেক মওলানা "অত্যধিক চিন্তিত", সেজন্য তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ। কোনো কোনো বক্তা আবার ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গলার রগ ফুলিয়ে হুংকার-চিৎকার করে মৃগীরোগীর মতো হাত-পা ছুড়তে থাকেন।

কিছু কিছু ওয়াজ মাহফিলে উগ্র ভাষায় অশান্তি, ফিতনা, ঘৃণা এবং নারী-বিরোধিতা ছড়ানো হয় যাতে ইসলামের এক ভয়ংকর চেহারা ফুটে ওঠে। উদাহরণ দিচ্ছি ওয়াজে মাওলানার বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে, এর সাথে তাঁর দেহ ও মুখের হিংস্র ভঙ্গি যোগ করে নেবেন:

"আপনারা বাপ্ বেটিতে কি লজ্জা বেচে খেয়েছেন ? বিবাহের বাড়িতে নারীদের যেতে দেবেন না... নারী জন্ম হওয়াই কলঙ্ক, কুলক্ষণ, অমঙ্গল। নারীর কোনো আত্মা নেই। নারীর জন্ম হয়েছে সেবার জন্য। স্বামী স্ত্রীকে বিক্রি করতে পারে। স্ত্রী হচ্ছে বাড়ির সম্পদ, জিনিসের মতো। নারী তার স্বামী নির্যাতন চালালেও অন্য কোথাও যেতে পারবে না, ... আপনি মারা গেছেন নাকি আপনার স্ত্রী বাজারে আসে পটল কিনতে? ছিছিছি সারাদিন আপনার স্ত্রী ধাক্কা খেয়ে বেড়ায়, আপনি পুরুষ না অন্য কিছু। আপনি মানুষ না নিজেকে পশু মনে করেন? ... নিজেকে কি গরু-ছাগল মনে করেন নাকি? আপনার স্ত্রী বাজারে আসলো কেন? ও হাট-বাজার করার প্রয়োজন মনে করল কেন? আপনি কি করেন, কাপুরুষ? লজ্জা হয় না, শরম হয় না, হায়া হয় না, ইতস্ততঃ হয় না? আপনার মতো কাপুরুষের কারণে আজকে সমাজ নষ্ট হয়েছে... তুমি মাঠে গেলে জাহান্নামে যাবা, নষ্টা মেয়ে তুমি, সমকামী মেয়ে তুমি, নোংরা মেয়ে তুমি, বর্বর মেয়ে তুমি, অসভ্য মেয়ে তুমি, অশিক্ষিতা মেয়ে তুমি। তোমার নীতিকে কবর দিতে এসেছি তুমি মনে রেখো। তুমি বাজারে আসবে কেন? তোমার লজ্জা বোধ হয় না ? তোমার শরম বোধ হয় না? তোমার স্বামী কি মারা গেছে? তোমার বড় ছেলে কি মরেছে? তোমার কাজের লোক কি মরেছে? তুমি বাজারে এসেছো কেন? তুমি কেন এইখানে"??–উদ্ধৃতি শেষ।

ভয়াবহ ব্যাপার। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন বক্তৃতা নয়, এটা এরকম বহু বক্তৃতার একটা মাত্র। এটাকে কোনোমতেই ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। ফেসবুকে যেখানে মতামতে পান থেকে চুন খসলেই সরকারের চুল পটাং করে খাড়া হয়ে যায় সেখানে এঁদের প্রতি সরকার নববধূর মতো ঘোমটা দিয়ে সলজ্জ নীরব। এইসব হুংকারী মাওলানারা অপ্রতিহত ভাবে অবাধ ও শর্তহীন বাকস্বাধীনতা ভোগ করেন। তাঁদের সংখ্যা কম কিন্তু তাঁদের অনেক আবেগপ্রবণ ভক্ত আছে যারা বুঝতেও পারে না অলক্ষ্যে অগোচরে তাদের রক্তে ইসলামের নামে ঘৃণা ও হিংস্রতা ঢোকানো হচ্ছে। চিন্তা চেতনায় হিংস্রতা একবার ঢুকে গেলে সেটা বের করা প্রায় অসম্ভব এবং সেটা কোনো বিশেষ বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না, সেটা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। আমাদের প্রতিটি জঙ্গি কোনো না কোনো উগ্র মওলানার অপদর্শনে দীক্ষিত।

বিশ্বের অনেক দেশে পঙ্কিল রাজনীতি ক্ষমতালিপ্সায় সাফল্যের সাথে হিংস্র ধর্মগুরুদেরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রক্ষা ও সহায়তা করে থাকে। কিন্তু সব সরকারই এমন নয়। সম্প্রতি অস্ট্রিয়া এরকম (সব মসজিদ নয়, সব ইমামও নয়) ঘৃণা প্রচারকারী ৭টি মসজিদ বন্ধ করে দিয়েছে, দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ৬০ জন মওলানাকে। পিছিয়ে নেই সৌদি ও আমিরাত সরকারও। কোনো বিধর্মী সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা ছড়ানোর বিরুদ্ধে আইন পাস করেছে আমিরাত (কানাডার প্রাচীনতম সাপ্তাহিক "দেশে বিদেশে"–০৭-২১-২০১৫) এবং সৌদি আরবে "ইমামেরা রাজনীতি-সম্পৃক্ত খুতবা দিতে পারবেন না"–(আরব নিউজ রিপোর্ট–ও এশিয়া নিউজ ০১.০৪.২০১৪)।

অনেকে বলেন–"ওরা যদি পারে তাহলে আমরা কেন নয়? কোরান তো বলেইছে ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ"–বাকারা ১৯১। দেশে এমন আইন তো আছেই, সরকারের উচিত অনতিবিলম্বে সে আইন কঠিনভাবে প্রয়োগ করে ফিতনা সৃষ্টিকারী এইসব হুংকারী মাওলানাদের কঠিনভাবে দমন করা এবং সেটা এখনই। সেটা কখনোই হয়নি, সরকারগুলো ভয় পায় বলেই এটা এত বেড়েছে"। আমি কিঞ্চিৎ দ্বিমত পোষণ করি। সমস্যার চরিত্র অনুযায়ীই সমাধান বের করতে

হয়, নইলে আরো সমস্যার জন্ম হয়। যেমন, একাত্তরের আগে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে আমাদের সমস্যাটা ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক। সে সমস্যার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমাধান বের করার মেধা সৈন্যদের থাকার কথা নয়, ছিলও না। পাকিস্তান সরকার সেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যাটার সামরিক সমাধান প্রয়োগ করার ফলে কোটি মানুষের জীবন ও শান্তি ধ্বংস হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে পাকিস্তান নিজেও।

ধর্মীয় অনাচার শুধু আইন করে দূর করা যায় না। উত্তর আফ্রিকায় নারীর মুসলমানি বা খতনা করার মতো বর্বর প্রথা ইসলামের নামে জাঁকিয়ে আছে হাজার বছর, বেশ কয়েকটা দেশ এর বিরুদ্ধে আইন করেছে কিন্তু কিচ্ছু লাভ হয়নি। বাংলাদেশে তাৎক্ষণিক তালাকের বিরুদ্ধে আইন আছে (যেটাতে হিল্লার নামে মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করা হয়)। মিডিয়ার খবরে আসে না কিন্তু গ্রামগঞ্জে ওটা কমবেশি চলছেই। আমাদের গ্রামভিত্তিক তৃণমূল আন্দোলনের কর্মীরা গত এক বছরে ছয়টা হিল্লা বন্ধ করতে পেরেছেন। তার মধ্যে চারটে বন্ধ হয়েছে ওই ফতোয়া প্রদানকারী মওলানাকে দলিল দিয়ে বোঝানোর পর, তাঁরা নিজেরাই তাঁদের ফতোয়া ফিরিয়ে নিয়েছেন। ঐসব গ্রামে আর কোনো দিন ইসলামের নামে এসব অনাচার হবে না, অন্ততঃ ছজন মুসলিম নারী ধর্ষণ থেকে বেঁচে গেছেন। নীরব বিপ্লব নয় এটা? ঢাকার রাজনীতি, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের হুলুস্থুল ঢক্কানিনাদ থেকে বহু দূরে গত সাত-আট বছর ধরে রোমান্টিক মুভি'র মাধ্যমে ইসলামি দলিল দেখিয়ে গ্রামবাসীদেরকে শিক্ষিত করা হচ্ছে, নীরব বিপ্লব ঘটছে দেশের গ্রামে গ্রামে।

কিন্তু সমস্যাটা যেহেতু ধর্মীয়-সামাজিক, তাই আইন প্রয়োগের পাশাপাশি এটার ধর্মীয়-সামাজিক সমাধানের বিকল্প নেই। এখানেই চলে আসে শান্ত ও প্রাজ্ঞ আলেমদের ভূমিকা। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে উগ্র মওলানাদের নিন্দা ও প্রতিরোধ কেন করেন না জানি না। কিন্তু করলে তাঁরা ব্যাপক জনসমর্থন বিশেষ করে নারীদের সমর্থন পাবেন এবং উগ্র মওলানারা কোণঠাসা হয়ে পড়বেন। তাতে সরকারের পক্ষেও আইন প্রয়োগ করা সহজ হবে।

দেশে পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের ইমাম চাচারা ছিলেন হাস্যমুখ স্নেহপ্রবণ। তাই সব ধর্মের মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধা করত। বাংলাদেশের শুভশক্তি এখন এই হুংকারী মওলানাদের চাপের মধ্যে পড়ে গেছে। এমনিতে আলেমের বিরুদ্ধে আলেমে ভরে আছে মুসলিম ইতিহাস। ইমাম বুখারি আবু হানিফা শাফি থেকে শুরু করে বড়পীর আবদুল কাদের জিলানি এমনকি বর্তমান মওলানারা পর্যন্ত হেন আলেম পাওয়া কঠিন যাঁর বিরুদ্ধে কোনো না কোনো আলেম দাঁড়াননি। কোরান সৃষ্ট না অসৃষ্ট, আল্লাহ'র হাত-পা আছে কিনা, নবীজির (সা.) মেরাজ শারীরিক হয়েছিল নাকি রুহানি, তাঁর শরীরে মশা-মাছি বসত কিনা, তিনি সামনে-পেছনে চতুর্দিকে দেখতে পেতেন কি না ইত্যাদি হাজারো বিষয় যেগুলোর প্রভাব সমাজে কম সেগুলো নিয়ে তাঁরা পরস্পরের বিরোধিতা, সমালোচনা, অপমান করেছেন করছেন। কিন্তু সমাজে হিংস্রতা প্রচারের সমস্যাটা ওগুলোর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর।

পরস্পরের প্রতি ঘৃণায় ঘৃণায় জাতি আজ ক্ষতবিক্ষত। মানুষের পরিচিতি আজ মানুষ নয়, পরিচিতি হলো কার গায়ে কোন দলের স্ট্যাম্প মারা আছে সেটা। অভিধানের বাইরে মূল্যবোধ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিরোধের সমাধান আলাপ আলোচনা বিতর্কে সমঝোতায় নয়, বিরোধের একমাত্র সমাধান হলো কতল। এই কালনাগ ক্রমাগত ছোবল দিয়ে চলেছে। জাতির আজ সবচেয়ে বড় দরকার হেদায়েত। আমাদের শত সংকটের সর্বপ্রধান হলো মূল্যবোধের সংকট। দায়িত্বটা শিক্ষক রাজনীতিবিদ সাহিত্যিক ব্যবসায়ী সাংবাদিক সুশীল সমাজ সবারই, কিন্তু দায়িত্বটা সবচেয়ে বেশি ধর্মগুরুদেরই। তাঁদের প্রতি ইসলামের আর্ত আহ্বান জানিয়ে শেষ করছি, আর আমাদের ঘৃণায় ঘৃণায় ক্ষতবিক্ষত বিভক্ত করবেন না–আমাদের হেদায়েত দিন, মূল্যবোধের আহ্বান করুন।

ওটাই ইসলাম।

১৫ জুন, ২০১৮

পোশাক ও যৌনতা–নিকাবনামা

ইসলাম এক, আল্লাহ এক, কোরান এক, রাসুল এক। কিন্তু আলেমরা মুসলিম নারীর জন্য অন্তত ৩ রকমের বিভিন্ন পোশাককে দাবি করেছেন ইসলামি বলে। (ক) শুধু চোখ খোলা রেখে সারা শরীর ও চেহারা আবৃত যেমন আফগানিস্তানে তালেবানরা আইন করেছিল (নেকাব বা নিকাব), আমাদের অনেক মওলানাও এ দাবি করে থাকেন, (খ) চেহারা ও হাতের কবজি পর্যন্ত খোলা রেখে সারা শরীর আবৃত যেমন বহু মুসলিম দেশে আছে, এবং (গ) সংযত পোশাক, শুধু নামাজ-আজান ইত্যাদি ও গুরুজনের সামনে মাথায় কাপড় দেয়া, যা ইসলাম প্রচারকেরা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যা আমরা করতে দেখেছি নানি-দাদিদেরকে। যেখানে নেতারাই বিভক্ত সেখানে আমরা তো বিভক্ত হবই। সমস্যা হয় যখন সমর্থকদের তো বটেই কোনো কোনো আলেম/মওলানাদের ওয়াজ বক্তৃতায় উৎকট গালাগালি শুরু হয়ে যায়। প্রমাণ হয় যে আমরা এখনো পরস্পরের সম্মান বজায় রেখে সুস্থ বিতর্ক-আলোচনার যোগ্য হয়ে উঠিনি। প্রতিবাদের ভাষা আসলেই প্রতিবাদীর চরিত্র প্রমাণ করে। এবারে আমরা দেখব (১) কেতাব, (২) বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এবং (৩) বাস্তব।

(১) কেতাব

- কোরানে এ ব্যাপারে আয়াত আছে নুর ৩০, ৩১, ৬০ ও আহজাব ৫৩ ও ৫৯। সবার কাছেই কোরান আছে বলে উদ্ধৃতি দিচ্ছি না, লম্বা হয়ে যাবে তাই। অতীত-বর্তমানের আলেমরা এই আয়াতগুলোকে পরস্পর-বিরোধী ভাবে ব্যাখ্যা করে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফলে মুসলিম বিশ্বও বিভক্ত হয়ে গেছে। আমাদের উচিত হবে সেটাই গ্রহণ করা, যেটাতে আমাদের সময়ে সমাজের মঙ্গল হবে। এবারে আমরা কিছু সহি হাদিস দেখব।

(ক) নেকাবের সমর্থনে–

- পোশাকের আয়াত নাজিল হলে নারীরা তাদের চেহারা ঢাকা শুরু করল; তারা নবীজি'র (সা.) সামনে চেহারা ঢাকত না, অন্যদের সামনে ঢাকত–বুখারি ৫-৩২ ও ৬-২৮২ ইত্যাদি, আরও আছে। নেকাবের পক্ষের আলেম দেশে অনেক, পত্রিকার ইসলামি পাতায় ক্রমাগত অজস্র নিবন্ধ ছাপা হচ্ছে, সে ব্যাখ্যা সবাই জানেন বলে বিস্তারিত দিচ্ছি না।

(খ) নেকাবের বিপক্ষে:

- পুরুষের প্রতি কোরানের "দৃষ্টি নীচে করো" (নুর ৩০) প্রমাণ করে নেকাব নারীর পোশাক নয়।

- পোশাকের আয়াত নাজিল হলে নারীরা জানালার পর্দা কেটে মাথা-ঢাকার স্কার্ফ তৈরি করল–আবু দাউদ ৪০৮৯।

- এক সুন্দরী নারীর সৌন্দর্যে "আকৃষ্ট হইয়া" সাহাবি আল ফাদেল তার দিকে তাকিয়ে থাকলে নবীজি (সা.) ফাদেলের চিবুক ধরে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন, নারীকে মুখ ঢাকতে বললেন না–বুখারি ৮-২৪৭.

- নবীজি (সা.) বললেন মেয়েরা বড় হলে চেহারা ও হাত ছাড়া আর কিছু দেখানো উচিত নয়–আবু দাউদ ৪০৯২। এটা সুরা নুর আয়াত ৩১-এর সাথে যায়, নারীরা যেন সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, "যা সাধারণত প্রকাশমান তাহা ব্যতীত।"

- জাবির বিন আব্দুল্লাহ–নবীজি (সা.) বলেছেন কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে বিয়ে করতে চায় তবে সে সেই নারীর সেটা দেখতে পারে যা তাকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। "আমি এক নারীকে বিয়ে করতে চাইলাম। আমি গোপনে তাকে দেখলাম..." ইত্যাদি–আবু দাউদ ২০৭৭।

- হজ ও ওমরাতে নারীর চেহারা খোলা থাকলে অন্যত্র থাকবে না কেন।

- ড. জাকির নায়েকসহ অনেকে বলেন নিকাব শুধু নবীজির (সা.) স্ত্রীদের জন্য, এটা আহজাব ৫৩ ও হাদিস দ্বারা সমর্থিত। সাফিয়ার সাথে নবীজির (সা.) সাথে এক ভ্রমণে সাহাবি বলছেন যদি নবীজি (সা.) সফিয়াকে নিকাব পড়ান তাহলেই বোঝা যাবে সাফিয়া তাঁর স্ত্রী, নাহলে নয়–বুখারি ৭-২২, মুসলিম ৮-৩৩২৮।
- নবীজির (সা.) সময় অনেক যুদ্ধে নারীদের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ, জামাল যুদ্ধে বিবি আয়েশার (রা.) সেনাপতিত্ব (বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখিত) ইত্যাদি প্রমাণ করে নারীরা কখনোই নেকাব পরেননি এবং গৃহবন্দীও ছিলেন না।

(২) বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য

এবার দেখা যাক মুসলিম বিশ্বের শীর্ষ বিশেষজ্ঞদের নেকাববিরোধী সিদ্ধান্ত। আমাদের নিকাবপন্থী আলেমরা তাঁদের সাথে কথা বললে ভালো হয়।

- আল আজহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্র্যান্ড মুফতি ও গ্র্যান্ড ইমাম ড. তানতাওয়াঈ–"ইসলামের সাথে নেকাবের কোনো সম্পর্ক নেই–এটা সামাজিক প্রথামাত্র"–বিবিসি নিউজ ৫ অক্টোবর ২০০৯ ও বিশ্বব্যাপী অনেক সূত্র।
- ড. জাকির নায়েকের বক্তৃতা–"আমি সমর্থন করি যা শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেছেন, মুসলিম নারীর জন্য চেহারা ঢাকা আবশ্যিক নয়।" পাওয়া যাবে ইন্টারনেটে এই নামে–"কভারিং দি ফেস অফ উওম্যান অ্যানসার্ড বাই ড. জাকির নায়েক"।
- "নারীর ইসলামি পোশাকের ব্যাপারে আলেমরা একমত হইতে পারেন নাই" - মুসলিম ব্রাদারহুড-এর প্রতিষ্ঠাতা মিসরের হাসান আল বান্নার নাতি "ইউরোপের সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম নেতা" হিসেবে বিখ্যাত ড. তারিক রামাদান।

- শেখ আহমদ কুট্টি, সিনিয়র শিক্ষক ও ইসলামি বিশেষজ্ঞ–পাওয়া যাবে ইন্টারনেটে এই নামে–"রুলিংস রিগার্ডিং ওয়্যারিং হিজাব অ্যান্ড নিকাব" - ইসলাম অন লাইন ডট নেট।
- পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ইসলামি সংগঠন কাউন্সিল অব ইসলামিক আইডিওলজি- "নারীদের চেহারা, হাত ও পা ঢাকা জরুরি নয়"–দি এক্সপ্রেস ট্রিবিউন ১৫ অক্টোবর ২০১৫।
- সৌদি আরবের কমিশন ফর দি প্রমোশন অব ভার্চু বিভাগের প্রাক্তন প্রধান আহমেদ বিন কাসিম আল ঘামিদী–"নারীদের চেহারা ঢাকা জরুরি নয়"–মরক্কো ওয়ার্ল্ড নিউজ–৬ ডিসেম্বর ২০১৪।
- সম্প্রতি সৌদি ইমামেরাও বক্তব্য দিয়েছেন, "নারীদের চেহারা ঢাকা জরুরি নয়", সরকারও সেটা মেনে নিয়েছে। সেখানে এবং সারা মধ্যপ্রাচ্যে নেকাবের বাধ্যবাধকতা নেই।

(৩) বাস্তব

এ তো গেল দলিলের কচকচি, পক্ষ-বিপক্ষের মতামত। কে কী মানবে সেটা তার ব্যাপার, কিন্তু "আমারটাই সত্য তোমরা সব মিথ্যে" এই হুংকারে গাত্রদাহ নিরসন হতে পারে কিন্তু হানাহানি বেড়ে যায়, শান্তি নষ্ট হয়। এবারে দেখা যাক বাস্তবে দুনিয়ায় কি ঘটছে, কারণ জীবনের সবচেয়ে পরাক্রান্ত শক্তি হলো বাস্তব, যা কারো বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে না।

- নিদারুণ বাস্তব–নারীকে নেকাব-বন্দী করে ভেতর থেকে কি ধ্বংস হচ্ছে সৌদি সমাজ তার প্রমাণ উঠে এসেছে ওই সৌদি সমীক্ষাতেই। সৌদি আরবের টিভিতে প্রচারিত সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২৩% সৌদিরা শিশুকালে আত্মীয়, ভাই, শিক্ষক দ্বারা ধর্ষিত/ধর্ষিতা, রিয়াদ শহরে ৪৬% তরুণ-তরুণী সমকামী। অনেক খুঁজেও এ ব্যাপারে সৌদি সরকারের কোনো প্রতিবাদ আমি পাইনি। ইন্টারনেটে এর বহু লিংক আছে, সার্চ করলেই পাবেন–Saudi Studz: 23% of Arab

Children Raped; 46% of Arab Students Homosexual

- সৌদি আরবের সর্বোচ্চ সুরা কাউন্সিলে ১৫০ জন সদস্যের মধ্যে নারী ৩০ জন, টিভির খবরে দেখা গেছে তাঁদের অনেকেই চেহারা ঢাকেন না–সেন্টার ফর ইসলামিক প্লুরালিজম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩। কাতার-এর রাজকন্যার ছবি–দৈনিক আমার দেশ ২৯ অক্টোবর ২০১৩।

VEIL – QATAR PRINCESS
AMAR DESH – 29 Oct 2013

The first meeting of the Saudi Shura Council with participation of women. Photograph from Al-Arabiya
http://www.islamicpluralism.org/2313/saudi-women-driving-towar
more-reforms

- মধ্যপ্রাচ্য, ইরান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ প্রায় সব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের ইমামেরা নারীর ওপরে নেকাব চাপিয়ে দেননি। তাঁরাও তো ইমাম, তাঁরা কেন দেননি? আমাদের নিকাব-পন্থীদের উচিত সেটা তাঁদের জিজ্ঞাসা করে খুঁজে বের করা।

- কিছু মুসলিমপ্রধান দেশসহ এসব দেশে/শহরে/অঞ্চলে আইন বানিয়ে কিছু শহরে/অঞ্চলে বা পুরো দেশে নেকাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে : চাদ রিপাবলিক, নিগার, ক্যামেরুন, কঙ্গো, তুর্কিস্তান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ইতালির নোভারা ও ভারালো সেশিয়া শহর, চায়না'র উরুমকি শহর, স্পেনের বার্সেলোনা, রিউস ও কাতালোনিয়া'র কয়েকটি শহর, সুইজারল্যান্ডের তিসিন'র ক্যান্টন শহর, রাশিয়ার স্যাভর্পুল শহরের সরকারি স্কুলে, সৌদি আরবে হজ ও ওমরার সময়, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের জন্য

ইত্যাদি–ইজিপ্সিয়ান স্ট্রিট, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫, দি টেলিগ্রাফ, ১৭ আগস্ট ২০১৭ ইত্যাদি।

- মুসলিমপ্রধান দেশ চাদ-এর রাজধানী দেজামেনার এক মার্কেটে বোরকা পরিহিত নারীর ছদ্মবেশে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী ১৫ জনকে নিহত ও ৮০ জনকে আহত করে। কাউকে বোরকা পরিহিত অবস্থায় দেখলেই গ্রেফতার করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে পুলিশ–দৈনিক সংগ্রাম ১৫ জুলাই ২০১৫।
- বাংলাদেশে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিডিও ফুটেজ দেখে জহুরুল ইসলাম মিঠু (১৬) নামে এক চোর আটক হয়েছে–দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ অক্টোবর ২০১৫। নেকাব থাকলে চোর ধরা যেত? যেত না।

- সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারতের আজমগড়ে নিকাব পরে মন্দিরে গরুর মাংস ছুড়ে পালানোর সময় ধরা পড়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কর্মী–দৈনিক সংগ্রাম ডেস্ক: ৩ অক্টোবর ২০১৫।

- জুলাই ২১, ২০০৫–লন্ডন বম্বিং-এর নিকাবি বোমাবাজ পালিয়ে গেছে।
- নিকাবি ডাকাতরা লন্ডনের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর সেলফ্রিজ-এ ডাকাতি করে পালিয়ে গেছে জুন ২০১৩ সালে।
- ইংল্যান্ডে পুরুষ খুনিরা নিকাবি নারীর ছদ্মবেশে ফ্লোরেন্স ডিক্সি নামের এক মহিলাকে হত্যার চেষ্টা করে।
- ইংল্যান্ডে নারী-পুলিশ শ্যারন বেশেনিভিস্কি'র হত্যাকারী মুস্তাফ জুমা নিকাব পরে পালিয়ে গেছে মনে করা হয়।
- পাকিস্তানের রেড-মস্ক-এর কুখ্যাত মোল্লা ফয়জুল্লা আত্মঘাতী বোমা দিয়ে সরকার উচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছিল–সেনাবাহিনীর গুঁতো খেয়ে সে নিকাব পরে পালাবার সময় ধরা পরে।
- এ ছাড়াও ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, নাগরিক কার্ড, হাসপাতাল, বিমানবন্দরসহ সর্বত্র নিরাপত্তা–এসব সমস্যা আছে। বাস্তবে নেকাব নারীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ পেশা ও শখ বন্ধ বা ব্যাহত করো যেমন রাষ্ট্রপ্রধান, সামরিক উচ্চপদ, ট্রেন-জাহাজ-এরোপ্লেন চালানো, ডাক্তার, সার্জন, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, সার্ফিং, পর্বতারোহণ, ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতার ইত্যাদি খেলাধুলা ও শখ। নারীর কি ওসব ইচ্ছে করে না? নিশ্চয়ই করে। নারীর কি ওসব অধিকার নেই? অবশ্যই আছে। এই সেদিনও বাংলার নারী এভারেস্ট জয় করেছেন,

> ‘বেঙ্গল মেসি কন্যা’ বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন নারী সাফ ফুটবল টুর্নামেন্টে হ্যাটট্রিকসহ সাতটি গোল করেছেন। প্রথমবারের মতো সাফে রানার্সআপ হয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবল ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছেন বাংলাদেশ নারী ফুটবলাররা। আনাই মারমা, আনুচিং মারমা, মনিকা চাকমা অভাবী সংসারের মধ্যেও অজপাড়াগাঁ থেকে উঠে এসে পায়ের জাদুতে এখন দেশের আলো ছড়াচ্ছে বিশ্বময়।

প্রথম দিকে আমিও দাবি করতাম পোশাক নির্ধারণ নারীর অধিকার, সেটা নেকাবই হোক না কেন, কারণ সে তো আর কারো ক্ষতি করছে না। কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে অন্য চিন্তা করতে হচ্ছে কারণ নিকাব এখন হয়ে উঠেছে ক্রিমিনালদের রক্ষাকবচ। যে প্রথা খুনি ডাকাত অত্যাচারীদেরকে নিরাপত্তা দেয় তা অবশ্যই আইন করে বন্ধ করা দরকার। কোনো হিন্দু যদি সতীদাহ করতে চায় কারণ ওটা তার ধর্মে আছে, তবে যেকোনো ধর্মের হন না কেন এই আপনিই কি তাকে বাধা দেবেন না? অবশ্যই দেবেন। কারণ ধর্মীয় সংস্কৃতির বাহানায় কারো ওপর অত্যাচার করা যায় না, কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করা যায় না।

যদি বিশ্বাসও করি নেকাব কোরানের হুকুম তাহলে বিশেষজ্ঞদের এ কথাও মানতে হবে যে কোরানের কিছু হুকুম তাৎক্ষণিক এবং কিছু চিরকালের। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শারিয়া-সমর্থক বিশেষজ্ঞ ড. হাশিম কামালী তাঁর “প্রিন্সিপল্স অব ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স” বহু উদাহরণ দিয়ে বলেছেন– “নবী (সা.)-এর সময়েই কোরান ও সুন্নাহ-তে কিছু পরিবর্তন করা হয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনই ইহার মূল কারণ... মানুষের উপকারের জন্য সমাজের বিদ্যমান পটভূমি ও আইনের সমন্বয় করার প্রয়োজনে নসখ আসিয়াছে...কোরান ও হাদিসে নসখ-এর সর্বপ্রধান কারণ হইল স্থান-কালের বিষয়টি।” এমনকি মওদুদীও সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন: “বিভিন্ন পয়গম্বরের প্রচারিত ধর্মীয় আইনগুলিতে ভিন্নতা আছে কেন? (differ in matters of detail)... বিভিন্ন পয়গম্বরের প্রচারিত বেহেশতি কেতাবে নির্দেশিত ইবাদতের পদ্ধতিতে, হালাল-হারামের

বিধানগুলিতে ও সামাজিক আইনগুলির বিস্তারিত কাঠামোতে (etailed legal regulations) ভিন্নতা আছে কেন?... (কারণ) স্বয়ং অল্লাহ বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াইবার জন্য আইনের ধারা (legal prescriptions) বদলাইয়াছেন"– মায়েদা ৪৮-এর ব্যাখ্যা, মওদুদীর বিশাল বই তাফহিমুল কুরান। অবশ্যই তাই, "মানুষের উপকারের জন্য সমাজের বিদ্যমান পটভূমি ও আইনের সমন্বয়" এটাই মূল কথা। আজ আপনি যদি ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধান হন, ফিরিয়ে আনবেন অমুসলিমদের ওপরে জিজিয়া ট্যাক্স? বন্দিনী ধর্ষণ? চালু করবেন দাসপ্রথা যেখানে হাট-বাজারে আলু-পটলের মতো মানুষ কেনাবেচা হবে? করবেন না। কারণ পরিস্থিতি পাল্টে গেছে।

কালতামামী

নেকাবপন্থীদের মতে, নেকাবের উদ্দেশ্য হলো নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করে ধর্ষণ ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ করা। উদ্দেশ্যটা ভালো, কারণ বিশ্বময় ওটা ভয়াবহভাবে বেড়ে গেছে। কীভাবে তা বন্ধ করা বা কমানো যায়, তা নিয়ে সমাজ-বিশেষজ্ঞরা মাথা ঘামাচ্ছেন, উপায় এখনো বের করতে পারেননি। যৌবন এক পরাক্রান্ত শক্তি। ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক সংস্কৃতি ইত্যাদি দিয়ে এ শক্তিকে এতদিন মোটামুটি বশে রেখেছিল মানুষ। কিন্তু এখন মহাপরাক্রান্ত প্রযুক্তি এসে সবকিছু ভেঙেচুরে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছেলেমেয়ের অবাধ যৌনতা এখন অপ্রতিরোধ্য। ছেলেমেয়ের একজন ঢাকা আরেকজন ডাকার-এ বা একজন টাঙ্গাইল আরেকজন ট্যাঙ্গানিকা-তে, বেডরুমের দরজা লক করে ওয়েবক্যামের ক্যামেরা চালু করে দিলেই হলো, নিকাবের সাধ্য নেই তাদের ঠেকায়। মুখ ঢেকে বা ফেসবুক, ইউটিউব ও ওয়াজ মহফিলে হুংকার দিয়ে গালাগালি করে এটা ঠেকানো তো দূরের কথা কমানোও যাবে না, অন্য পথ ধরতে হবে। সেটা সমাজগুরু, ধর্মগুরু, সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব। সমাজগুরু ও ধর্মগুরুরা জাতিকে শান্তভাবে হেদায়েত করুন (এখন ওটারই প্রচণ্ড অভাব), সরকার যৌন-অপরাধের বিরুদ্ধে শক্ত আইন করে কঠিনভাবে তার প্রয়োগ করুন। দায়িত্ব আমাদের

জনগণেরও আছে—আমরা জনগণ যেন যৌন-অপরাধের বিরুদ্ধে হিমালয় হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারি।

এ ছাড়া এই নিকষ অন্ধকার থেকে বের হবার আর কোনো উপায় দেখছি না। বিশ্বাসের "সত্য" কখনো মারাত্মকও হতে পারে, সতীদাহের মতো রাক্ষসও ধর্মবিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছিল।

"সত্য সত্য করিসনা রে মন,

এমন সত্য আছে ভবে, হাত লাগাইলে বুঝবি তবে,

জ্বইলা যাবি অঙ্গারের মতন"...

১ মে, ২০১৮

২১শে, ২৬শে, ১৬ই উদ্‌যাপন কি শিরক?

চলে গেল একুশে, দ্বারে সমাগত ছাব্বিশে, দূরে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে ষোলোই। রক্তক্ষতের অলংকারে সজ্জিত আমাদের তিনটে অভ্রভেদী দিবস। সাংঘর্ষিক মেরুকরণও আছে, এই তিনটে দিন উদ্‌যাপন জাতির এক অংশের কাছে চেতনা ও অস্তিত্বের গর্বিত মেরুদণ্ড, অন্য এক অংশের কাছে সেটা আল্লাহর প্রতি সর্বনিকৃষ্ট অপরাধ, যা কোনোভাবেই ক্ষমাযোগ্য নয়।

এর নেতৃত্বে আছেন আমাদের ইসলামি নেতৃত্বের একটা অংশ। তাদের ওয়াজ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁরা জাতিকে (প্রধানত গ্রামগঞ্জের গণমানসকে) কী বিষয়ে, কোন দিকে ও কী পদ্ধতিতে প্রভাবিত করছেন। তাঁরা বলেন শিরক হতে পারে বিশ্বাসে, মুখের কথায়, আচার-ব্যবহারে, ইবাদতের মধ্যে এমনকি ভাষার মধ্যেও যেমন আল্লাহকে 'খোদা' বলা, বান্দার কিছু নাম যেমন বন্দে আলী, গোলাম নবী, গোলাম মোস্তফা, গোলাম রসুল, গোলাম হোসেন ইত্যাদি। অনেকের শিরকের তালিকায় আরো আছে রাষ্ট্রযন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা, মজহাব না মানা, ঘরে ছবি বা মূর্তি রাখা, যেকোনো দিবস পালন যেমন জন্ম-মৃত্যুদিবস, বাংলা-ইংরেজি নববর্ষ, ভ্যালেন্টাইন ডেসহ একুশে ফেব্রুয়ারি, ছাব্বিশে মার্চ, ষোলোই ডিসেম্বর ইত্যাদি।

কিছু বক্তা শান্তভাবে এবং কিছু বক্তা উন্মত্তভাবে হাত ছুড়ে কোরানের কিছু আয়াত ও কিছু হাদিস বর্ণনা করে তাঁদের দাবি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। শিরকের কিছু ব্যাপার নিয়ে তাঁদের মধ্যে তুমুল বিরোধ আছে যেমন পীর-মুরীদি, মাজারপন্থীদের কার্যকলাপ, ওরসে কারো জন্য কিছু মানত করা, ঝাড়ফুঁক-তাবিজ-পাথর, কবরে ফুল দেয়া বা গোলাপ পানি ছিটানো, 'রাসুল (সা.) গায়েব জানতেন' বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি। এ বিরোধ এতই তীব্র যে একে অপরকে 'মুশরিক' বলে দাবি করে থাকেন।

এ নিবন্ধের বিষয় একুশে ফেব্রুয়ারি, ছাব্বিশে মার্চ, ষোলোই ডিসেম্বর

উদ্‌যাপন/পালন শিরক কিনা। শহীদ মিনারের প্রতি দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামি রাজনৈতিক দল জামাতের বিরোধিতা সবাই জানেন এবং তাঁরাও সেটা স্পষ্টই বলে থাকেন। যেমন,

- 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকার ১৯৭১ সালের ১৬ জুলাই সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়: 'আইয়ুব খানের গভর্নর আজম খান ছাত্রদের খুশি করার জন্য যে শহীদ মিনার তৈরি করলেন তাকে পূজামণ্ডপ বলা যেতে পারে, কিন্তু মিনার কিছুতেই না'–চ্যানেল আই অনলাইন ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।
- জামাত শিবিরের বাধার জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা করা যায়নি দীর্ঘ তিরিশ বছর–কালের কণ্ঠ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১।

শিরকের বিষয়ে তাঁরা বলেন:

১. আল্লাহ বাকি সব গুনাহ ক্ষমা করতেও পারেন কিন্তু শিরক সেই কবিরা গুনাহ যা আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না–সুরা নিসা: ৪৮, ১১৬, মায়িদাহ: ৭২, আনাম: ১৬৩, কাহফ: ১১০, ইমরান: ৬৪, আল জিন: ২৬, আনাম: ৫৯ ইত্যাদি।

২. সহি মুসলিম-৯৩, আবু দাউদ: ৩২৩৬(ইফা), ফতহুল বারী ৭/৪৪৮, আবু দাউদ: ৪০৩৩, ইবনে মাজাহ ৫২০৪ ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আল্লাহর প্রতি সর্বনিকৃষ্ট অপরাধ, যা কোনোভাবেই ক্ষমাযোগ্য নয় সেই 'শিরক'টা আসলে কি? তাঁরা বলেন 'শিরক' শব্দটা এসেছে "শরিক" থেকে, অর্থাৎ কোনো কিছুর ওপরে অংশীদার বা যৌথ-মালিকানা। সম্পত্তি বা ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন অংশীদার থাকে সে রকম। উদাহরণ–আদি মুসলিম সমাজে দাস-দাসীর ওপরে যৌথ মালিকানার প্রথা ছিল:

(ক) হানাফি আইন হেদায়া- পৃষ্ঠা ২৩১: 'অংশীদারগণ পরস্পরের সম্মতিক্রমে ক্রীতদাসীকে দৈহিক উপভোগ করিতে পারিবে'।

(খ) সহি বুখারি–মদিনা বিশ্ববিদ্যায়ের ড. মুহম্মদ মহসীন খান,–ভলিউম

৩, হাদিস নং ৬৯৮– "আল্লাহ'র নবী (সা.) বলিয়াছেন, যদি কেহ কোন এজমালি দাস-দাসীকে নিজ অংশ হইতে মুক্ত করে এবং তাহার কাছে পুরা মুক্তি দিবার মতো যথেষ্ট অর্থ থাকে তাহা হইলে তাহার উচিত কোন ন্যায়পরায়ণ লোক দ্বারা সেই দাস-দাসীর উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করা এবং অংশীদারদেরকে তাহাদের অংশের মূল্য দিয়া সেই দাস-দাসীকে মুক্ত করিয়া দেওয়া। তাহা না হইলে সে শুধু সেই দাস-দাসীকে আংশিক মুক্ত করিল"। এটা আছে হাদিস ৬৯৭, ৬৯৯, ৭০১, ৭০২ ইত্যাদিতেও।

মাওলানারা বলেন–আল্লাহ'র সাথে শরিক করা মানে একমাত্র আল্লাহ'র যা প্রাপ্য তাতে অন্য কিছুকে বা কাউকে অংশীদার করা। সে অংশীদার হতে পারে কোনো বস্তু যেমন, গাছ-পাথর-মাজার-প্রতিমা, বা অন্য কোনো জীবন্ত বা প্রয়াত মানুষ যেমন পীর, আউলিয়া, মুর্শিদ এমনকি নবী মুহম্মদ (সা.) পর্যন্ত। সব মিলিয়ে শিরকের সংজ্ঞা আছে কোরানের বাংলা অনুবাদে, মওলানা মুহিউদ্দীন খান পৃষ্ঠা ২৫৪ থেকে উদ্ধৃতি: "আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে যেসব বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, তেমন কোনো বিশ্বাসসৃষ্ট বস্তুর ব্যাপারে পোষণ করাই হলো শেরক।

বিশ্লেষণ:

(ক) জ্ঞানের ক্ষেত্রে শরিক সাব্যস্ত করা: অর্থাৎ, (১) কোনো বুজুর্গ বা পীরের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, আমাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবহিত। (২) কোনো জ্যোতিষ পণ্ডিতের কাছে গায়েবের সংবাদ জিজ্ঞেস করা কিংবা (৩) কোনো বুজুর্গর বাক্যে মঙ্গল দেখে তাকে অনিবার্য মনে করে নেয়া অথবা (৪) কাউকে দূর থেকে ডাকা এবং সাথে সাথে এ কথা বিশ্বাস করা যে, সে আমার ডাক শুনে নিয়েছে অথবা (৫) কারো নামে রোজা রাখা।

(খ) ক্ষমতার ক্ষেত্রে শরিক করা: অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে হিত বা অহিত তথা ক্ষতি-বৃদ্ধি সাধনের অধিকারী মনে করা। কারো উদ্দেশ্য যাঞ্চা করা। কারো কাছে রুজি-রোজগার বা সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করা।

(গ) এবাদতে শরিক সাব্যস্ত করা: কাউকে সেজদা করা, কারো নামে

কোনো পশু মুক্ত করা, কারো নামে মানত করা, কারো কবর কিংবা বাড়িঘরের তাওয়াফ করা, আল্লাহ্ তাআলার কোনো হুকুমের তুলনায় অপর কারো কথা কিংবা কোনো প্রথাকে প্রাধান্য দেয়া, কারো সামনে রুকু করার মতো অবনত হওয়া, কারো নামে জীব কোরবানি করা, পার্থিব কাজ-কারবার কিংবা বিবর্তনকে নক্ষত্রের প্রভাব বলে বিশ্বাস করা এবং কোনো কোনো মাসকে অশুভ মনে করা প্রভৃতি।"

উদ্ধৃতি শেষ। এখন দেখা যাক আমরা আল্লাহ'র কাছে কি প্রার্থনা করিঃ

- জানা-অজানা সব অপরাধের ক্ষমা,
- পরকালে বেহেশত প্রাপ্তি ও দোজখ থেকে নাজাত,
- রোগ শোক বালা মুসিবত থেকে পরিত্রাণ,
- সন্তান লাভ,
- পরীক্ষায় ভালো ফল, বিয়ে বা ব্যবসায়ে সাফল্য ইত্যাদির লম্বা তালিকা।

ইসলাম তো সিরাতুল মুস্তাকিম অর্থাৎ সহজ সরল ধর্ম। তাই এবারে একটা সহজ সরল অঙ্ক করা যাক। আমরা যে একুশে ফেব্রুয়ারি, ছাব্বিশে মার্চ ষোলোই ডিসেম্বর উদ্‌যাপন করি তাতেঃ

১. আমরা কি একুশে ফেব্রুয়ারি, ছাব্বিশে মার্চ, ষোলোই ডিসেম্বর উদ্‌যাপন করার সময় ওপরের কোনো কিছু করি? জবাব : না ! প্রশ্নই ওঠে না।

২. আমরা কি দিনগুলোকে ইবাদত করি? জবাবঃ না, অবশ্যই করি না।

৩. আমরা কি দিনগুলোর কাছে অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করি? জবাবঃ না, নিশ্চয়ই করি না।

৪. আমরা কি দিনগুলোর কাছে বেহেশত প্রার্থনা করি? জবাবঃ না, প্রশ্নই ওঠে না।

৫. আমরা কি দিনগুলোর কাছে দোজখ থেকে নাজাত প্রার্থনা করি? জবাবঃ না, অবশ্যই করি না।

৬. আমরা কি দিনগুলোর কাছে রোগশোক, বালামুসিবত থেকে রেহাই প্রার্থনা করি? জবাবঃ না, করি না।

৭. আমরা নিঃসন্তান হলে দিনগুলোর কাছে কি সন্তান প্রার্থনা করি? জবাবঃ না, কখনোই করি না।

৮. আমরা কি দিনগুলোর কাছে পরীক্ষায় ভালো ফল, বিয়ে বা ব্যবসায়ে সাফল্য প্রার্থনা করি? জবাবঃ না, প্রশ্নই ওঠে না।

৯. আমরা কি শহীদ মিনারে, বিজয়স্তম্ভে বা স্মৃতিসৌধে রুকুসেজদা করি? জবাবঃ না, করি না।

তাহলে? ওনাদের সংজ্ঞা মোতাবেকই ওই দিনগুলো পালনে শিরকের লেশমাত্র নেই।

চিন্তার সংঘাত সামাজিক অগ্রগতির চাবিকাঠি। কিন্তু সেই সংঘাতে কেউ কেউ কতল করা পর্যন্ত নেমে এসেছে। ভলতেয়ার বলেছেন–"তোমার বক্তব্যের সাথে আমি একমত নাও হতে পারি কিন্তু তোমার কথা বলার অধিকার রক্ষায় আমি জীবন দেব।"

ওনাদের বলার অধিকার আছে, ওনারা বলতে থাকুন। দিনগুলো উদ্‌যাপনের অধিকার জাতির আছে, জাতি উদ্‌যাপন করে যাবে। চিরকাল ওনারা 'গান হারাম' বলে চিৎকার করেছেন, জাতি শোনেনি। সংগীত এখন বিশাল ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে, হাজারো মেধার সৃষ্টিধর্মী বিশাল কর্মকাণ্ড চলছে, হাজারো লোকের সংসার চলছে, চলবে। প্রায় নব্বই বছর আগে এই বাংলায় 'বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলন' সংগঠন থেকে ইসলামের নামে অনাচারের বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন করেছিলেন 'শিখাগোষ্ঠী', যাতে জড়িত ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ কাজী আনোয়ারুল কাদীর থেকে বয়ঃকনিষ্ঠ আবুল ফজল ও কাজী মোতাহার হোসেন পর্যন্ত–যার প্রাণপুরুষ ছিলেন আবুল হোসেন ও কাজী আবদুল ওদুদ। তাঁরা জাতিকে সতর্ক করেছিলেন

‘আদেশের নিগ্রহ’, ‘নিষেধের বিড়ম্বনা’ ইত্যাদি নিবন্ধে। বলেছিলেন, জাতিকে ইসলামের নামে এত এত শিকলে শৃঙ্খলিত করা হচ্ছে যার পরিনাম হবে ভয়াবহ–‘নির্বাচিত প্রবন্ধ–আবুল হোসেন’ প্রকাশক মাওলা ব্রাদার্স ঢাকা।

আজ কলুষিত রাজনীতির ছত্র ছায়ায় বিভিন্ন আদেশের নিগ্রহ ও নিষেধের বিড়ম্বনায় ছেয়ে গেছে দেশ, জাতি হয়েছে বিভ্রান্ত। কিন্তু ইতিহাসের অটল অমোঘ ধারা বয়ে চলেছে ধীরে, অলক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিয়তি। বাঙালির অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ড প্রশ্নাতীত অভ্রভেদী, ইতিহাসে বারবার প্রমাণ হয়েছে সেটা। তাকে সাময়িক বিভ্রান্ত করা যেতে পারে কিন্তু আখেরে তাকে পরাজিত করার সাধ্য কারো নেই।

দেশের নাম বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা আফগানিস্তান নয়।

২৫ মার্চ, ২০১৮

পাক-আলেমদের সখাত-সলিল

(প্রেক্ষাপটঃ বহু বছর ধরে মুসলিমের ওপর মুসলিমের আত্মঘাতী বোমা হামলায় ক্ষতবিক্ষত পাকিস্তান। এক অসমর্থিত খবরে জানা যায় এ পর্যন্ত প্রায় সত্তর হাজার মানুষ খুন হয়েছে আত্মঘাতী বোমা হামলায়। ১৮০০ জন পাকিস্তানি আলেম গত সপ্তাহে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত বই-তে আত্মঘাতী বোমা হামলাকে 'অনৈসলামিক' অ্যাখ্যা দিয়ে ফতোয়া জারি করেছেন–বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৬ জানুয়ারি ২০১৮। কিন্তু এ ফতোয়ায় কাজ হবে কি? কারণ জঙ্গিদের অন্যতম শিকড় হলো পাঠ্যক্রমে ও সর্বত্র ইসলামের ঘৃণা ও হিংস্রতাভিত্তিক ব্যাখ্যার বই। সেটা অক্ষুণ্ন রেখে এ হিংস্রতা বন্ধ করা যাবে না)।

দেরিতে হলেও চোখ খোলা ভালো। বাংলাদেশেও মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ-এর নেতৃত্বে এক লক্ষ আলেম একই ফতোয়া জারি করেছেন, তাঁদেরকে ধন্যবাদ। পাকিস্তান বহু বছর ধরে 'ইসলামি' হিংস্রতায় ক্ষতবিক্ষত। অহরহ সর্বত্র এমনকি মসজিদেও মুসলিম খুন করে চলেছে মুসলিমকে, পরে সেটা আত্মঘাতী বোমা হামলায় 'উত্তীর্ণ' হয়েছে। ১৮০০ মাওলানার ওই ফতোয়া সে হিংস্রতা বন্ধ করতে পারবে কি না সে অঙ্কটা আমাদের বাংলাদেশিদের করতে হবে কারণ আমাদের উগ্রপন্থীরা ওদের উগ্রপন্থীদের সাথে শুধু সম্পর্কিতই নয় বরং ওদের সাহিত্য ও দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত। দেশে যা কিছু হচ্ছে তা ওখানে আগে হয়েছে। সেটা দেখে না শিখলে প্রাকৃতিক নিয়মেই আমাদেরকে ঠেকে শিখতে হবে।

ধর্মীয় হিংস্রতার ডোজ মাদকের মতো ক্রমাগত বাড়তে থাকে। পাকিস্তানে আত্মঘাতী বোমা হামলা শূন্য থেকে হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি, ওটার জন্ম হয়েছে ধাপে ধাপে বহু বছর ধরে ইসলামের নামে অন্যান্য অজস্র সন্ত্রাসকে ক্রমাগত বৈধ ও প্রতিষ্ঠিত করার পরেই। এর একটা পরিকল্পিত পদ্ধতি আছে। শুরুতে এক প্রজন্মকে কিছু সন্ত্রাসকে বৈধ ও আল্লাহর ইচ্ছা বলে বিশ্বাস করানো হয়েছে। পরের প্রজন্মকে আরো এক ধাপ এগিয়ে অন্য

কিছু মারাত্মক সন্ত্রাসকে বৈধ ও আল্লাহর ইচ্ছা বলে বিশ্বাস করানো হয়েছে। এইভাবে পুরো জাতটার মন-মগজ সন্ত্রাসের প্রতি শুধু ডি-সেন্সিটাইজড-ই হয়নি, সেগুলোকে বৈধ ও আল্লাহর ইচ্ছা বলে বিশ্বাস করিয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আরো এবং আরো হিংস্র হতে হতে আত্মঘাতী বোমাবাজে পরিণত করানো হয়েছে যা কিনা চূড়ান্ত 'ইসলামি সন্ত্রাস'। সেই ধাপগুলো চিহ্নিত করলে আমরা আত্মঘাতী বোমা হামলার যে ভিত্তি, ইসলামি ঘৃণাভিত্তিক ও হিংস্রতাভিত্তিক সাহিত্য ও স্কুল-কলেজের সিলেবাসে সন্ত্রাসের বীজ সম্পর্কে জানতে পারব।

১. সন্ত্রাসের অন্যতম শিকড়–ইসলামের ঘৃণাভিত্তিক ও হিংস্রতাভিত্তিক সাহিত্য ও স্কুল-কলেজের সিলেবাস।

(ক) স্কুলের সিলেবাস। কাঁচা বয়সে ইসলামের নামে বাচ্চাগুলোর মাথায় ইসলামের ঘৃণাভিত্তিক ও হিংস্রতাভিত্তিক ব্যাখ্যার ওই যে বিষ ঢুকিয়ে দেয়া হয় ওরা সারা জীবনেও তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনা। এর ওপরে জরিপ হয়েছে, সরকার তা স্বীকারও করেছে এবং সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ২০০৬ সালে। কিন্তু শারিয়াপন্থী দলগুলোর প্রবল প্রতিরোধে সরকার কিছুই করতে পারেনি। ফলে এখন আমরা কী দেখছি? জরিপে পাকিস্তানের নতুন প্রজন্ম বলেছে দেশে অমুসলিমদেরকে যে সীমিত অধিকার দেয়া হয়েছে তাতেই তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তাদেরকে সরকারে কিংবা আর্মিতে বড় পদ দেয়া যাবেনা।

(খ) স্কুলের পরে বড় হয়ে ওরা ইসলামের ঘৃণাভিত্তিক ও হিংস্রতাভিত্তিক ব্যাখ্যার অজস্র কিতাব পড়ে। বিশাল বিষয় এটা, অতি সংক্ষেপে বলছি। শারিয়াপন্থীদের বইগুলো মোহময় আকর্ষণীয় শব্দে-বাক্যে ভরপুর। সেগুলো মানুষকে অপরাধহীন সমাজ ও ইহকাল-পরকালের সাফল্যের স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু ওগুলোর মধ্যে যে ফাঁক আছে, তা জানতে গেলে বহু বছরে শত শত বইয়ের হাজার হাজার পৃষ্ঠার লক্ষ লক্ষ তথ্যের সমীকরণ করতে হয়। অতীত-বর্তমানে শারিয়াপন্থীদের নির্মম অত্যাচার জানতে হয়। এসব সাধারণ জনগণের পক্ষে সম্ভব নয়। ওর বিপক্ষে

দেশে ইসলামের শান্তিময় ব্যাখ্যার বইগুলো প্রায় নেই বললেই চলে। আর উল্লেখও করা হয়না। একটা উল্লেখযোগ্য বই হলো আলেম উলামা প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ইসলামি সংগঠন নাহদালাতুল উলামা'র 'ইসলামী রাষ্ট্রের বিভ্রম' (ইলিউশন অব ইসলামিক স্টেট)। ইসলামি বিশেষজ্ঞদের এরকম আরো বই 'টুয়ার্ডস ইসলামিক রিফর্মেশন' (ড. আবদুল্লা আন নাঈম), দি চ্যালেঞ্জ অব ফান্ডাসে (ড. বাসাম তিবি) এর মতো বইগুলো অনুবাদ করে দেশে ছড়ানো দরকার। 'শারিয়া কী বলে, আমরা কী করি' বইতেও অনেক দলিল-প্রমাণ আছে।

জঙ্গল পরিষ্কার করতে গাছের মাথা কেটে নিশ্চিন্তে দিবানিদ্রা দিলে লাভ নেই যতক্ষণ শাখা-প্রশাখা এবং বীজ পরিষ্কার করা না হচ্ছে।

২. ইসলামের নামে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাস, যা থেকে আত্মঘাতী বোমা হামলার জন্ম তার কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শারিয়াবাজদের বর্ণনাতীত সন্ত্রাস প্রকাশ পাচ্ছে অহরহ।

(ক) ২০০৩ সালে মুত্তাহিদা মজলিস-এ আমল নামে শারিয়াপন্থী দল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নির্বাচনে জয়ী হয়, পরে সে দল বেলুচিস্তানের কোয়ালিশন সরকারেও ছিল। সংসদে এরা প্রথমেই বন্ধ করে জুয়া, মদ, বাস-ট্রেনে সংগীত, বিজ্ঞাপন-পোস্টারে নারীর ছবি, বিচিত্রানুষ্ঠানে-রেডিও-টিভিতে নারীর খবর পাঠ, গান ও নাটক, সাথে বন্ধ করা হয় সব সিনেমা হল। বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা ও সংগীত-শিল্পীদের মারপিট করা হয়, 'প্রাইড অব পারফরম্যান্স' খ্যাত গায়ক গুলজার আলমের বাসায় পুলিশ হানা দিয়ে তাঁর হার্মোনিয়াম ভেঙে ফেলে এবং তাঁর তিন ছেলে ও ভাইকে ধরে নিয়ে যায় (পাকিস্তান ডিফেন্স নিউজ–১০-১২–২০০৭)। বাংলাদেশে এঁরা ক্ষমতায় গেলে আমাদের দেখতে হবে–'গায়ক নাচকেরা ভাগো সব ভাগোরে, সবাইকে ফেলে দেব বঙ্গোপসাগরে।' দেশে এ চাই আমরা? কক্ষনো নয়!

(খ) তার পরেই মুত্তাহিদা মজলিস-এ আমল সংসদ ঘোষণা করে, "ইসলামি মূল্যবোধ রক্ষার জন্য" আল্ট্রাসাউন্ড ও ইসিজি পরীক্ষায়

রোগিণীরা পুরুষ টেকনিশিয়ানের কাছে যেতে পারবে না। অথচ সারা প্রদেশে ইসিজির নারী-টেকনিশিয়ান আছে মাত্র একজন, আল্ট্রাসাউন্ডের একজনও নারী-টেকনিশিয়ান নেই ! সেখানে মা-বোনদের কী অবস্থা তা অনুমান করে নিন। এই তথাকথিত ইসলামি দলগুলো আফগানিস্তানে, ইরাক-সিরিয়া-সোমালিয়া-নাইজেরিয়াতে মানবাধিকারের কী সর্বনাশ করেছে, তা তো দুনিয়া দেখছে। ইসলামের ওপর সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত করেছে আর কেউ নয়, এরাই। দেশে এ চাই আমরা? কক্ষনো নয় !

(গ) শারিয়া-পুলিশ দেশে দেশে কী বর্বরভাবে মানুষের জান লবেজান করেছে তা বর্ণনাতীত। মক্কার বালিকা-স্কুলে আগুন লাগায় ছাত্রীরা হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে আসার সময় তাদের মাথার স্কার্ফ হারিয়ে যায়। বাইরে দাঁড়ানো শারিয়া পুলিশ তাদেরকে পেটাতে পেটাতে আবার স্কুলে ঢুকিয়ে দেয়, বাইরে জনগণ ছুটে এসে সাহায্য করতে গেলে শারিয়া পুলিশ তাদেরকেও পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়। ফলাফল? নিষ্পাপ ফুলের মতো যারা ফুটেছিল সেই ১৫ জন বালিকা পুড়ে কয়লা হয়ে যায়, অন্তত ৫০ জন বালিকা আংশিক পুড়ে যায় (বিবিসি নিউজ ১৫ মার্চ ২০০২)। অনেক শারিয়া-দেশে ডাণ্ডা হাতে ঘুরছে ‘ইসলামি’ পুলিশ (হিসবাহ), খুঁটিয়ে দেখছে হেড-স্কার্ফ থেকে কোন মেয়ের চুল বেরিয়ে আছে, কোন মেয়ে কোন ছেলের সাথে বাজারে গেল, পার্কে বসে থাকা স্বামী-স্ত্রীর কাছে নিকাহনামা আছে কিনা–ধরে পেটাচ্ছে বা টেনেহিঁচড়ে বন্দী করছে থানায়, ভয়াবহ দৃশ্য। দেশে এ চাই আমরা? কক্ষনো নয় !

(ঘ) ২০০৫ সালে বিবিসির খবরে দুনিয়া শিউরে উঠেছিল যখন ইরানের সরকারি শারিয়া কোর্টে স্ত্রী আবেদন করেছিল তার স্বামীকে আদেশ দিতে, যেন সে তাকে প্রতিদিন না মেরে সপ্তাহে একদিন মারে। স্বামী দাবি করেছিল বউ-পেটানো তার ইসলামি অধিকার। মুসলিম বিশ্বে এ ধরনের ভয়াবহ খবরে ক্রমাগত প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে বিশ্ব, ইসলামের ওপরে এর চেয়ে বড় আঘাত আর কী হতে পারে? এসব জেনে দুনিয়ার সাধারণ শান্তিপূর্ণ অমুসলিমরা ইসলামকে ভয় তো পাবেই, ঘৃণা তো করবেই! দেশে এ চাই আমরা? কক্ষনো নয় !

(ঙ) পাকিস্তানের যে বর্বর আইনে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তিন হাজারের বেশি ধর্ষিতা দশ-বারো বছর জেল খেটেছে সেটার ব্যাপারে পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর সন্ত্রাসের কথা না বললেই নয়। আইনটা হলো–"পরকীয়া ও ধর্ষণের প্রমাণ চারজন বয়স্ক পুরুষ মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্য বা অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি"–হুদুদ আইন নং ৭ (১৯৭৯), নং ২০, ৮-এর খ (১৯৮০) দ্বারা সংশোধিত।

বহু বছর ধরে প্রগতিশীল শক্তি ও কোনো কোনো সরকার এ আইন বাতিলের চেষ্টা করে প্রতিবার ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান জামাতে ইসলামির প্রবল বিরোধিতার জন্য। ক'বছর আগে সংসদে সেটা বাতিলের দাবি গৃহীত হলে পাকিস্তান জামাতে ইসলামির আমির মওলানা মুনাওয়ার হাসান সংসদে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছেন শারিয়া মোতাবেক এই আইনই সঠিক, এর কোনো রকম পরিবর্তন কোরান ও শারিয়ার খেলাফ। এ আইন বাতিল হলে পাকিস্তান অবাধ যৌনতার স্বর্গ হবে। ধর্ষিতারা আদালতে চারজন বয়স্ক পুরুষ মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্য হাজির করতে না পারলে তাদের উচিত হবে পুলিশে না গিয়ে চুপ করে ঘরে বসে থাকা। বাংলাদেশে এ দানব চাই আমরা? কক্ষনো নয়!

সব মিলিয়ে:

> একি বীভৎস ছবি?
> দুনিয়া দেখছে সবই,
> দ্বীনের নবী,–শিউরে উঠে চক্ষু বোজে,
> চারদিক এই হাহাকার,
> কতদিন চলবে যে আর
> মানবতার, আর্ত বাণী পানাহ খোঁজে...

৩. কালতামামী

সতর্ক হতে হবে আমাদের। পাকিস্তানে যা হয়েছে আমাদের যেন না হয়। আবহকালের অ'তে অজগর, আ'তে আম, সেখানে মোহময় শব্দে ঢুকে পড়েছে অ'তে অজু, আ'তে আজান.. হঠাৎ হয়নি, পরিকল্পিতভাবে হয়েছে

এটা । আপসকামী পঙ্কিল রাজনীতি, সর্বগ্রাসী দুর্নীতি, সর্বত্র দুর্বৃত্তের ক্ষমতায়ন... চারদিকে অনেক কাজ জমেছে আমাদের।

কাজ জমেছে, কাজ !!
অনেক অসমাপ্ত কাজের হিসেব হবে আজ
কাজ জমেছে ড্রইংরুমে এবং রান্নাঘরে,
কাজ জমেছে বারান্দা আর ঘরের মেঝের পরে
কাজ জমেছে ধুলো ঝাড়ার পোশাকে-আশাকে,
পানি দেবার কাজ জমেছে ফুলের চারাটাকে।

কাজ জমেছে গঞ্জে গ্রামে, অন্দরে বন্দরে,
আরো অনেক কাজ জমেছে চিত্তের কন্দরে
অনেক বছর কাউকে যেন কেউ দিয়েছে ফাঁকি,
তাই দেখি আজ অনেক কাজের অনেক কাজ-ই বাকি,
হচ্ছে প্রচুর চিন্তা করা, প্রচুর কথা বলা,
সূক্ষ্মভাবে হচ্ছে শুধু কাজ এড়িয়ে চলা...

কোথাও কি কেউ নেই?
বলবে, তোমার কাজটা হবে করতে তোমাকেই,
তোমার এ কাজ, তোমারই কাজ! কেউ দেবে না করে,
করোনি, তাই অজস্র কাজ রয়েছে আজ পড়ে।

চতুর্দিকে পাহাড়প্রমাণ কাজ জমেছে, তাই,
দূর হয়ে যাও বাক্যনবাব, কর্মদানব চাই ...

২৮ জানুয়ারি, ২০১৮

আবার জঙ্গি: পাকিস্তানি বনাম বাংলাদেশি গণমানস

আবারো জঙ্গি! সেদিন পুঠিয়ায় চার ও চট্টগ্রামে দুই জঙ্গি ধরা পড়েছে। অর্থাৎ কালনাগিনীটা নিহত হলেও তার লেজটা এখনো নড়ানড়ি করছে। সেই কত আগে পাকিস্তানে (আত্মঘাতীসহ) জঙ্গি-উত্থানের পর থেকেই জঙ্গি-তাত্ত্বিকরা বলে আসছিলেন বাংলাদেশেও জঙ্গি ও আত্মঘাতী হামলা হবে কারণ বাংলাদেশের উগ্রপন্থীরা পাকিস্তানের উগ্রপন্থীদের সাথে শুধু সম্পর্কিতই নয় বরং তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত।

এখন তো এমন একটা সপ্তাহ প্রায়ই যায় না যখন পাকিস্তানে রাস্তাঘাটে হাট-বাজার-বাসে এমনকি মসজিদেও জঙ্গি হামলায় সাধারণ মানুষ নিহত হয় না। কেউ বলে না জঙ্গিরা খুনি, বলে না একটা সভ্য দেশে কোনো কারণেই আইন হাতে তুলে নেয়া যায় না। জঙ্গিদের প্রতি দু'দেশের সাধারণ মানুষের মনোভাব কী? ব্যাখ্যার চেয়ে উদাহরণে সেটা বেশি স্পষ্ট হবে (কিছু ব্যতিক্রম সবকিছুরই থাকে)।

১। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৯, লাহোর। এক প্রিন্টিং প্রেসের উল্টোদিকে দালানের কোণে লুকিয়ে আছে ইলমুদ্দিন। সবল সুঠাম ২১ বছরের তাগড়া তরুণ, হতদরিদ্র কাঠমিস্ত্রির নিরক্ষর ছেলে। ক্রোধে ধ্কধক করে জ্বলে জ্বলে উঠছে তার তীব্র দুচোখ। হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে আছে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের ভেতরে মারাত্মক চাপাতি। ইস্পাতের চাপাতি, অসম্ভব শক্ত আর ধারালো। দুদিন আগে পুরো একটা টাকা খরচ করে কিনেছে সে ওটা। ওই এক টাকায় অনেকগুলো রুটি কেনা যেত। কিন্তু দরকার হলে না খেয়ে থাকবে সে, তবু ইসলামের শত্রুকে খুন করতে সবচেয়ে শক্ত সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্রটাই তার চাই। প্রেসের মালিক রাজপাল ১৯২০ সালে মহানবী (সা.)-এর যৌনতা নিয়ে কুৎসা করে লেখকের নামহীন এক বই বের করেছে, 'রঙ্গিলা রসুল'। কোথায় কোন মুসলিমেরা নাকি হিন্দুদের সীতাকে পতিতা বানিয়ে লিফলেট ছেড়েছে বলে উড়ো খবর এসেছে, তারই প্রতিবাদে এই বই। ওই লিফলেট আর এই বই নিয়ে হিন্দু-মুসলিম ঘৃণা-আক্রোশে উত্তাল ভারতবর্ষ, দাঙ্গা প্রায় লাগে লাগে।

গল্প নয়, ‘ধর্মানুভূতি’ আইনের রক্তাক্ত ইতিহাস। পুরো উপমহাদেশকে ঝাঁকি দিয়ে গেছে এ ঘটনাগুলো, পাকিস্তান-বাংলাদেশের বর্তমান-ভবিষ্যতে এগুলোর প্রভাব প্রবল ও সুদূরপ্রসারী।

ইলমুদ্দিন

ইলমুদ্দিনের একাগ্রতা টিকটিকির মতো। বাল্বের কাছের উজ্জ্বল আলোতে ওই যে দেয়ালে বসে আছে একটা পোকা। দূর থেকে তার দিকে তিরের মতো ছুটে এল টিকটিকিটা, কিছুটা দূরে এসে হার্ড ব্রেক করে থামল। দু’চোখের দৃষ্টি তার তিরের মতো বিঁধে আছে পোকাটাকে, তার চিন্তা চেতনায় এখন ওই পোকাটা ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই! এবারে অতি সন্তর্পণে অতি সাবধানে কয়েক পা এগিয়ে আবার থামল সে, জ্বলন্ত দুচোখ তার যেন পোকাটাকে গিলে খাচ্ছে। একাগ্রতার চাপে খেয়ালও নেই তার লেজ ওপরে উঠে পাক খেয়ে যাচ্ছে স্ক্রুর মতো।

তারপরেই ছোট্ট একটা লাফ।

নির্ভুল।

এবং নির্মম।

'রঙ্গিলা' রসুল" প্রকাশের জন্য ১৯২৩ সালে রাজপালের কারাদণ্ড হলেও সে আপিলে ছাড়া পেয়েছিল কারণ তখনো ভারতে "ধর্মানুভূতি" আইন ছিল না। ইলমুদ্দিনের পক্ষে প্রবল জনমত গড়ে তুললেন ইকবাল ও আলেম সমাজ, বিরাট হিরো হয়ে গেল সে। কেউ বলল না সে একটা খুনি, বললো না একটা সভ্য দেশে কোনো কারণেই আইন হাতে তুলে নেয়া যায় না। বরং কবি ইকবাল তার প্রশংসায় বয়ান দিলেন–'এই নিরক্ষর ছেলেটা আমাদের সবাইকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছে' !! ইকবালের অনুরোধে ইলমুদ্দিনের পক্ষে লড়লেন স্বয়ং জিন্নাহ। মামলাটা স্পষ্ট ছিল এবং কোর্টে সে নিজেকে খুনি বলেই দাবি করেছিল তাই তার ফাঁসি হয়ে গেল ৩১ অক্টোবর ১৯২৯ সালে। জীবনে এই একটা মামলা হেরে গেলেন জিন্নাহ। জাতি তার ফাঁসির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল, জনতার মুখে মুখে সে হয়ে গেল 'গাজী ইলমুদ্দিন শহীদ'।

একইসাথে 'গাজী' ও 'শহীদ' খেতাবের জগাখিচুড়ি বোধহয় শুধু পাকিস্তানেই সম্ভব। সেই আমলে তার জানাজায় হয়েছিল প্রায় দু'লক্ষ লোক, তার নামে পার্ক, রাস্তা, হাসপাতাল হয়েছে, এমনকি তার ওপরে একটা নয় বরং কয়েকটা মুভি বানানো হয়েছে এবং সেগুলো প্রভূত জনপ্রিয় হয়েছে।

১৯২৭ সালে ব্রিটিশ 'ধর্মানুভূতি' আইন বানায়, ১৯৮২ সালে পাকিস্তানে 'ধর্মানুভূতি' আইনের ২৫৯খ ধারায় আজীবন কারাদণ্ড ও ১৯৮৫ সালে ২৫৯গ ধারায় মৃত্যুদণ্ডের আইন করে। এই ভয়ংকর আইনের ব্যাপক প্রয়োগে প্রেম, ব্যবসা, জমিজমা ইত্যাদিতে প্রতিপক্ষের ওপরে ষড়যন্ত্র করে 'ইসলামবিরোধী' কথা বা কাজের অপবাদ দিয়ে অজস্র নিরপরাধ বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের সর্বনাশ হয়েছে। (এখনকার বাংলাদেশের মতোই) অজস্র সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ করে তাদের সম্পত্তি গ্রাস করা হয়েছে, এর মধ্যে কিছু ইমামও জড়িত।

২। ৮৮ বছর পর এই সেদিন, ৪ জানুয়ারি ২০১১। পাঞ্জাবের গভর্নর সালমান তাসির। সব নাগরিকের সমান অধিকারের কঠোর প্রবক্তা, ধর্মানুভূতি আইনের তীব্র সমালোচক, ধর্মানুভূতি আইনের শিকার

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শক্তিশালী বন্ধু। ইসলামাবাদে মিটিং শেষে তিনি গাড়িতে উঠতে যাবেন, মুমতাজ কাদরীর (তাঁর দেহরক্ষীদের একজন) অজস্র গুলি হিংস্র বর্শার মতো তাঁর শরীর ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে গেল, লুটিয়ে পড়ল তাঁর প্রাণহীন দেহ। আনন্দে ফেটে পড়ল ইসলামি নেতারা আর সারা জাতি, প্রায় ৫০০ মওলানা জাতিকে আহ্বান করল তাসিরের জানাজা বর্জন করতে। কোর্টে যাবার পথে হাজার জনতা কাদরীকে অজস্র ফুলে ফুলে ঢেকে দিল, তার সমর্থনে এগিয়ে এল ৩০০ আইনজীবী। ২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি তার ফাঁসি হলে ইসলামি দলগুলোর নেতৃত্বে সারা জাতি আবারো বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, ভাঙচুর ধর্মঘটে দেশ অচল হয়ে পড়ে, বোমা বিস্ফোরণে ৬৯ জন নিহত হয়, লাখো লোক হয় তার জানাজায়। তার কবরটা তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, বহুলোক সেখানে জিয়ারত করে। তার নামেও বানানো হয়েছে মসজিদ। কেউ বলেনি ও একটা খুনি, বলেনি একটা সভ্য দেশে কোনো কারণেই আইন হাতে তুলে নেয়া যায় না। শুধু সালমান তাসিরের স্ত্রী জাতিকে দিয়েছেন সতর্কবাণী–জাতি কোন সর্বনাশা পথে চলছে তা আজ বুঝতে পারছে না, টের পাবে ভবিষ্যতে।

জঙ্গিদের প্রতি আমাদের মন-মানস কী? পাকিস্তানি মানসের সাথে আমাদের মানসের মিল ও তফাত কী?

বাংলাদেশে জঙ্গিরা বৌদ্ধ ধর্মগুরু, পুরোহিত, বিচারক, বাউল, লেখক, প্রকাশক, বিদেশি ও সাধারণ মানুষসহ প্রচুর মানুষ হত্যা করেছে। কিছু নারী-জঙ্গিও জন্মেছে যা পাকিস্তানে তেমন দেখা যায়নি। বাংলাদেশে- 'আগে জানলে আমি প্রাণপণে ওকে বাধা দিতাম,–ও আমার ছেলে নয়'–ঘৃণাভরে বলেছেন হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টের জঙ্গির পিতা মীর হায়াৎ কবির–সিএনএন নিউজ। জঙ্গিদের আত্মীয়েরা এমনকি মায়েরা পর্যন্ত জঙ্গিদের মৃতদেহ নিতে যাননি–এমনকি মুখ পর্যন্ত দেখেননি। এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ জাতির মরমিয়া শক্তি কতটা প্রবল, যা পাকিস্তানে কল্পনাও করা যায় না। এটাও পাকিস্তানে কল্পনা করা যায় না, যশোরে তিনজন, আগে আরো চারজন, বগুড়ায় আরো কিছু জঙ্গি আত্মসমর্পণ করে বলেছে– 'দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কুরআনের অপব্যাখ্যার

শিকার হয়ে আমরা ইসলাম রক্ষার নামে মানুষ হত্যায় প্রলুব্ধ হয়েছিলাম... ”। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে জঙ্গিরা নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য দোয়া কামনা করে অন্য জঙ্গিদের ফিরে এসে স্বাভাবিক জীবন যাপন করার অনুরোধ জানায়। (সূত্রঃ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম)

অর্থাৎ–

ক. বাংলাদেশের সরকার সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জঙ্গিদের ওপরে, একেবারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। পাকিস্তানে সরকারের বাগাড়ম্বর ছাড়া জঙ্গিদের সাথে কার্যকর কোনো লড়াই-ই নেই। তাছাড়া ওখানে শর্ষের মধ্যেই ভূত, আর্মি-পুলিশের মধ্যে ঢুকে আছে জঙ্গিবাদ ও জঙ্গিপ্রেম।

খ. ওদের জঙ্গিরা জাতির বিরাট হিরো, আমাদের জঙ্গিরা জাতির ঘৃণার পাত্র। ওদের জঙ্গি-খুনিদের সমর্থনে জাতি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, আমাদের জঙ্গি-খুনিদের বিরুদ্ধে জাতি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ।

গ. ওদের জঙ্গিদের নামে মৃতদেহের ওপর গড়ে ওঠে মাজার-মসজিদ আর আমাদের জঙ্গিদের মৃতদেহ এতিমের মতো পড়ে থাকে হাসপাতালের হিমঘরে, আত্মীয়েরা এমনকি বাবা-মাও তাদের মৃতদেহ নিতে যায় না। ওদের জঙ্গিদের নামে পার্ক-রাস্তা-হাসপাতাল হয়, আমাদের জঙ্গিরা নিক্ষিপ্ত হয় ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

ঘ. ওদের জঙ্গিরা সবার সামনে বুক ফুলিয়ে সটান দাঁড়িয়ে থাকে, আমাদের জঙ্গিরা ইঁদুরের মতো পালিয়ে বেড়ায়।

ঙ. আমাদের জঙ্গিরা কয়েকজন হলেও ভুল বুঝতে পারে সুপথে ফিরে আসতে পারে কিন্তু ওখানে তা কখনোই হয়নি।

এই হলো জঙ্গিদের প্রতি ওদের মন-মানসের সাথে আমাদের মন-মানসের তফাত।

তফাত কেন? কারণ শুরু থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিকেরা রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মীয় উগ্র নেতৃত্বের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন করেছে। ওদের শিরা-উপশিরায় বইছে মওদুদীর বিষাক্ত প্রবাহ, ওখানে বেশির ভাগ সংবাদ-

মাধ্যম, সুশীল সমাজ, ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কর্মী, লেখক-বুদ্ধিজীবী, আলেম মওলানা ও মসজিদ-মাদ্রাসাগুলো জাতির শিরা-উপশিরায় ঢেলে দিয়েছে জঙ্গিবাদের মহামারি, সেই সর্বগ্রাসী তাণ্ডবের সামনে সরকার অসহায়। আর বাংলাদেশের শিরা-উপশিরায় বইছে হজরত শাহজালাল-শাহ পরান-শাহ মখদুম-হাজী দানেশমন্দ-দের দেয়া মরমিয়া ইসলামের নির্যাস, তাই তো জঙ্গির বিরুদ্ধে জাতি ফেটে পড়ে ভৈরব গর্জনে, ফেটে পড়ে সংবাদমাধ্যম, সুশীল সমাজ, ছাত্র, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মীরা, লেখক বুদ্ধিজীবী ও বেশির ভাগ আলেম মওলানা। এজন্যই আমাদের সরকার জঙ্গিদের বিরুদ্ধে হার্ড-লাইনে যাবার শক্তি ও সাহস পেয়েছে। এটা জঙ্গিদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ। অনেক ব্যাপারে সরকার যৌক্তিকভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ, কিন্তু জঙ্গি দমনে সরকারের সাফল্য প্রশংসার দাবি রাখে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে এলে ধর্মীয় নেতৃত্ব সাধারণত হিংস্র হয়ে ওঠে এটা ইতিহাসের শিক্ষা। ধর্মীয় উগ্রতায় পাকিস্তান এখন টার্মিনাল কেস, সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোও এই সর্বনাশা পথে হেঁটেছে ও হাঁটছে। চালাকি করে স্বার্থ উদ্ধার হতে পারে কিন্তু জাতির মঙ্গল করা যায় না। একদিকে ধর্মান্ধতার সাথে আপসও করবেন অন্যদিকে তাকে দমনও করবেন তা হয় না। অনেক সময় মাত্র একটা শব্দের ভেতর এমন বজ্রশক্তি থাকে, যা একটা জাতির দিক পরিবর্তন করতে পারে।

ওবামার প্রথম নির্বাচনে কোটি জনতার হাতে ব্যানারে মাত্র একটা শব্দ ছিল ‘চেঞ্জ’, যা দিয়ে আমেরিকায় বিপ্লব হয়েছিল, প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিল। বাংলাদেশ এখন যেভাবে চলছে, সেভাবে চললে বিশ-পঁচিশ বছর পরে বাংলাদেশেও একটা শব্দে কেয়ামত নেমে আনতে পারে–যদি কোন রাজনৈতিক দল একটা শব্দ নিয়ে নির্বাচনে নামে–‘শারিয়া’। ব্যস আর দেখতে হবে না–আমরা ডুবে যাব অতলে...

অলক্ষ্যে অট্টহাসি হাসছে নিয়তি, সাবধান বাংলাদেশ !

১০ জানুয়ারি, ২০১৯

কোরান যেভাবে দাসপ্রথা উচ্ছেদ করেছে

১৬ ডিসেম্বর মাত্র চলে গেল। আবার ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে কোটি কোটি হৃদয়ে আনন্দ আর অশ্রুর বন্যা, আবারও মনে পড়ল ৪৬ বছর আগের সেই উদ্দাম আনন্দ আর অশ্রুস্রোত।

"যে দেখেনি বুঝবে না সে এমন কেয়ামত ছিল,

কেয়ামতেই জাতির স্বাধীনতার নেয়ামত ছিল"।

চিরকাল ইসলামবিদ্বেষীরা (যাদের চোখে ইসলাম মুসলিমের সব কিছুই খারাপ) ও ইসলামের সমালোচনাকারীরা (যারা অনেক পড়াশোনা করে দলিলের ভিত্তিতে ভদ্রভাবে ইসলাম-মুসলিমের সমালোচনা করেন) অভিযোগ করে এসেছে, ইসলাম যদি শান্তির ধর্মই হয় তবে দাসপ্রথা উচ্ছেদ করল না কেন। অভিযোগটা যৌক্তিক। কেমন হতো যদি স্বাধীনতার পরে আটকে পড়া পাকিস্তানিদেরকে বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দাস হিসেবে বিতরণ করত? মুক্তিযোদ্ধারা বন্দী পুরুষদের বিক্রি করে দিত আর নারীদের যৌনদাসী হিসেবে রেখে দিত? কী হয় যদি কোনো দেশে বিজয়ী সরকার পরাজিত দেশের নারী পুরুষকে দাস-দাসী বানিয়ে বিজয়ী সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করে? তারা দাসীদের ইচ্ছেমতো বিছানায় নিয়ে যায়, বাজারে বিক্রি করে বা বন্ধুদের 'উপহার' দেয়?

বলাই বাহুল্য মাত্র দু-আড়াইশ বছর আগেও পশ্চিমা অনেক দেশ আইন করে এটা বন্ধ করার আগে এ বর্বর প্রথা চালু ছিল, এমনকি গির্জাগুলো পর্যন্ত দাস-ব্যবসা করত। অথচ কোরান সেই ১৪০০ বছর আগেই দাসপ্রথা শিকড় থেকে উচ্ছেদ করেছিল। পরে মুসলিম রাজারা ইসলামের নামেই নানারকম শরিয়া আইন ও হাদিস বানিয়ে ধূর্তভাবে দাসপ্রথাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই দুটো পদ্ধতিই দেখব আমরা এখন।

নবীজির (সা.) পর বহু শতাব্দী ধরে বহু দেশ বিজয়ের ফলে মুসলমানরা

অসংখ্য দাস-দাসীর মালিক হয়েছিল। মাত্র সাতজন সাহাবি মুক্ত করেছিলেন ৩৯,২৫৯ জন দাস-দাসীকে (সূত্র ৪)। হাকিম বিন হাজাম একাই মুক্ত করেছিলেন ২০০ জনকে (সূত্র ৫)। কিন্তু এই শতাব্দী-প্রাচীন কুপ্রথাকে কোরান হঠাৎ একদিন বিপ্লব করে উচ্ছেদ করলে ভেঙে পড়ত ফ্রি-শ্রম ভিত্তিক অর্থনীতি, জনগণ হয়ে পড়ত বিভ্রান্ত আর অসংখ্য দাস-দাসী হয়ে পড়ত নিরাশ্রয় অন্নহীন। কারণ জনগণ যদি মনের দিক থেকে তৈরি না হয় তবে যেকোনো ভালো জিনিসও জোর করে চাপিয়ে দিলে ফল খারাপ হতে বাধ্য। সে-জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিপ্লবের চেয়ে বিবর্তনই ভালো, অতীত-বর্তমানে এর বহু উদাহরণ আছে।

দাসদের ওপরে অনিয়ন্ত্রিত অত্যাচার হতো ইসলাম আসার আগে। যেহেতু যুদ্ধবন্দিনীরা ছিল দাসী, তাই এদের সাথে শোয়া বিজয়ী মুসলিম-সৈন্যদের জন্য প্রথম দিকে জায়েজ ছিল (সূত্র ২২, ২৬, ২৯)। ড. আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার, আমীর আলি, হারুন ইয়াহিয়া, ড. এডিপ ইউকসেল প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা অবশ্য দাবি করেন, দাসীর সাথে শোয়ার ব্যাপারটা বুঝবার ও অনুবাদের গোলমাল, কোরান কখনো একে অনুমতি দেয়নি। কিন্তু ওনারা মেইনস্ট্রিম নন।

এটা স্পষ্ট যে, কোরান যদি দাসপ্রথার পক্ষে থাকত তবে দাসের ওপর শতাব্দীপ্রাচীন অনিয়ন্ত্রিত অত্যাচার নিয়ে খুশিই থাকত। কিন্তু আমরা দাসপ্রথার বিরুদ্ধে এক উদ্বিগ্ন কোরানকে দেখতে পাই যে কিনা কারণে হোক অকারণে হোক, যুক্তিতে হোক বাহানা বা অছিলাতেই হোক, যেসব ব্যাপারের সাথে দাসপ্রথার কোনোই সম্পর্ক নেই সেগুলোকেও প্রয়োগ করেছে দাসমুক্তির জন্য। যেমন–

১। সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হলে দাস-দাসীদের মুক্তি দাও (সূত্র ১১)।

২। রমজানে রোজা না রাখলে বা রোজা রাখার প্রতিজ্ঞা ভাঙলে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাস-দাসীদের মুক্তি দাও (সূত্র ২)।

৩। রোজা অবস্থায় হঠাৎ আল্লাহ-রাসুলের প্রতি খারাপ কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলে দাস-দাসী মুক্তি দাও (সূত্র ২৫)।

৪। জাকাতের পয়সা দিয়ে দাস-দাসী কিনে তাদের মুক্তি দিতে পারো (সূত্র ২৭)।

৫। কোনও গর্ভবতীকে আঘাত করে কেউ গর্ভপাত ঘটালে দাস-দাসী মুক্তি দিয়ে ক্ষতিপূরণের রায় দিতে পারেন আদালত (সূত্র ৩)।

৬। ক্রীতদাসদের বলা হয়েছে 'ভাই', অর্থাৎ দাসীরা বোন। একই খাবার-পোশাক দিতে বলেছেন নবীজি (সা.), সাধ্যাতীত কাজ দিতে নিষেধ করেছেন, আরো অনেক ভালো কথা আছে (সূত্র ১৫)।

৭। দাসীদের মুক্ত করে বিয়ে করার চাপও দিয়েছে ইসলাম, একেবারে দ্বিগুণ সওয়াবের কথা বলে উদ্বুদ্ধ করেছে (সূত্র ১৪, ১৮, ১৯)।

৮। মৃত্যুশয্যায় সাহাবিদের প্রতি দাসদের জন্য নবীজির (সা.) উৎকণ্ঠিত নির্দেশ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

যাই হোক, যুদ্ধবন্দিনীদের দূর দেশে পাঠিয়ে দাসের হাটে বিক্রিও করা হতো (সূত্র ২৩)। যদিও একটি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুসলিম দাসদেরই মুক্ত করার কথা বলেছে কোরান (সূত্র ৬), তবু সব মিলিয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৪০০ বছর আগে এ এক অসাধারণ বিপ্লব। এতসব পদক্ষেপ নেবার পর গণমানসে যখন দাসদের ভাবমূর্তি ধীরে ধীরে 'হুকুম পালনকারী পশু' থেকে 'হুকুম পালনকারী মানুষ'- এ উন্নীত হলো তখন এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, দাসপ্রথার একেবারে শিকড়ে মরণাঘাত হানল কোরান।

কী সেই মরণাঘাত? কোন সুরা, কোন আয়াত? ইসলামের প্রথম দিকে মক্কার, না শেষের দিকে মদিনার আয়াত সেটা ?

এবারে আবেগবর্জিত হয়ে সূত্রের অংক করলে আমরা দেখব, কোরান (ক) প্রথমে দাসদের মুক্তি ও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা বন্ধ করেছে। তারপরে (খ) কিছু অধিকার দিয়ে জনগণের মন-মানসে দাসদের 'মানুষ' ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, এবং সবশেষে (গ) শিকড় কেটে দিয়ে দাসপ্রথার পুরো উচ্ছেদের বিধান দিয়েছে। ১৪০০ বছর আগের আরবভূমি–চারদিকে শুধু গোত্র আর গোত্র–পরস্পরের সাথে লড়াই-ঝগড়া লেগেই আছে। কেউ

স্বগোত্রের কাউকে হারাতে চায় না কারণ সদস্যসংখ্যাই গোত্রের শক্তি, তাই সাধারণভাবে স্বগোত্রের কাউকে দাস বানাবার সামাজিক সংস্কৃতিও নেই। দাসের একমাত্র উৎস যুদ্ধবন্দীরা। যুদ্ধবন্দী যদি না থাকে তাহলে দাসও থাকবে না। কোরান আঘাতটা হেনেছে সেখানেই–সুরা মুহম্মদ আয়াত ৪। সংশ্লিষ্ট অংশ:

"যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত করো তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলো। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও।"

পরিষ্কার হুকুম, যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তি দিতে হবে মুক্তিপণ নিয়ে বা না নিয়ে। ব্যস, চ্যাপ্টার ক্লোজড।

আয়াতটা মদিনায় অবতীর্ণ, মক্কায় নয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরে ইসলামের এই মানবাধিকারকে সম্পূর্ণ উল্টে দেয়া হলো। শারিয়া আইন বানানো হলো–"যুদ্ধবন্দিনী হওয়ামাত্র নারীদের পূর্বের বিবাহ বাতিল হইবে" (সূত্র ঝ)। ওরা ওদের ধর্মমতে বিয়ে করেছে, তুমি তাদের বিয়ে বাতিল করার কে? মতলবটা পরিষ্কার, বন্দিনী ধর্ষণ। বিজয়ী সৈন্যেরা বলছে–"আমরা যুদ্ধের গণিমত হিসেবে প্রাপ্ত রমণীদের সাথে আজল (নারী-দেহের বাইরে বীর্যপাত) করিতাম (সূত্র ৭)। এমন হাদিসও আছে–কিছু সৈন্য বন্দিনীদের স্বামীদের সামনেই তাদের ধর্ষণ করত, কিছু সৈন্য "তাহা পছন্দ করিত না" (সূত্র ৩২)। কিন্তু এ হাদিসটা ঠিক নয়, এর উল্টো হাদিস আছে সহি মুসলিমে।

অনুবাদ বিশেষে হাদিস নম্বরগুলোর কিছু ব্যত্যয় ঘটে। আমরা খেয়াল করি না, শরিয়া আইন বানানো হয়েছে হাদিস সংকলনের আগে, সেজন্যই আমরা অন্যায় আইনগুলোর সমর্থনে 'জাল হাদিস' দেখতে পাই। যে হতভাগী দাসীগুলোর একই সাথে দুই, তিন, বা দশ-বারো জন মনিব ছিল, কীভাবে কাটত তাদের দিন-রাত?

দু'একটা নয়, ছয় ছয়টা হাদিস এবং হানাফি আইন বলছে দাসীদের একসাথে কয়েকজন মনিবের প্রথা ছিল এবং মনিবদের অধিকার ছিল

তাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ঐ দাসীদের সাথে শোয়ার (সূত্র ৯)। নবীজির চোখের সামনে এ অনাচার হয়েছে তা আমরা বিশ্বাস করি না, এ-সব হাদিস পুরুষতন্ত্রের স্বার্থে পরে বানানো হয়েছে। কে জানে কত লক্ষ লক্ষ হতভাগিনীর জীবন শুধু এর-ওর-তার বিছানায় কেটেছে। একটা সূত্র দিচ্ছি, সহি বুখারি ভলিউম ৩ হাদিস ৬৯৮, এটা আছে হাদিস ৬৯৭, ৬৯৯, ৭০১ ও ৭০২-তেও :

"আল্লাহ'র নবী (সা.) বলিয়াছেন যদি কেউ কে৭ানো এজমালি (যার অনেক মালিক আছে) দাস-দাসীকে নিজ অংশ থেকে মুক্ত করে এবং তাহার কাছে পুরো মুক্তি দেবার মতো যথেষ্ট অর্থ থাকে তাহলে তাহার উচিত কোনো ন্যায়পরায়ণ লোক দ্বারা সেই দাস-দাসীর উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করা, এবং তাহার অংশীদারদের তাদের অংশের মূল্য দিয়া সেই দাস-দাসীকে মুক্ত করিয়া দেওয়া। তাহা না হইলে সে শুধু সেই দাস-দাসীকে আংশিক মুক্ত করিল।" এর সাথে হানাফি আইনটা মিলিয়ে নিলে পরিষ্কার হবে : "অংশীদার (মালিকগণ) পরস্পরের সম্মতিক্রমে ক্রীতদাসীকে দৈহিকভাবে উপভোগ করিতে পারিবে" (সূত্র ১)।

আশ্চর্য নয়, মুসলমানদের অমঙ্গল এসেছে তাদেরই আচরণ থেকেই (সূত্র ২৮)। এবারে আমরা দেখব সুরা মুহাম্মদ আয়াত ৪ লঙ্ঘন করে কী নির্মম নৃশংস পদ্ধতিতে দাসপ্রথাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছেঃ

১. "দাসী (স্ত্রীর) গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে মালিকের গোলাম হয়" (সূত্র ১০)। বিয়ে করা দাসীর বাচ্চা-ই যদি গোলাম হয় তবে বিয়ে না-করা দাসীর বাচ্চারা তো গোলাম হবেই। এতে দাসপ্রথা কখনোই বন্ধ হবে না।

২. ট্যাক্স দেয়া বড্ড কষ্ট, চিরকাল মানুষ এটা ফাঁকি দিতে চেয়েছে। আর ফাঁকির পদ্ধতিটা "হালাল" হলে তো কথাই নেই। দেখুন শারিয়া আইন : "অন্যান্য সম্পত্তির ওপরে জাকাত থাকলেও ক্রীতদাস-সম্পত্তির ওপরে জাকাত নেই" (সূত্র ১২)। অর্থাৎ দাস-ব্যবসায়ে টাকা খাটানোকে উৎসাহিত করে দাসপ্রথাকে শক্তিশালী করা হলো।

৩. ক্রীতদাস যদি মালিক ও আল্লাহকে ঠিকমতো মেনে চলে তাহলে তার দ্বিগুণ সওয়াব হবে (সূত্র ১৩ ও ১৪)। অর্থাৎ মালিককে একেবারে আকাশে তুলে দাসের মনে আরও একটা শিকল পরানো হলো, মালিক অত্যাচারী হলেও সে বিদ্রোহের কথা চিন্তাও করবে না।

৪. এটা একটা মারাত্মক কথা। এবং মর্মান্তিক। যদি কোনো দাস বা দাসী তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যায় তবে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার কোনো ইবাদত কবুল হবে না (সূত্র ২১)। এই নিয়মে দাসপ্রথাকে একেবারে চরম শক্তিশালী করে তোলা হলো।

৫. এমনকি মুক্ত করে দেবার পরও দাস-দাসীরা প্রাক্তন মালিকের কাছে অদৃশ্য মালিকানায় বাঁধা থাকত, অন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। করলে হুমকি ছিল তাদের কোনো ইবাদত কবুল হবে না–সূত্র ২০।

৬. মালিকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তা অবৈধ, সেটা ব্যভিচার হবে (সূত্র ৩৫)।

৭. যদিও দ্বিগুণ সওয়াবের কথা বলে দাসীদের মুক্ত করে বিয়ে করায় উদ্বুদ্ধ করেছে ইসলাম (সূত্র ১৪, ১৮, ১৯) কিন্তু পরে দেখা গেল, কারো কাছে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার পয়সা থাকলে দাসীকে বিয়ে করাকে (হানাফি মতে) মাকরুহ ও (শাফি' মতে) হারাম করা হয়েছে (সূত্র ৮)।

"যেমনভাবে দাস-দাসীদের মারো, তেমনভাবে স্ত্রীদের মারবে না। তারপর (অর্থাৎ স্ত্রীদের মারার পর) রাতে তাদের সাথে শোবে"(সূত্র ২৪) এবং পরকীয়া ছাড়া স্ত্রী-প্রহারকে নবীজি (সা.) কখনো বৈধতা দেননি (সূত্র ৩৩ ও ৩৪), এসব হাদিস আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি যা তিনি স্ত্রীর ব্যাপারে সুস্পষ্ট বলেছেন, হুবহু উদ্ধৃতি: "DO NOT BEAT THEM, AND DO NOT REVILE THEM" অর্থাৎ "তাহাদিগকে প্রহার করিবে না, এবং তাহাদিগকে অপমান-নিগ্রহ করিবে না"–সহি আবু দাউদ হাদিস ২১৩৯। হ্যাঁ, এই হলেন শান্তির দূত, হিংস্রতা মারপিটের তথাকথিত "নবী" নন। বউ পিটিয়ে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে?

তাও অনেক সময় বাচ্চাদের সামনে? লজ্জার কথা !

দাসীদের বিয়ে করাকে প্রথমে উৎসাহিত করা হলেও নবীজির (সা.) পরে আইন হয়েছে: "হজরত ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য ইমামের মতে ইহুদি বা খ্রিষ্টান দাসী বিয়ে করা সর্বাবস্থায় অবৈধ" (সূত্র ১৭)। (ইমামেরা লিখেছিলেন অল্পই, তাঁদের পরে তাঁদের ছাত্রেরা ও ছাত্রদের ছাত্ররা ইমামদের নামে নিজেদের বহু আইন ঢুকিয়ে দিয়েছে–বিস্তারিত দেখুন আমার বই–"শারিয়া কী বলে, আমরা কী করি"-তে)।

মওলানা মওদুদী বলেছেন: "ইসলামি আইন অনুসারে যুদ্ধবন্দির নিজের দেশ যদি মুক্তিপণ দেয় তবে বন্দিরা মুক্ত হইবে। বন্দি-বিনিময়ও চলিবে। এই দুই উপায় না থাকিলে যুদ্ধবন্দিরা দাস-এ পরিণত হইবে" (সূত্র ৩০)। তাঁর তাফহীমুল কুরআন বইতে সুরা নিসা আয়াত ২৪-এর ব্যাখ্যাতেও তিনি এসব বলেছেন, ওটাও ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।

ড. জাকির নায়েকও কম যান না–ইসলামে দাসপ্রথা এবং বন্দিনী ধর্ষণের সমর্থনে তাঁর সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো ওই প্রথা আমেরিকার গুয়ানতানামো বে' কারাগার থেকে অনেক ভালো। আপনারাই বলুন, এটা কোনো যুক্তি হলো? এখানে লিংক দেয়া নিষেধ, তবে বক্তৃতাটা ইউটিউবে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি অন্ততঃ একটা দরকারি কথা বলেছেন যা মওদুদী বা ড. ফওজান বলেননি; তা হলো–ওসব অতীতের ব্যাপার, এখন আর ওগুলো প্রয়োগ করা যায় না। আসলে নবীজির (সা.) পরে মুসলিম ক্ষমতাশালীদের কোরান-বিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রমাণ আছে মওদুদী- ইমাম গাজ্জালীসহ অনেক দলিলে–এবং সাহাবির এই কথায়: "হে ভাতিজা ! তুমি তো অবগত নও রাসুলুল্লাহ (রা.)-এর ইহকাল ত্যাগের পর আমরা কী কী বিপরীত কার্য করিয়াছি"- সূত্র ৩১? (বইটা হারিয়ে গেছে, কেউ পৃষ্ঠাটা স্ক্যান পাঠালে ভালো হয়)।

মর্মবাণী : কোরানের কিছু হুকুম শুধু মুসলিমের জন্য, কিছু সারা মানবজাতির জন্য, কিছু পুরুষের ও কিছু নারীর জন্য, কিছু সেই সমাজের জন্য ও কিছু চিরকালের। পরিস্থিতির পরিবর্তন হবার ফলে কিছু হুকুম নবীজির (সা.) জীবদ্দশাতেই পরিবর্তন করা হয়েছে–প্রিন্সিপল্‌স্‌ অব

ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স–ড. হাশিম কামালী পৃ. ৩২৫ ইত্যাদি। সামাজিক-পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি কোরানে যথেষ্টই আছে, সমস্যা হয় যখন আমরা কোরানের হুকুমগুলোর গতিময়তা উপেক্ষা করে সেই সমাজের তাৎক্ষণিক হুকুমকে শাশ্বত মনে করে বর্তমানে প্রয়োগ করি।

নিবন্ধ সূত্রঃ

১। চ-এর পৃষ্ঠা ২৩১।

২। খ-এর আইন নং ১৬৬৯, ১৬৭৪, ১৬৮১, ইত্যাদি।

৩। গ-এর হাদিস নং ২৬৩০ এবং ২৬৩১।

৪। ক-এর পৃষ্ঠা ১২৫৭।

৫। ঘ-এর ভলিউম ৩, হাদিস নং ৭১৫।

৬। সুরা নিসা, ৯২।

৭। গ-এর হাদিস নং ২৪৩৪ ও ২৪৩৫ ; ঘ-এর ৩য় খণ্ড, হাদিস ৭১৮ ও অন্যান্য।

৮। ক-এর পৃষ্ঠা ২৪২।

৯। ঘ-এর ভলিউম ৩, হাদিস নং ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০১, ৭০২, ৭০৩ ও ৭০৪।

১০। ক-এর পৃষ্ঠা ২৪২।

১১। ঘ-এর ভলিউম ৩, হাদিস নং ৬৯৫ ও ৬৯৬।

১২। ঘ-এর ভলিউম ২, হাদিস নং ৫৪২ ও ৫৪৩ এবং গ-এর হাদিস নং ১১০৮।

১৩। গ-এর হাদিস নং ২৩৮৮।

১৪। ঘ-এর ভলিউম ৪, হাদিস নং ২৫৫।

১৫। গ-এর হাদিস নং ২৩৮৯ থেকে ২৩৯১-এর অংশ ও ২৬১৭।

১৬। সৌদি ইনফরমেশন এজেন্সি, ইনডিপেন্ডেন্ট সৌদি নিউজ

১৭। ক-এর পৃষ্ঠা ২৪২।

১৮। ঘ-এর ভলিউম ৩, হাদিস নং ৭২০, ভল্যুম ৭, হাদিস নং ২০।

১৯। গ-এর হাদিস নং ২৩৮৬।

২০। ঘ-এর ভলিউম ৩, হাদিস নং ৯৪ ও ভল্যুম ৪, হাদিস নং ৪০৪।

২১। ছ-এর পৃষ্ঠা ৩৭৭।

২২। সুরা আল মুমিনুন, আয়াত ৫, ৬, ৭।

২৩। জ-এর ভলিউম ৩, পৃষ্ঠা ১১২।

২৪। গ-এর হাদিস নং ২৪৬৮।

২৫। খ-এর আইন নং ১৬৭৫।

২৬। সুরা আল্-আহজাব, আয়াত ৫২।

২৭। খ-এর আইন নং ১৯৩৩ (৫)।

২৮। ক-এর পৃষ্ঠা ২৬৭।

২৯। সুরা আল্ মা'আরিজ, আয়াত ২৯, ৩০, ৩১।

৩০। মুনির কমিশনের সামনে মওদুদীর বক্তব্য, পৃষ্ঠা ২২৫, রিপোর্টটা ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।

৩১। ঞ-এর পৃষ্ঠা ২৯৭, হাদিস নং ১৫০৫।

৩২। ট-এর হাদিস নং ১১-এর ২১৫০।

৩৩। ঠ-এর পৃষ্ঠা ৮৫২, ধারা ১৩২২–বিশ্লেষণ।

৩৪। ড-এর পৃষ্ঠা ১৭১।

৩৫। সহি আবু দাউদ, হাদিস ২০৭৩।

(ক) বাংলায় কোরান শরিফের অনুবাদ–মওলানা মুহিউদ্দীন খান।

(খ) ইসলামি আইন–আয়াতুল্লাহ আল্ উজামা সৈয়দ আলী আল্ হুসায়নী আল্ সীস্তানী।

(গ) বাংলায় সহি বুখারির সংকলন–মুহম্মদ আবদুল করিম খান।

(ঘ) সহি বুখারির ইংরেজি অনুবাদ–ড. মুহম্মদ মহসীন খান, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়।

(ঙ) হাদিস সংকলনের ইতিহাস–মওলানা মুহম্মদ আবদুর রহীম।

(চ) হানাফি আইন হেদায়া–ইংল্যান্ডের ব্যারিস্টারি স্কুলে পড়ানো হয়।

(ছ) রুহুল কোরান–মওলানা আবদুদ দাইয়ান।

(জ) "ক্যাসাসুল আম্বিয়া"র অনুবাদ–মওলানা বশিরুদ্দীন ও মওলানা বদিউল আলম।

(ঝ) উমদাত আল্ সালিক–ইমাম শাফি'র আইন নং o.9.13, পৃঃ ৬০৪।

(ঞ) সহি বুখারির বাংলা অনুবাদ–মওলানা আজিজুল হক (বইটা আপাতত কাছে নেই)।

(ট) সহি সুনান আবু দাউদ–ইন্টারনেট সংস্করণ।

(ঠ) বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খণ্ড।

(ড) রিয়াদুস্ সালেহীন–আল্লামা ইমাম নববী।

২১ *ডিসেম্বর*, ২০১৭

মসজিদে গণহত্যা ও জঙ্গি-মানস

১. নভেম্বর ২৪, ২০১৭–মিসরের সুফি মসজিদে জুমা নামাজে বোমা-ব্রাশফায়ার, ২৭ শিশুসহ নিহত ৩০৫, আহত ১২৮।

২. হামলার ব্যাপকতা, প্রস্তুতি, ধরন, ক্ষিপ্রতা, দক্ষতা, টিমওয়ার্ক ইত্যাদি আইসিসের সঙ্গে মেলে এবং এক সন্ত্রাসীর হাতে আইসিসের পতাকা ছিল বলে একজন জানিয়েছেন।

৩. ২০১৩ সালে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুরসিকে অন্যায়ভাবে ক্ষমতাচ্যুত ও গ্রেপ্তার, সিনাইতে জঙ্গি-উত্থান, সরকারি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ ও জয়-পরাজয়, ২০১৪ সালে সেখানকার জঙ্গি সংগঠন (ওলিয়াত সিনাই বা আনসারুল বায়তুল মুকাদ্দাস) আইসিসের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা, এগুলো রাজনৈতিক। কিন্তু মসজিদে হামলার শিকড়টা আদর্শিক। সমস্যাটা মারাত্মক। এ দানব প্রতিহত করতে দ্বন্দ্বটার শিকড়ে যেতে হবে, বুঝতে হবে দুপক্ষের চরিত্র ও কর্মপদ্ধতি।

বলা বাহুল্য, দুপক্ষই কোরান হাদিস থেকে সমর্থন দেখান। কিন্তু গাছের পরিচয় তো তার ফলেই। যেহেতু জনগণের পক্ষে অত অত কিতাব পড়া সম্ভব নয়, তাই বৃক্ষের ফলের দিকেই দেখা যাক সে শান্তি অর্থাৎ ইসলাম কোথায় আছে।

৪. সুফি মানসিকতা:

সুফিদের ধর্মবিশ্বাস হলো ইসলামের মিস্টিক অর্থাৎ মরমিয়া ব্যাখ্যা। "সুফিইজম অ্যান্ড শরিয়াহ, এ স্টাডি অব শেখ আহমদ সিরহিন্দ'স এফোর্ট টু রিফর্ম সুফিইজম" বইটা তাদের ইসলামি ধর্মবিশ্বাস বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছে, এর মধ্যে রাজনীতি ইসলামি রাষ্ট্র, মতভেদ হলে কাউকে শত্রু বা মুরতাদ বলা ইত্যাদি নেই। রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি তাদের মনোভাব আমরা সুফিদের মধ্যে দেখেছি। বাংলায় অনেক সুফি এসেছেন, তাঁদের অনেকেই প্রজাদের নালিশের ভিত্তিতে অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন। যেমন দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, বগুড়া, যশোর, হরিরামপুর ইত্যাদি জায়গার হজরত শাহ মাহমুদ, জাফর খাঁ গাজী, পীর বদরুদ্দীন, শাহ বদরুদ্দীন, সুলতান বলখী, কাত্তাল পীর, বড়খাঁ গাজী, শাহ নেকমর্দান ইত্যাদি। ক্ষমতায় বসলে তাদের ইসলাম প্রচারে সুবিধেই হতো, কিন্তু তাঁরা সবাই ক্ষমতা ছেড়ে জনগণের মধ্যে ফিরে মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ দেশকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিণত করার অভূতপূর্ব অসাধ্য সাধন করেছিলেন। সে জন্যই লক্ষ মুসলিম তো বটেই, লক্ষ অমুসলিম আজও আসেন হজরত শাহজালাল, নিজামুদ্দীন আউলিয়া, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতির দরবারে।

ইসলাম যদি শান্তির ধর্ম হয় তবে সে শান্তি এখানে আছে কিনা ভেবে দেখুন।

৫. জঙ্গি মানসিকতাঃ

জঙ্গিদের জীবন-মরণ চাওয়া মাত্র একটাই, তা হলো, শারিয়া আইনভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র। এ বিশ্বাস নিয়ে তারা জন্মায়নি, এটা তাদের মাথায় গেঁথে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বাসটা সতেরো শ শতাব্দীর ওয়াহাব বা সাম্প্রতিক জামাতে ইসলামি, মুসলিম ব্রাদারহুড, তালেবান, বোকো হারাম বা আইসিসের আবিষ্কার নয়, এটা বানানো হয়েছে চৌদ্দ শ বছর আগেই। নবীজি ও চার খলিফার পর ইসলাম রাজতন্ত্রের কুক্ষিগত হলো, রাজারা বিলক্ষণ জানত ইসলামে রাজতন্ত্র অবৈধ। তাই তাদের দরকার হলো রাজতন্ত্রের গায়ে ইসলামি লেবেলের। গড়ে উঠল রাজনৈতিক ইসলাম, দুনিয়ার সব অমুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভিত্তিতে– উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ

"প্রথমে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। তারপর যাহারা মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যাহারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হইল ও পরে যুদ্ধকে বাধ্যতামূলক করা হইল।"

মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহসিন খান অনূদিত সহি বুখারি (অখণ্ড) পৃ– ১০৮১। এটা দুনিয়ার সব অমুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর সমর্থনে শারিয়া আইন বানানো হলো–

"খলিফা দুনিয়ার সকল অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা মুসলমান হইয়া যায়।"

– শাফি আইন উমদাত আল শালিক, আইন নং ০.৯.৯।

সুরা হাদীদ আয়াত ২৫–

"আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি।"

এই "শক্তি'র ব্যাখ্যা করা হলো "রণশক্তি"– (ইবনে কাথির) আজ যখন যুদ্ধ করে দুনিয়া দখলের স্বপ্নটা কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়, এখন লোহার শক্তিটা হয়ে গেছে "রাষ্ট্রশক্তি।"

বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খণ্ড পৃ. ২৪৫)।

সুরা বাকারা ৪২, হজ ৩০ ইত্যাদি (মিথ্যা বলো না, সত্যের সঙ্গে মিথ্যে মিশিয়ো না) লঙ্ঘন করে চৌদ্দশ বছর আগেই আইন করা হয়েছিল, যা আজও আছে কিতাবে আর ওয়াজ মাহফিলে– "উদ্দেশ্য যদি বাধ্যতামূলক হয় তবে মিথ্যা বলা বাধ্যতামূলক।"– শাফি আইন নং r.8.2। দুনিয়ার সব অমুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাটা এখনো বলবৎ মওদুদীর সুস্পষ্ট দাবিতে যা জঙ্গিদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি– মুসলমানদের ক্ষমতা থাকলে তারা সারা দুনিয়া থেকে সব অমুসলিম সরকারকে উচ্ছেদ করে বিশ্ব-ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করবে– জিহাদ ইন ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৫।

মওদুদী এটাও বলেছেন– "ইসলামি বিপ্লবের পর জনগণকে নোটিশ দেওয়া হইবে যাহারা বিশ্বাসে-কর্মে ইসলাম ছাড়িয়াছে ও সেভাবেই থাকিতে চায় তাহারা প্রকাশ্যে অমুসলিম পরিচিতি প্রকাশ করিয়া এক বছরের মধ্যে দেশত্যাগ করুক। তারপর যাহারা জন্মাইবে তাহারা হইবে মুসলিম। ইসলামি আইন প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে ধর্মীয় কাজকর্ম ও দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা হইবে। তারপর কেউ ইসলাম ছাড়িয়া দিলে তাহাকে খুন করা হইবে।"

[দ্য পানিশমেন্ট অব দ্য অ্যাপোস্টেট অ্যাকর্ডিং টু ইসলামিক ল']

ইসলাম যদি শান্তির ধর্ম হয় তবে সে শান্তি এখানে আছে কিনা ভেবে দেখুন।

৬. বাস্তবতা:

ধর্মবিশ্বাসের এই দ্বন্দ্ব বাস্তবে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রবল হিংস্রতায়। পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নিদের পরস্পরের মসজিদে হামলা-হত্যার ঐতিহ্য বহু বছরের, সেখানে শিয়ারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। সুফিরা অস্ত্রহীন, অরক্ষিত ও আক্রান্ত, জঙ্গিরা সশস্ত্র ও আক্রমণকারী, তা-ও আবার অতর্কিত আক্রমণ। এ এক অসম, অন্যায় যুদ্ধ। সিনাই প্রবলভাবে সুফি-প্রভাবিত, মসজিদটি তাদের কেন্দ্র। সুফিরা জঙ্গিদের কখনো গালাগালি করেনি মুরতাদ বলেনি কিন্তু তবু জঙ্গিরা প্রচার করেছে 'সুফিবাদ একটি রোগ' ও গত বছর এক সুফি-ইমামের শিরশ্ছেদ করেছে। এবারে তারা মুসলিম হয়েও মসজিদে নামাজরত মুসলিম-হত্যায় বিশ্বরেকর্ড গড়ল। শিশুসহ শত শত নিরপরাধ নিহত-আহত হলো, শত শত এতিম হলো বিধবা হলো, বিশ্বে আবারও ছড়িয়ে গেল ইসলামভীতি। জঙ্গিদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি হয়ে উঠেছে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যেকোনো বাধা যেকোনো উপায়ে উচ্ছেদ করা ইবাদত, এরপর আর কত রক্ত ঝরবে কে জানে!

৭. পটভূমি বাংলাদেশ:

দেশে ইসলামি রাষ্ট্রপন্থীদের এক অংশ হিংস্র হয়ে উঠেছে। মুসলিমের মধ্যেই ভিন্নমত তারা সহ্য করতে পারে না এবং প্রতিপক্ষকে কতল করা ছাড়া আর কোনো সমাধান খুঁজে পায় না। এরা প্রবলভাবে সুফি-বিরোধী ও সুফিদের মাজারবিরোধী। এরাই বোমা হামলা করেছে হজরত শাহজালালের দরগায়। একাত্তরে এদের অবিশ্বাস্য নৃশংসতা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, ওটার শিকড়ই হলো ইসলামের ওই যুদ্ধবাজ ব্যাখ্যা। এই হিংস্রতারই প্রবল প্রকাশ সাম্প্রতিক ব্লগার-লেখক-প্রকাশক হত্যায়। ইসলামি রাষ্ট্রপন্থী নেতাদের কাউকে কোনোদিন দেখলাম না ভিন্নমতাবলম্বী কাউকে ডেকে আদব-লেহাজের সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ-আলোচনা করতে। সংলাপ না হলে নিজের প্রতি অভিযোগের সত্যতা কীভাবে যাচাই হবে, কীভাবে প্রতিপক্ষের যুক্তিগুলোর মূল্যায়ন হবে, কীভাবে পরস্পরের বিশ্বাসের

সবলতা দুর্বলতাগুলো উপলব্ধি করবে?

৮. অনতিবিলম্বে যা করতে হবে:

(ক) মুখে মিষ্টি কথা সবাই বলে, হিটলারও বলত। তাই মুখের কথা নয়, ইসলামি রাষ্ট্রপন্থীদের অতীত-বর্তমানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে;

(খ) আলেম-উলামা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত-পরিচালিত পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ইসলামি সংগঠন নাহদালাতুল উলামার প্রকাশিত "ইলিউশন অব ইসলামি স্টেট" (ইসলামি রাষ্ট্রের বিভ্রম)-এর মতো বইগুলো ছড়িয়ে দিতে হবে।

(গ) দেশের কিছু মওলানা বুক ফুলিয়ে হুংকার দেন ও ঘৃণা ছড়ান, তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে। তারা ভুলে যান যে, তারা ফিতনা ছড়াচ্ছেন, যা হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ।

সুরা বাকারা আয়াত ১৯১। অন্য মাওলানারা তাদের বিরোধিতা করলে ভালো হয়।

(ঘ) ধর্মে রাজনীতি ও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। এটা নতুন কিছু নয়, খোদ সৌদি আরবেই আইন করা হয়েছে খুতবায় রাজনৈতিক বক্তব্য দিলে ইমাম চাকরি হারাবেন– একাত্তর টিভি ৪ জানুয়ারি ২০১৭। সংযুক্ত আরব আমিরাতেও সরকার নির্দেশ দিয়েছে খুতবায় অমুসলিমদের প্রতি যেন নেতিবাচক কথা না বলা হয়। আলেম-উলামা-মাওলানারা জাতিকে হেদায়েত দিন, এখন যার অভাব প্রকট এবং ওখানেই থেমে যান। যে শুনবে শুনবে, কেউ না শুনলে তার দায়িত্ব আপনার নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের দেশে হুংকারি ওয়াজ করে "ইসলাম প্রতিষ্ঠা" করার দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়নি, সে অধিকার আপনার নেই।

৭ ডিসেম্বর, ২০১৭

অনেক দেশে নাস্তিক এখন সংখ্যাগুরু

'অনেকে দেশে এখন নাস্তিকরাই সংখ্যাগুরু', এ তথ্য ছাপা হয়েছে শারিয়াপন্থী দলগুলোর সমর্থক দৈনিক 'আমার দেশ'-এ, ৩০ জানুয়ারি ২০১৬, গ্যালাপ ইন্টারন্যাশনাল জরিপ।

চিরকাল বিশ্বাস করেছি পৃথিবীর 'ফাস্টেস্ট গ্রোইং রিলিজিয়ন' (সবচেয়ে প্রসারমাণ ধর্ম) হলো ইসলাম। বটেই তো। বিশ্বময় মুসলিম পরিবারে সন্তানের সংখ্যা অন্যদের চেয়ে বেশি, পশ্চিমা দেশে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করছে, তাতে এটাই তো হবার কথা। বিশ্বাসটা প্রথম ধাক্কা খায় বছর বিশ-পঁচিশ আগে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের জরিপের খবরে, সেখানে ৬৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রীই নাস্তিক। তারপর থেকে ব্যাপারটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খেয়াল করেছি; বিভিন্ন দেশে প্রজন্মকে সুযোগ পেলেই প্রশ্ন করেছি। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বহুকাল থেকে যা ছিল অন্তর্লীন ফল্গুধারায় প্রবহমান, সম্প্রতি তা উচ্ছ্বল জলধি তরঙ্গে রূপ নিয়েছে। সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃ তি–

- ইউরোপের অনেকে দেশে এখন নাস্তিকরাই সংখ্যাগুরু;
- চীনে ৬১ শতাংশ সরাসরি স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে;
- সুইডেনে ৮ শতাংশ উপাসনালয়ে ধর্মচর্চা করে, ৭৬ শতাংশ নাস্তিক;
- চেক প্রজাতন্ত্রে ১২ শতাংশ গির্জায় ধর্মচর্চা করে, ৭৫ শতাংশ নাস্তিক;
- ব্রিটেনের ৫৩ শতাংশের ধর্মবিশ্বাস নেই;
- হংকংয়ের নাগরিকদের ৬২ শতাংশে কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নয়;
- জাপানে নাস্তিকের সংখ্যা ৬২ শতাংশ;
- জার্মানিতে ৫৯ শতাংশ নাস্তিক;

- স্পেনের নাগরিকদের বড় একটা অংশই নাস্তিক;
- অস্ট্রিয়ার নাগরিকদেরও বড় অংশ নাস্তিক;
- ফ্রান্সের নাগরিকদের বৃহত্তর অংশ নাস্তিক।

[সূত্র: ডয়চে ভেলে]

অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডেও অন্যরকম হবার কারণ নেই। যেহেতু পশ্চিমা বিশ্বের সব কিছুই আমাদের দেশগুলোকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে, তাই ওই ধাক্কা এশিয়ার দেশগুলোতেও গিয়ে লাগছে ও আরও লাগবে। কারও পছন্দ হোক বা না হোক, এ সত্যের সামনে দাঁড়াতেই হচ্ছে দুনিয়াকে। কয়েক দশক পর বিশ্বসমাজকে এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। বদলে যাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক সমীকরণ। এখন দেখা যাক এটা ঘটছে কেন। অনেকের অনেক মতামত থাকবে নিশ্চয়ই, কিন্তু শুধু বিশ্বাস দিয়ে বাস্তবের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

১.

গণতন্ত্র কুক্ষিগত করে পুঁজিবাদ অর্থাৎ ক্যাপিটালিজম বিশ্বময় এক ভয়ানক ভোগবাদী জীবনধারা ও জীবনবোধ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমা প্রজন্মের বিশাল অংশ এখন বিশ্বাস করে ‘যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋনং কৃত্ত্বা ঘৃতং পিবেৎ’– অর্থাৎ ‘নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক, দূরের বাদ্য লাভ কী শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক’। সেখানে ধর্ম, মহাপুরুষ ও ধর্মগ্রন্থের জায়গাও নেই, দরকারও নেই–স্রেফ আনন্দ করে গেলেই জীবন সার্থক। পশ্চিমা দেশগুলোর আইনও একে সমর্থন করে– ‘একটাই জীবন তোমার, নিজ কর্মের দায়িত্ব নিয়ে অন্যের অধিকার খর্ব না করে বা অন্যকে কষ্ট না দিয়ে জীবন উপভোগ করে যাও’।

এর মধ্যে নারী-পুরুষের অবাধ সংসর্গও অন্তর্ভুক্ত। যৌবন এক পরাক্রান্ত শক্তি। জীবনের ষড়রিপু (ছয় শত্রু)– কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য– তার প্রথমটাই হলো কাম যা মানুষকে প্রবলভাবে তাড়িত করে।

পরস্পরের সম্মতি থাকলে সাবালক নরনারীর মিলন অবৈধ নয়, পশ্চিমা দেশগুলোর এ আইনের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে প্রজন্ম। ধর্মগুলো বিয়ের বাইরে দৈহিক সংসর্গের বিরোধী এবং পশ্চিমা প্রজন্মের অবাধ যৌনতায় বড় বাধা। কিন্তু এই আইনি অধিকার পশ্চিমা প্রজন্ম পেয়েছে সেটা তারা কিছুতেই ছাড়বে না। দরকার হলে ধর্মই ছেড়ে দেবে, এ প্রবণতাও রয়েছে। প্রজন্মের এই প্রবণতা আমাদের দেশগুলোতেও বাড়ছে।

২.

ধর্মই নৈতিকতার ভিত্তি, এ দাবিও অসার প্রমাণিত হয়েছে। কারণ ধর্মহীন বা ধর্মে উদাসীন অথচ প্রবলভাবে আধ্যাত্মিক, উদার ও মানবিক গুণাবলিতে আলোকিত মানুষের অজস্র উদাহরণ চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তারা কারও ক্ষতি করেন না ও বিপদে-আপদে সর্বশক্তি নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ান। হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রতিষ্ঠার নায়ক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র কিংবা আফ্রিকাতে প্রধানত মুসলিম সমাজে ইসলামের নামে ভয়ংকর বর্বর প্রথা নারীর খতনা উচ্ছেদে সর্বাত্মক চেষ্টাকারী রুডিজার, নেহবার্গ দুজনেই ধর্মহীন। দুর্ভাগ্যক্রমে, গির্জা, মন্দির ও মসজিদ-মাদ্রাসা ইত্যাদির অনেক ধর্মগুরুর ব্যক্তিগত হিংস্রতা, হানাহানি ও অশ্লীলতার খবরও প্রজন্ম জানতে পারছে। যেহেতু ধর্মগুরুদের ভাবমূর্তির ওপর ধর্মের ভাবমূর্তি অনেকটাই নির্ভর করে, তাই এটাও ধর্মের প্রতি প্রজন্মের বিতৃষ্ণার বড় কারণ।

৩.

'ম্যান ডাজ নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন'। জীবনের স্রোত প্রয়োজনের তাড়নায় প্রবাহিত হয়। খাদ্যের পাশাপাশি মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন আছে, যেখানে ধর্মবিশ্বাসের বিকল্প নেই। এই আধ্যাত্মিক প্রয়োজনটাই হারিয়েছে এ প্রজন্মের বিশাল অংশ। এখন তাদের প্রয়োজন প্রধানত পার্থিব, অর্থাৎ দুনিয়াদারির। তাদের চাই টেকনোলজির সর্বশেষ সংস্করণ, চাই পার্টি, নতুন মডেলের গাড়ি, বাড়ি, আরও ভালো চাকরি বা নিজের

ব্যবসা– তারা চায় দেশে দেশে ভ্রমণ করতে ইত্যাদি।

এসব প্রয়োজন ধর্ম মেটাতে পারছে না। কারণ ওটা ধর্মের কাজই নয়। ধর্মের কাজ হেদায়েত করা এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা। যার ধারও ধারছে না এ প্রজন্মের বিশাল অংশ। যা প্রয়োজন মেটাতে পারে না তা প্রাকৃতিক নিয়মেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে ও শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। প্রজন্মের বিশাল অংশ ধর্মের মাধুর্য কী জানে না, ধর্মের আবেদন তাদের কাছে নেই।

৪.

অভিজ্ঞতা কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না। প্রজন্ম সম্প্রতি দেখছে ধর্মের উৎস থেকে উঠে এসেছে ভয়াবহ গণহত্যা, গণধর্ষণ, ব্যাপক হিংস্রতা ও ধ্বংসযজ্ঞ। ইতিহাস ঘেঁটে তারা দেখেছে অন্য ধর্মের উৎস থেকেও অতীতে প্রবাহিত হয়েছে অগণিত নিরপরাধীর রক্ত ও অশ্রুস্রোত। হিংস্রতা, যুদ্ধ, রক্তক্ষয় অন্যান্য কারণেও হয় এবং তার ব্যাখ্যা সম্ভব। কিন্তু সেটা যখন স্রষ্টার নামে হয়, তখন তা ব্যাখ্যার অতীত হয়ে দাঁড়ায়। প্রজন্ম জানে না কোনো ধর্মই হিংস্রতা শেখায় না। জানে না যে ওগুলো ধর্মের অপব্যবহার মাত্র–কতিপয় শক্তিশালী ধর্মগুরুর হিংস্রতামাত্র। তাদের অপকর্মের দায় গিয়ে পড়ে ধর্মের ওপর।

এ ছাড়া আছে রূপকথা। ধর্মের মধ্যে অনেক অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব ও হাস্যকর রূপকথা ঢুকে পড়েছে। ইসলামের কথাই যদি বলি, কোরানে আছে ব্যভিচার বর্জন করার নির্দেশ, ব্যভিচারের শাস্তি আজীবন ঘরবন্দি অথবা আল্লাহ অন্য কোনো পথ নির্দেশ না করা পর্যন্ত, আছে ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে একশ করে চাবুক (সুরা বনি ইসরাইল ৩২, মুমতাহানা ১২, নিসা ১৫, নূর ২ ইত্যাদি)।

কিন্তু শারিয়া আইনে ব্যভিচারের শাস্তি বিবাহিতদের মৃত্যুদণ্ড ও অবিবাহিতদের চাবুক (হানাফি আইন হেদায়া পৃষ্ঠা ১৭৮, বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড, ধারা ১২৯, পাকিস্তানের হুদুদ আইন ৭-১৯৭৯, অর্ডিন্যান্স ২০-১৯৮০ দ্বারা পরিবর্তিত, আইন নম্বর ৫ (২)-এর 'অ'

ইত্যাদি)।

সূত্রগুলো মোটা দাগে দিলাম, বিস্তারিত আছে 'শারিয়া কী বলে, আমরা কী করি' বইতে। আসলে মৃত্যুদণ্ডটা এসেছে কোরানের একটা 'ছাগলে খাওয়া' আয়াত-সম্পর্কিত হাদিস থেকে। কারও দরকার হলে কিতাবের পৃষ্ঠাটার স্ক্যান কপি পাঠানো যাবে। সহি ইবনে মাজাহ ৩য় খণ্ড হাদিস ১৯৪৪, উদ্ধৃতি দিচ্ছি বাংলা করেঃ

"বর্ণিত আছে যে, বিবি আয়েশা (রা.) বলিয়াছেন, 'রজমের আয়াত নাজিল হইয়াছিল। অবশ্যই ইহা একটি কাগজের উপরে লিখা হইয়াছিল যাহা আমার কুশনের নিচে রাখা ছিল। রাসুল (রা.)-এর ইন্তেকালের পর আমরা যখন তাঁহার সৎকার করিতে ব্যস্ত ছিলাম তখন একটি গৃহপালিত ছাগল ঘরে ঢুকিয়া উহা খাইয়া ফেলে।"

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় মধ্যপ্রাচ্যের মওলানা ওয়াজে বলেছেনঃ "ছাগলটি বেহেশত হইতে আসিয়াছিল।"

মওলানার খেয়াল নেই, আল্লাহ বলেছেন তিনি এ কিতাব নাজিল করেছেন এবং তিনিই এটা সংরক্ষণ করবেন।

[সুরা হিজর ৯]

এখন আপনারাই বলুন, এসব উদ্ভট ব্যাখ্যা প্রজন্ম মানবে কেন? তাই এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, তাদের এক বড় অংশের কাছে ধর্ম একটা ভীতিকর, হাস্যকর ও বর্জনীয় কিছুতে পরিণত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে ধরা হয়েছে সব কিছু, ভয়াবহভাবে উপেক্ষিত হয়েছে সুরা ইমরান ৭–এই কেতাবের সুস্পষ্ট অংশটাই আসল অংশ, বাকিটুকু রূপক, অর্থাৎ প্রতীকমাত্র।

৫.

কিন্তু তাহলে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কী? ধর্মের প্রধান প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ হলো পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষ চিরকাল এবং এখনো ধর্মে বিশ্বাসী, ধর্ম ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। এটা খুবই সত্যি যেঃ

“ধর্মগুরুরা নীতিবাক্য প্রচার করিয়াছেন অজস্র। আর উহাতে কাজও হইয়াছে যথেষ্ট। অসংখ্য নরনারী অসৎকাজ ত্যাগ করিয়া সৎকাজে ব্রতী হইয়াছেন... মূলত পশুবৃত্তি বা স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করাইয়া মানুষকে সুসভ্য করিয়া গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে ধর্মগুরু বনাম ধর্মের দান অপরিসীম।”

আরজ আলী মাতুব্বর রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৩৮। সবশেষে তিনি বলেছেন,

“ধর্মীয় শিক্ষার ফলে আদিম মানবদের লাভ হইয়াছে যথেষ্ট এবং বর্তমান যুগেও উহার আবশ্যকতা ফুরায় নাই।”

৬.

প্রজন্মকে ধর্মে আকৃষ্ট করা ধর্মগুরুদেরই দায়িত্ব। যতদিন ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর অপব্যবহার করে স্রষ্টার নামে বৈধ করা হবে হিংস্রতা, অত্যাচার ও দুর্নীতি, যতদিন অর্থলোলুপ ধর্মদস্যুরা চালিয়ে যাবে ধর্ম ব্যবসা, যতদিন হুংকারী ধর্মগুরুদের শাস্তি না হবে, ততদিনই মানবজাতি ধীরে ধীরে ধর্ম থেকে সরে যাবে, ধর্ম পরিত্যাগ করবে। ধর্মবান্ধব, মানববান্ধব ধর্মগুরুরা কীভাবে এই পঙ্কিল দুর্নীতিপরায়ণ জগতে সেগুলো বন্ধ করবেন, সেটা তাঁদেরই দায়িত্ব, সেই ধর্মগুরুদের অপেক্ষায় আছে বিশ্বমানব। পশ্চিমা বিশ্বের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই।

তবে মুসলিম বিশ্বে ইসলামের নামে যেসব অনাচার-অত্যাচার আমরা দেখি তার অনেকটাই অবসান হবে যদি নেতারা হজরত ওমরের (রা.) শাসন খেয়াল করেন। চৌদ্দশ বছর আগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি যে বিস্ময়কর দূরদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন, তা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের নেতাদের আদর্শ হতে পারে। সেটার উপর লেখার চেষ্টা করব। আপাতত এ প্রাকৃতিক নিয়ম মানতে হচ্ছে যে, ”যা ঘটে সেটা ছাড়া আর কিছু ঘটতে পারত না বলেই সেটা ঘটে”। প্রজন্ম সম্ভবত মনে করছে:

রহিম যেটা দেখছে পানি করিম সেটা দেখছে কালি,
প্রশংসা যার করছে যদু, মধু তাকে দিচ্ছে গালি।
তুই যেটাকে লম্বা দেখিস, অন্যে সেটা দেখছে গোল,
এক অরূপের অজস্র রূপ বড্ড লাগায় গণ্ডগোল।
সবার চোখেই একেক রঙের চশমা, তা কেউ পাইনে টের,
সবাই একেক রঙের দেখি, একই মোক্ষ, এক রঙের।
দুই চশমায় মিললে মধুর 'স্লামালেকুম', 'সুপ্রভাত'।
না মিললেই 'ধর শালাকে', 'মার শালাকে'র সূত্রপাত।
আসল সত্য কোথায় থাকে, কে জানে তার হয় কী রূপ,
বিশ্বাসেরই সত্যে সবাই হয়তো খুশি, নয় বিরূপ।
মাতাল ভাবে, সে ঠিক আছে! দুনিয়াটাই খাচ্ছে টাল,
বিশ্বাসেরই 'সত্য' খেয়ে আমরা সবাই পাঁড় মাতাল!
এটাও রূপক অর্থে বলা হলো।

২৬ নভেম্বর ২০১৭

ধন্যবাদ, মহামান্য রাষ্ট্রপতি (‘বিশ্বকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রধারণা থেকে বের হতে হবে’).

দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭: রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বলেছেন, “বিশ্বকে অবশ্যই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ধর্মের অপব্যাখ্যা সম্পর্কে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে”।

অজস্র ধন্যবাদ, মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ। দেশব্যাপী ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলামি রাষ্ট্রধারণার ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের মধ্যে আপনার মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে যেখানে দেশে শারিয়া আইনের অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রধারণার পক্ষে জনসমর্থন বেড়ে চলেছে (পিউ ও রিজলভ সংগঠনের জরিপ)। যেহেতু চিন্তার সংঘাতই অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি, তাই এ ব্যাপারে জনগণকে দুপক্ষের যুক্তি ও ইতিহাসের শিক্ষায় শিক্ষিত করার সমূহ দরকার আছে।

এক ধর্মের ধর্মরাষ্ট্র বানাবার চেষ্টা করলে দুনিয়ার প্রতিটি ধর্মের আলাদা রাষ্ট্রকে বৈধ ও উৎসাহিত করা হয়। দুনিয়ায় অসংখ্য ধর্মের ধর্মীয় রাষ্ট্র হলে বিশ্ব মানবসমাজ ধর্মের ভিত্তিতে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ভ্রান্তিময় মানুষ যখন ঐশী ধর্মের মালিক হবার অপচেষ্টা করে তখন এসব হতে বাধ্য। ভারতে হিন্দুরা কিংবা ইসরাইলে ইহুদিরা কিংবা পশ্চিমে খ্রিস্টানরা ওদের ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে আমাদের ওপরে ওদের আইন চাপিয়ে দিলে আমাদের যে ভয়ানক অবস্থা হবে, তার জন্য দায়ী কে হবে? আমরা ওদের ওপরে আমাদের আইন চাপাব আর ওরা আমাদের ওপরে ওদেরটা চাপাতে পারবে না, এ দাবি-বা করি কী করে?

এসব কারণ ছাড়াও অসংখ্য মুসলিম এমনকি আলেম-উলামা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ইসলামি সংগঠন ‘নাহদালাতুল উলামা’ কেন ইসলামি রাষ্ট্রতত্ত্বের ঘোর বিরোধী তা দেশবাসীকে জানানো দরকার। তাদের প্রকাশিত ‘দ্য ইলিউশন অব অ্যান ইসলামিক স্টেট’ (ইসলামি রাষ্ট্রের বিভ্রম) বইটা ছড়ানো দরকার।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে প্রত্যেকের মানবাধিকার সুরক্ষিত এবং আইনের চোখে সবাই এক। অথচ ধর্মরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান "'হদ্দ'এর আওতাভুক্ত কোনো অপরাধ করিলে তাহার বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না"–বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খণ্ড আইন নং ৯১৪ গ এবং হানাফি আইন হেদায়া পৃষ্ঠা ১৮৮। 'হদ্দ আইন' হল ডাকাতি, চুরি, মদ্যপান, খুন-জখম, মানহানি, যৌন-ব্যভিচার ইত্যাদি। এটাও দেখুন, তওবা করলেই গণহত্যাকারীর শাস্তি হবে না– বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড ধারা ১৩।

এসব আইন দিয়ে কোনো রাষ্ট্র চলতে পারে? ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এ রকম ভয়াবহ আইন হয় না। ধর্মীয় রাষ্ট্র হাজার হাজার বছর সময় পেয়েছিল নিজেদের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার; এখনো পাচ্ছে কিছু দেশে। কিন্তু কিছু হাতেগোনা শাসকের সময় ছাড়া এর ইতিহাস ভারাক্রান্ত হয়ে আছে জনগণের দুর্ভোগে, মানবাধিকার লঙ্ঘনে, নারীর অশ্রু আর রক্তে। অতীতে ভারতের হিন্দুরাষ্ট্রের কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সূত্র ডক্টর সুকুমারী ভট্টাচার্যের 'প্রাচীন ভারত, সমাজ ও সাহিত্য'।

- জীবন্ত বিধবাকে মৃত স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়ে মারার আইন [অথর্ববেদ ১৮/৩/৩]
- পিতামাতার জন্য কন্যা অভিশাপ [ঐত্তরীয় ব্রাক্ষ্মণ ৬/৩/১৩]
- লাঠি দিয়ে স্ত্রীকে মেরে দুর্বল করা উচিত যাতে শরীরের ওপরে তার কোনো অধিকার না থাকে [শতপথ ব্রাক্ষ্মণ ৪/৪/২/১৩]
- সর্বগুণান্বিতা নারীও অধমতম পুরুষের চেয়ে অধম [তৈত্তরীয় সংহিতা ৬/৫/৮/২]
- পুত্রকন্যার সামনে স্বামী উপপত্নী আনা বা বেশ্যাগমন করতে পারবে কিন্তু স্ত্রীর সামান্য পদস্খলনে সমাজ কঠোর দণ্ড দেবে [মৈত্রায়নীর বিভিন্ন আইন ও তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬/৫/৮/২]
- কালো পাখি, শকুন, নেউল, ছুঁচো, কুকুর ও নারী হত্যার প্রায়শ্চিত্ত

একই [আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র ১/৯/২৩/৪৫]

- নারীকে অবরুদ্ধ রাখো, নাহলে তার শক্তিক্ষয় হবে -শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪/১/১/৩১।
- একটি যজ্ঞে 'সদ্যোজাত পুত্রকে ওপরে তুলে ধরা হয়, কন্যাকে মাটিতে শুইয়ে রাখা হয় [তৈত্তরীয় সংহিতা ৬/৫/১০/৩]
- উত্তম নারী হলো 'যে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় ও স্বামীর কথার ওপরে কথা বলে না' [ঐত্তরীয় ব্রাহ্মণ ৩/২৪/২৭]
- সন্তান না জন্মালে ১০ বছর পর ও পুত্র না জন্মালে ১২ বছর পর স্ত্রীকে ত্যাগ করা যাবে [আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র ১/১০-৫১-৫৩]
- যার স্ত্রীর চেয়ে পশুর সংখ্যা বেশি সে সৌভাগ্যবান [শতপথ ব্রাহ্মণ ২/৩/২/৮]।

ভয়াবহ ব্যাপার, কল্পনা করলেও গা শিউরে ওঠে! ইউরোপের গির্জারাষ্ট্রের অত্যাচারও ছিল এমন ভয়ংকর।

ডিকশনারিতে লেখা আছে ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থাৎ সেকুলারিজমের অর্থ হলো এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা যা ধর্মবিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে। এর কারণও আছে। হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মীয় রাষ্ট্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিতিবিরক্ত জনগণ ঘৃণা ও গণবিক্ষোভের দ্বারা ধর্মীয় রাষ্ট্র উৎখাত করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়েছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই বলা ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রে ধর্মের স্থান নেই। বাস্তবে এখন সেকুলারিজমের অর্থও বদলে গেছে আমূল। ঠিক যেমন 'মীরজাফর' শব্দটার অর্থ চমৎকার কিন্তু তা এখন এতই ঘৃণিত যে কোনো বাঙালি তার ছেলেরও নাম রাখেনি কোনো দিন, রাখবেও না। রাজাকার বা আল-বদর শব্দেরও ওই দশা। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলো এখন ধর্মের বিরোধী তো নয়ই বরং সাংবিধানিকভাবে সব ধর্ম রক্ষা ও সহায়তা করে।

আমাদের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ সরকার বানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেশন। বায়তুল মুকাররমের সমস্ত খরচ দেয় আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ

সরকার। ইউরোপ-আমেরিকা-কানাডা-অস্ট্রেলিয়ার ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলোর অজস্র টাকা ও সহায়তায় মুসলিম অভিবাসী, ইসলামি সংগঠন, মসজিদ-মাদ্রাসা, ওয়াজ-মহফিল, রেডিও-টিভি চ্যানেল, এমনকি শারিয়া-ব্যাংক, শারিয়া-মিউচুয়াল ফান্ড, শারিয়া-ইকুয়িটি ইত্যাদি গত কয়েক দশকে বিস্ফোরিত হয়েছে কয়েকশ গুণ। মধ্যপ্রাচ্যের কোটি কোটি দিনার-দিরহামকে কোনো ধর্মনিরপেক্ষ সরকার বাধা দেয়নি হাজার হাজার মসজিদ ও ইসলামি সংগঠন বানাতে। উদ্ধৃতি দিচ্ছি ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধী ইসলামি রাষ্ট্রপন্থী দৈনিক থেকে:

"জার্মানিতেই বর্তমানে আড়াই হাজারের ওপর মসজিদ রয়েছে। সে-দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন তাঁর সরকার জার্মানিতে আরও মসজিদ তৈরি করবে। একই ঘোষণায় তিনি এ-ও জানান, জার্মানির সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় জার্মান ভাষায় ইসলাম শিক্ষা দেওয়া হবে।... এ বোধোদয় ফরাসি প্রেসিডেন্ট সারাকোজির মধ্যেও এসেছে।... উদ্যোগ নিয়েছেন যাতে তিনি ফ্রান্সে ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে অর্থ সহায়তা দিতে পারেন। ব্রিটেন ইতোমধ্যে মুসলমানদের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য প্রদান করেছে।... ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'ইতালীয় ইসলামি সংহতকরণ' নামে ইতালিতে মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারের পক্ষ থেকে অনুদান চালু করেছেন। এভাবে ইউরোপের প্রায় সব দেশই রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে।"

[ইউরোপ ও ইসলাম, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৩ জুলাই, ২০০৮]

আমেরিকার ডলারে লেখা নেই 'ইন্ গড উই ট্রাস্ট'? আদালতগুলোতে বাদী-বিবাদীকে ধর্মীয় শপথ নিতে হয় না? সাংসদ ও রাষ্ট্রপ্রধানকে ধর্মীয় শপথ নিতে হয় না? কানাডায় সাংবিধানিকভাবে ক্যাথলিক স্কুলে প্রচুর সরকারি টাকা যায় না? সমস্ত ধর্মীয় স্কুলে সরকারি আর্থিক অনুদানের প্রস্তাব করেনি এক রাজনৈতিক দল? বিলেতের সরকার রাষ্ট্রীয় ট্রেজারি থেকে শারিয়া-বন্ড বাজারে ছাড়েনি? আমেরিকার ট্রেজারি ইসলামি ব্যাংকিংয়ের অনুমোদন দেয়নি? আমেরিকার সরকারি প্রতিষ্ঠান এআইজি

শারিয়া-ব্যাংকিং অনুমোদন দেয়নি?

লন্ডনের বিশাল মসজিদের জন্য দশ কোটি পাউন্ড সরকারি অনুদানের প্রস্তাব ছিল না? জার্মানির কোলনে বৈধভাবে সুবিশাল মসজিদ নির্মিত হচ্ছে না? বিলেত ও জার্মানি তাদের আইনে মুসলিম নাগরিকদের জন্য বহুবিবাহের কিছু উপাদান গ্রহণ করেনি? লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিল আটত্রিশ হাজার পাউন্ড অনুদান দেয়নি কর্ডোভা ফাউন্ডেশনকে? সরকারগুলো পুলিশ দিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর তত্ত্বাবধান করে না? করে।

বেলজিয়ামের ব্রাসেলস শহরে সরকার শারিয়ার বিরুদ্ধে মিছিল নিষিদ্ধ করেনি? এক টরন্টো শহরেই রেজিস্টার্ড ইসলামি সংগঠন একশ একুশটা! অনানুষ্ঠানিক আরও কয়েকশ। ইংল্যান্ডে-জার্মানিতে-ফ্রান্সে প্রায় সাত হাজার বৈধ ইসলামি সংগঠন আছে। ধর্মীয় উপাসনালয়গুলো সাধারণত বিশাল জমির ওপরে বিরাট দালান হয়। অনেক দেশে সাংবিধানিকভাবে সেগুলোর সম্পত্তি-কর ও পানি-বিজলির কর মওকুফ করা হয় যার পরিমাণ বিপুল।

প্রশ্ন হলো, সরকারগুলোর কি ক্ষমতা নেই এগুলোর প্রত্যেকটি বন্ধ করার? আছে, তবে করে না। বরং টরন্টোতে দেখি, স্কুল বোর্ডে প্রতি অক্টোবর মাসে সরকারি খরচে ‘ইসলামিক ঐতিহ্য মাস’ পালিত হয়।

ওপরের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব ইতিবাচক, অর্থাৎ হ্যাঁ। এরই নাম ধর্মনিরপেক্ষ সরকার। কাজেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে ধর্মহীন বা ধর্মবিরুদ্ধ বলাটা প্রতারণামূলক অকৃতজ্ঞতা। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি অবশ্যই আছে। যেমন এর ভেতর থেকেই বুশ-ব্লেয়ারের মতো গণহত্যাকারী দানব উঠে এসেছে। কিংবা দুর্নীতি, অস্ত্র ও পেশিশক্তির কারণে অনেক দেশে জনগণ ইচ্ছেমতো ভোট দিতে পারে না ইত্যাদি। কিন্তু বহু দেশে এটা অত্যন্ত সফলও। সময়ের বিবর্তনে জনগণের শিক্ষা-সচেতনতায় ত্রুটিগুলো কেটে যাবে আশা করা যায়।

কিন্তু ‘নিরপেক্ষতা’ শব্দের অর্থ ‘হীনতা’ হলে বলতে হয়, বিবেকহীন

লোক আসলে বিবেক-নিরপেক্ষ লোক, প্রাণহীন দেহ আসলে প্রাণনিরপেক্ষ এবং বৃষ্টিহীন মরু আসলে বৃষ্টিনিরপেক্ষ মরুভূমি। দাবিটা ভিত্তিহীন, তা ব্যাখ্যার দরকার হয় না। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রধান কাজই হলো অন্য ধর্মের লোকদের চেয়ে নিজ ধর্মের অনুসারীদের বেশি অধিকার ও সুবিধা দেওয়া। না হলে সেটা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রই হয় না। ফিলিস্তিনিরা কি ইসরাইলে সমান অধিকার পেতে পারে? পারে না। আমাদের জীবনকালেই ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা ধর্মের নামে দুটো দেশ বানিয়েছিল– ইসরায়েল ও পাকিস্তান। দুটোই এখন সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। ভারতে হিন্দু রাষ্ট্রবাদীরা মুসলিমদের ওপর কী তাণ্ডব চালাচ্ছে, তা তো আমরা দেখছি।

ইসলামের রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ব্যাখ্যার যে দ্বন্দ্ব সে জটিলতায় আমার পাঠকদের আমি এখনই টেনে নেব না যদিও সেটাও দরকার হবে ভবিষ্যতে। আপাতত বিশ্বমুসলিমের ওপরে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যার ফলাফল দেখা যাক কারণ যতই মিষ্টিমধুর বাগাড়ম্বর করা হোক না কেন বৃক্ষের আসল পরিচয় তার ফলেই।

ইতিহাসের শিক্ষা কী? ইসলামি ইতিহাসের যে কোনো ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলে কিংবা ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে মুসলিম ইতিহাস মুসলিমের হাতে মুসলিমের ওপরে গণহত্যা, হত্যা, বিদ্রোহ, পাল্টা বিদ্রোহ, রক্তক্ষয় ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। "খলিফা" নামধারী গণহত্যাকারীদের হাতে ইসলাম পড়লে কি সর্বনাশ হয়, ইমাম গাজ্জালী থেকে তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন মওলানা মওদুদী:

"বাদশাহদের প্রায় সব জমিজমা ও প্রাসাদ (রিয়েল এস্টেট) অবৈধভাবে অর্জিত। কাহারো উচিত নহে এসব সুলতানকে মুখ দেখানো বা তাহাদের মুখ দেখা। তাহাদের অত্যাচারের জন্য তাহাদিগকে ঘৃণা করা উচিত, তাহাদের অস্তিত্বকেই নিন্দা করা উচিত, তাহাদের প্রশংসা করা উচিত নহে...তাহাদের রাজপ্রাসাদ ও সাজ-পোশাককে নোংরা ও অনৈসলামিক ঘোষণা করা উচিত"... তিনি সকল মন্ত্রীদিগকে চিঠিতে লেখেন যে,–"স্বৈরতন্ত্রের অত্যাচার সকল সীমা অতিক্রম করিয়াছে। আমি এই

স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছি যাহাতে স্বৈরতন্ত্রের এই নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ কর্মকাণ্ড আমাকে দেখিতে না হয়।"

[এ শর্ট হিস্ট্রি অব্ দ্য রিভাইভালিস্ট মুভমেন্ট ইন্ ইসলাম– পৃষ্ঠা ৬২-৬৩]

ইমাম গাজ্জালীর ইসলামি ব্যাখ্যার সাথে অনেকের দ্বিমত থাকতেই পারে এবং ছিলও। কিন্তু খলিফাদের অত্যাচারে তাঁর হৃদয়ের বেদনা এতে ফুটে উঠেছে। বস্তুত প্রায় প্রতিটি ইমামই এই কষ্ট নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন যে, ইসলামের নামে ভয়াবহ শাসন চলেছে। নেতাদের প্রতি আহ্বান রইল তাঁরা যেন কোনো কিছু না লুকিয়ে জাতিকে প্রকৃত ইতিহাস শেখান। এটা আমাদেরই ইতিহাস, এর মুখোমুখি না হয়ে উপায় নেই আমাদের।

মুসলিম সভ্যতার যা বিপুল অর্জন তা সেই কৌতূহলী, মানবদরদি এবং মেধাবী বৈজ্ঞানিকদের উপহার এখনো দুনিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা স্মরণ করেন কৃতজ্ঞতার সাথে। হাতেগোনা দু-একজন জ্ঞানপিপাসু খলিফা ছাড়া এর সাথে মুসলিম খেলাফতের যোগ সামান্যই। ইউরোপের বিখ্যাত শারিয়া-সমর্থক বিশেষজ্ঞ বিলাল ফিলিপের বই 'দি এভল্যুশন অব্ ফিক্হ্'-এর ১০৭ ও ১৩৯ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষেপে উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"এইভাবে ইসলাম ধর্মটি চার মজহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। কেহ এই মজহাবের কোনোটিকেও না মানিলে তাহাকে ইসলাম-ত্যাগী ধরা হইত। এই অতিরিক্ত রক্ষণ-প্রবণতা এতদূর গিয়াছিল যে কোনো এক মজহাব ছাড়িয়া অন্য মজহাবের অনুসারী হইলে তাহার শাস্তি হইতে পারিত। হানাফি মজহাবে শাফি- অনুসারীদের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া আইনও করা হইয়াছিল।"

তথাকথিত 'ইসলামি' রাষ্ট্রের এই অনাচার থেকে রেহাই পায়নি কাবা শরিফও। খেলাফতের দ্বন্দ্বে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সৈন্যেরা মক্কা আক্রমণ করে ভেঙে দিয়েছিল কাবার শরিফের দেয়াল, আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল তার চাদরে। এই হলো তথাকথিত "ইসলামি রাষ্ট্র"-এর তাণ্ডব, অস্বীকার করতে পারবেন তথাকথিত "ইসলামি রাষ্ট্র"-এর প্রবক্তারা?

আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ইসলামি বিশেষজ্ঞ ড. বিলাল ফিলিপ বলছেন,

"এক মজহাবের অনুসারীরা অন্য মজহাবের ইমামের পেছনে নামাজ পর্যন্ত পড়িত না। এজন্য মসজিদের ভিতরে নামাজ পড়ার আলাদা জায়গা করা হইয়াছিল। কাবা ঘর পর্যন্ত বাদ যায় নাই। প্রত্যেক মজহাবের ইমামের জন্য কাবার চারিপাশে পৃথক চারটি মঞ্চ বানানো হইয়াছিল। আশ্চর্য যে, কাবা'র চারিপাশে এই পৃথক নামাজের জায়গা বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষত ছিল। বাদশাহ আবদুল আজিজ ইবনে সৌদি (সৌদি আরব ও সৌদি বাদশাহীর প্রতিষ্ঠাতা) ১৯২৪ সালের অক্টোবরে মক্কা বিজয় করিয়া মজহাব নির্বিশেষে একই ইমামের পিছনে নামাজে সব মুসলিমকে একত্রিত করেন।"

এই হলো অবস্থা। যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম আবু হানিফাকে, ইমাম তাইমিয়াকে জেলখানার ভেতরে হত্যা করেছিল "ইসলামি রাষ্ট্রের" খলিফারাই। ইমাম শাফি, ইমাম মালিক, ইমাম হানবলের ওপরে মর্মান্তিক অত্যাচার করেছিল "ইসলামি রাষ্ট্রের" খলিফারাই। ইমাম মালিকের সমর্থকেরা ইমাম শাফি'কে এত মর্মান্তিকভাবে প্রহার করেছিল যে তাতেই তিনি কয়েক দিন পরে মৃত্যুবরণ করেন। চার ইমামের ওপরে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কেতাবের একটা "দ্য ফোর ইমামস"– আবু যাহরা, পৃ. ২৭৩। এ-বইটা দুনিয়ার সর্বোচ্চ গবেষকেরা সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেন, যেমন ইখওয়ানুল মুসলেমিনের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্নার নাতি ড. তারিক রামাদান। এই খেলাফত ফিরে পেতে চাই আমরা? কখনোই নয়!

শারিয়া অতীতে ন্যায়ভিত্তিক বিচার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল এ কথাও ঠিক নয়। আইনগুলো পড়ে দেখুন, ও-আইনে ন্যায় বিচার হওয়া সম্ভব নয়। অসংখ্য আইন ও মামলার উদ্ধৃতি দিয়ে ড. আমিরা আজহারি তাঁর 'উইমেন, দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড ডিভোর্স ল'জ ইন ইসলামিক হিস্ট্রি' বইতে দেখিয়েছেন অতীতেও শারিয়া-রাষ্ট্রে মুসলিম নারীর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। এমনকি তাঁদের ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দেবার জন্য শারিয়া কোর্ট নতুন এক কোরান-বিরোধী ফর্ম বানায় যাতে নারীরা বাধ্য হয়ে সই করত। উদাহরণ দিচ্ছি–

"...তালাকের পর মোহর আদায় করা স্ত্রীদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ছিল...সতেরো ও আঠারো শতাব্দীতে প্রচুর খুলা হইত। খুলা পদ্ধতিতে স্ত্রীকে যে কোন প্রাপ্য, এমনকি স্ত্রীর নিজের ও সন্তানদের ভরণপোষণও পরিত্যাগ করিতে হইত। এই জন্য খুলার দলিলে এক অতিরিক্ত কাগজ সংযোজিত করা হয়। উহাতে সন্তানদের নাম, পিতার নাম ও সন্তানদের খরচের ব্যাপারে (স্বামীর দায়িত্ব নাই, এই ব্যাপারে–লেখক) স্ত্রীর স্বীকৃতির কথা লেখা থাকে। ভিদিন অঞ্চলের হাওয়া খাতুন ১৭৮৩ সালে স্বামীকে খুলা-তালাক দেয়। তাহাকে মোহরের ৪০০০ অ্যাক্সেসের (তৎকালীন তুর্কি টাকা) অপরিশোধিত ১০০০ অ্যাক্সেস এবং ভরণপোষণের অর্থ পরিত্যাগ করিতে হয়...। জুলাই ১৮০২–ইস্তাম্বুলের হালিমা খাতুন আসিয়া দাবি করিল যে মোহর পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহার স্বামী আহমেদ তাহাকে খুলার জন্য চাপ দিতেছে...। দুর্নীতিপরায়ণ কাজিরা ষড়যন্ত্র করিত ও ঘুষ খাইত"–(পৃ. ৮৯, ৯২, ১০০, ১০৪, ইত্যাদি)।

ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পাদ্রি-রাবাইরাও বানায়নি, গীর্জাতেও বানানো হয়নি। ওগুলো সংসদে বসে বানিয়েছেন সমাজবিজ্ঞানীরা যাঁরা আধুনিক বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত, বাইবেল-এ নয়। সমাজ-বিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে সংবিধানকে পরিবর্তন করছেন জনগণের নির্বাচিত সাংসদেরাই, গির্জার পাদ্রি-রাবাইরা নন। ঠিক যেমন বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে বহু কষ্টের গবেষণায় বানিয়েছেন বহু ওষুধ, যা আমাদের প্রাণ রক্ষা করে বা দালান-ব্রিজ-কারখানা ও শিল্পায়নের প্রযুক্তি দেয়।

তাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি "ইহুদি-খ্রিষ্টানদের শয়তানি ষড়যন্ত্র" ও "কুফরি আকিদা" হয় তবে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আবিষ্কৃত টুথব্রাশ চিরুনি থেকে শুরু করে বক্তৃতার মাইক, বাস, ট্রাক, কাপড়, হিটার, এয়ারকন্ডিশনার, জুতো, মাথাব্যথার ট্যাবলেট, বুড়ো বাবা-মা'র ইনসুলিন, কম্পিউটার, রেডিও, টিভি, গাড়ি, হাসপাতালের যন্ত্রপাতি, হাজারো ওষুধ সবই "ইহুদি-খ্রিষ্টানদের শয়তানি ষড়যন্ত্র" এবং "কুফরি আকিদা" হতে হয়।

শরিয়াপন্থীরা দাবি করেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে ধর্মহীনতা। যেখানে মানুষের জীবন ঘিরে আছে হাজারো ধর্মনিরপেক্ষ উপাদান সেখানে রাষ্ট্রপরিচালনায় ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা দাবি করলে মিথ্যাকে জায়েজ করা হয়। এই মিথ্যার সাথে যোগ হয়েছে আল্লাহ-রাসুলের নামে ভয়াবহ তথাকথিত "ইসলামি" রাষ্ট্রের আইন:

"যদি উদ্দেশ্যটি বাধ্যতামূলক হয় তবে মিথ্যা বলা বাধ্যতামুলক" শাফি আইন নং আর.৮.২। অর্থাৎ যিনি ধর্মীয় রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলক মনে করেন তার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা, এই মিথ্যা বলাও বাধ্যতামূলক। তাই এ-উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র, জঙ্গিতন্ত্র, বিদেশ থেকে গোপন অর্থ-সমাগম, গোপন অস্ত্রশিক্ষা, গোপন জঙ্গি সাহিত্য ইত্যাদির ব্যাপারেও মিথ্যা বলা বাধ্যতামূলক। কি ধরনের ইসলাম এটা? ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ও রকম ইসলামবিরোধী আইন হয় না, সেখানে হয় "তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না... মিথ্যা বলা থেকে দূরে থাকো ... সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না"–বাকারা ২৮৩ ও ৪২, মায়েদা ১০৬, ইমরান ১৬১, সুরা হজ ৩০ ইত্যাদি।

সে নির্দেশ লঙ্ঘন করলে কি হবে ? "তাদের মিথ্যাচারের দরুন তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আজাব"– বাকারা ১০।

কাজেই, "বিশ্বকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রধারণা থেকে বের হতে হবে", হবেই! সেই সাথে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথাও মনে রাখতে হবে। দেশ ধর্ষকের স্বর্গরাজ্য হবে, ব্যাংক লোপাট হবে, দুর্বৃত্তদের দাপটে ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে জনগণের নাভিশ্বাস উঠবে, সরকারি ক্যাডার ও রাজনীতিবিদেরা নির্লজ্জভাবে ক্রমাগত দখল করবেন সরকারি সম্পত্তি, নদী, খাল আর হিন্দুদের সম্পত্তি, সংসদে গালাগালি হবে, সরকারের প্রতিটি বিভাগ দুর্নীতিতে ছেয়ে যাবে অথচ জনগণ বীতশ্রদ্ধ মরিয়া হয়ে বিকল্প খুঁজবে না তা হয় না।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, বিশেষ করে সে বিকল্প যদি "আল্লাহ'র আইন", "শারিয়া আইন", "ইসলামি রাষ্ট্র" ও "আল্লাহর হুকুম" বলে প্রচার করা হয় তবে তা আমাদের গ্রামগঞ্জের কোটি কোটি জনগণের মধ্যে প্রবল

আকর্ষণ সৃষ্টি করছে ও করবে। অনতিবিলম্বে ইসলামি ধর্মতাত্ত্বিক দিক দিয়েই এটা রোধ করা দরকার, ইসলামি রাষ্ট্রের বিভ্রম থেকে জাতিকে মুক্ত করা দরকার ।

২১ *অক্টোবর*, ২০১৭

ধর্ষণ বন্ধে শারিয়া আইন?

২৯ মে, ২০১৭

বাংলাদেশ এখন ধর্ষকের অভয়ারণ্য! ক্রমাগত বিচারহীনতা ও শাস্তিহীনতাই এর জন্য দায়ী। মারাত্মকভাবে অরক্ষিত হয়ে পড়েছেন আমাদের মা-বোনেরা। একশ্রেণির অর্থলোভী পুলিশ ও শক্তিশালী ধর্ষকদের দাপটে অস্থির হয়ে উঠেছে দেশ। ধর্ষকের বিচার না পেয়ে ধর্ষিতার বাবা মেয়েকে নিয়ে ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন। সরকারের এই ব্যর্থতা ক্ষমাহীন। বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে নারী ও সুশীল সমাজ, তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে জাতি। এই ফাঁকে আবারও উঠে এসেছে সেই পুরোনো দাবি:

"একবার আল্লাহর আইন শরিয়া প্রয়োগ করে দেখুন, দেশ থেকে ধর্ষণ উঠে যাবে।"

তা-ই? হতেও পারে! 'আল্লাহর আইন' বলে কথা! তাহলে দলিলপত্র একটু ঘেঁটেই দেখা যাক–

ক্রুদ্ধ নিরুপায় জাতি শারিয়ার পথ নিলে দোষ দেওয়ার কিছু নেই। সেজন্য এ ব্যাপারে জাতিকে শিক্ষিত করা দরকার। যারা ওই চিন্তা করছেন তারা ধর্ষণ সম্পর্কিত শরিয়া আইনগুলো পড়ে দেখেছেন মনে হয় না! মিলিয়ে দেখার সুবিধার জন্য আমি বিশেষ করে বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত 'বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন' ও মওলানা মুহিউদ্দীন খানের অনূদিত কোরান থেকে দেখাচ্ছি। দরকার হলে শরিয়া কিতাবের পৃষ্ঠার ফটোকপি দেওয়া যেতে পারে।

- "বলপ্রয়োগকারী জেনার শাস্তি ভোগ করিবে যদি বলপ্রয়োগ প্রমাণিত হয়।"

– 'বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন', ১ম খণ্ড, ধারা ১৩৪খ।

চমৎকার আইন, ন্যায্যও বটে। কিন্তু গেঁড়ো বেঁধে যায় "বলপ্রয়োগ প্রমাণিত হয়" এখানে এসে। কারণ, শরিয়া আইনে ধর্ষণের প্রমাণ হলো চারজন পুরুষ মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষী, সেখানে নারী সাক্ষী বা ডিএনএ পরীক্ষা গ্রহণযোগ্য নয়। সেজন্যই ১৫-২০ বছর আগে লাহোর হাইকোর্ট এক পরকীয়া মামলার রায়ে বলেছে, শরিয়ার "বিশেষ" অনুষঙ্গ আছে যেখানে ডিএনএ পরীক্ষা গ্রহণযোগ্য নয়।

কোরানে জেনার উল্লেখ ও শাস্তি রয়েছে কিন্তু আলাদা করে ধর্ষণের উল্লেখ নেই। এদিকে শরিয়া আইনে ধর্ষণকে ধরা হয়েছে জেনার আওতায়। উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"কোনো পুরুষ বা নারী বলপ্রয়োগ করিয়া পর্যায়ক্রমে কোনো নারী বা পুরুষের সহিত সঙ্গম করিলে তাহা জেনা হিসেবে গণ্য হইবে।"

– 'বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন', ১ম খণ্ড, ধারা ১৩৪।

অর্থাৎ ধর্ষণের ও জেনার প্রমাণ একই। সেজন্যই আইন বানানো হয়েছে:

"বলপ্রয়োগকারী জেনার শাস্তি ভোগ করিবে যদি বলপ্রয়োগ প্রমাণিত হয়।"

এখন তাহলে দেখা যাক শরিয়া আইনে জেনার প্রমাণ কী। বলা দরকার, শরিয়া আইনে হুদুদ মামলায় পারিপার্শ্বিক বা পরোক্ষ প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়। উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"হুদুদ মামলায় পারিপার্শ্বিক প্রমাণ চলিবে না।" (চাক্ষুষ সাক্ষী থাকতে হবে)

– 'বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন', ২য় খণ্ড, ধারা ৬০০।

- চুরি-ডাকাতি-মদ্যপান-খুন-জখম-মানহানি-জেনা (এগুলো হুদুদ মামলা) প্রমাণ চারজন পুরুষ সাক্ষী, নারী সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

– 'বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন', ১ম খণ্ড ধারা ১৩৩; শফি আইন ০.১৩.১, ০.২৪.৯; মুহিউদ্দীন খানের অনূদিত বাংলা কোরান–পৃষ্ঠা ২৩৯

আর ৯২৮; 'দ্য পেনাল ল অব ইসলাম', পৃষ্ঠা ৪৪; হানাফি আইন হেদায়া, পৃষ্ঠা ৩৫৩; শফি আইন o.24.9; 'ক্রিমিন্যাল ল ইন ইসলাম অ্যান্ড দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড', পৃষ্ঠা ২৫১।

এ আইন ইসলামবিরোধী এটা শরিয়াবিদরাও বোঝেন। তাই আইনটাকে একটু মেরামত করার চেষ্টা হয়েছে। যেমনঃ ১১ শতাব্দীতে স্পেনের ইমাম ইবনে হাজম প্রস্তাব করেছিলেন, জেনা প্রমাণের ক্ষেত্রে চারজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান পুরুষ সাক্ষী অথবা প্রতিজন পুরুষের পরিবর্তে দুজন মুসলিম ন্যায়পরায়ণ মহিলা হলেও চলবে–'বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন', ৩য় খণ্ড, ৮৮৮ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ সাতজন মেয়ের সামনে যদি জেনা বা ধর্ষণ হয় তবে অপরাধীরা সবার সামনে অট্টহাসি হাসতে হাসতে পগারপার হয়ে যাবে। আর "ন্যায়পরায়ণ মহিলা" কাহাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী, তা নিয়ে উকিলের তর্কবিতর্কের শেষ হবে না। তাছাড়া ইমাম হাজমের প্রস্তাবটা কেউ পাত্তা দেয়নি, 'হানাফি'-'শফি'-'পেনাল ল অব ইসলাম'-'ক্রিমিন্যাল ল ইন ইসলাম অ্যান্ড দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড' ইত্যাদি কিতাবে নারী সাক্ষী নিষিদ্ধই রয়ে গেছে। এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন–

- "পরকীয়া এবং ধর্ষণের প্রমাণ অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি অথবা চারজন বয়স্ক পুরুষ মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্য।"–পাকিস্তানের হুদুদ আইন, নং ৭-১৯৭৯, সংশোধনী ২০, ৮ এর খ–১৯৮০। বলা দরকার, পাকিস্তানের আইন বানানো হয়েছে হানাফি আইন অনুসারে। হানাফি আইনে (হেদায়া পৃষ্ঠা ১৭৬) চারজন পুরুষ মুসলিমের চাক্ষুষ সাক্ষ্যের প্রয়োজন নরনারীর পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যভিচারের (Whoredom) ক্ষেত্রে। সেটাকে পাকিস্তানের আইনে প্রয়োগ করা হয়েছে ধর্ষণের ক্ষেত্রেও।

২০০৬ সালে সংসদে এ আইন বাতিলের প্রস্তাব উঠলে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী ক্ষিপ্ত হয়ে সংসদ থেকে পদত্যাগ ও আন্দোলনের হুমকি দিয়ে বলেছেঃ

"শরিয়া মোতাবেক এই আইনই সঠিক, এর কোনোরকম পরিবর্তন কোরান ও শরিয়ার খেলাফ। এ পরিবর্তন দেশকে অবাধ যৌনতার স্বর্গ বানাবে।" এই হলো জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বের বিবেক ও বোধ।

- "হুদুদ মামলায় নারী বিচারক অবৈধ।"

– 'বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন', ২য় খণ্ড, ধারা ৫৫৪।

- "জেনা ও ধর্ষণ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ না হইলে জেনাকারীর শাস্তি হইবে না যদি সে অস্বীকার করে।"

– 'বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন', প্রথম খণ্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা।

- "কোনো কারণে শাস্তি মওকুফ হইলে ধর্ষক ধর্ষিতাকে মোহরের সমান টাকা দিবে।"

– 'বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন', ১ম খণ্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা, শফি আইন এম ৮-এর ১০।

- "চাক্ষুষ সাক্ষ্য না থাকলে শুধু আলামতের ভিত্তিতে খুনি-ডাকাতের শাস্তি হবে না।"

– 'বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন', ধারা ৬০০-এর বিশ্লেষণ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯২।

কী হবে যদি কোনো বোবা পুরুষ বা গায়িকা কিংবা সমাজের নিচু ব্যক্তির সামনে ধর্ষণ হয়? সে ব্যাপারেও শরিয়া আইন খুবই পরিষ্কার। উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

- "বোবার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।"–'বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন', ১ম খণ্ড, ধারা ১৪৯।

- "দাস-দাসী, গায়িকা এবং সমাজের নিচু ব্যক্তির (রাস্তা পরিষ্কারকারী বা শৌচাগারের প্রহরী ইত্যাদি) সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।"

– ‘বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন’, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৩; হানাফি আইন পৃষ্ঠা ৩৬১; শফি আইন o.24.3; ‘পেনাল ল অব ইসলাম’, পৃষ্ঠা ৪৬।

অর্থাৎ আমরা পেলাম এসব মামলায় নারীর বিচারক নিষিদ্ধ এবং নারী, গায়িকা, বোবা (পুরুষ হলেও), ও সমাজের নিচু ব্যক্তির (পুরুষ হলেও) চোখের সামনে পরকীয়া বা ধর্ষণ হলে তথাকথিত “আল্লাহর আইনে” তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আমি জানি এসব “আল্লাহর আইন” অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। সুযোগ থাকলে এখানে পৃষ্ঠাগুলো পেস্ট করে দিতাম। আবারও অনুরোধ করছি শরিয়া আইন সমর্থন করার আগে আইনগুলো নিজে দেখে নেবেন।

এবারে বাস্তবে মুসলিম নারীর ওপরে এই আইনের প্রভাব দেখি চলুন। ধর্ষিতা আদালতে ধর্ষণের চারজন পুরুষ মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষী বা আটজন নারী সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবেন, এটা কি সম্ভব? এই অবাস্তব আইন মুসলিম নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস নয়? এমন অবস্থায় হতভাগিনী ধর্ষিতা আরেকটা হুদুদ শরিয়া আইনে অপরাধী হয়ে পড়ে, সেটা হলো মানহানির মামলা। অর্থাৎ চারজন পুরুষ মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষী আনতে পারেননি বলে ধর্ষণ প্রমাণ হয়নি, তাই ধর্ষণের অভিযোগ করে ধর্ষিতা ধর্ষকের সম্মানহানি করেছেন। তাই ধর্ষিতাকে শাস্তি পেতে হয়।

কল্পনা নয়, এটা বহুবার ঘটেছে, হাজার হাজার ধর্ষিতা শরিয়া কোর্টে ন্যায়বিচার চেয়ে শাস্তি পেয়েছে। ওই হতভাগিনীদের জায়গায় নিজের মা বা বোন বা কন্যাকে ভেবে দেখুন ইসলামের নামে ধর্ষিতারা কী দোজখে জ্বলছে!

- সবচেয়ে মর্মান্তিক শাস্তি পেয়েছে ১৩ বছরের গণধর্ষিতা অভাগিনী আয়েশা দুহুলো। ওকে আমি শরিয়ার ওপরে বানানো আমার ‘নারী’ মুভিটা উৎসর্গ করেছি। সোমালিয়ার ১৩ বছরের ওই বাচ্চাটাকে কয়েকজন পুরুষ ধর্ষণ করেছিল, ওর বাবা সুবিচারের আশায় মেয়েকে শারিয়া কোর্টে নিয়ে গিয়েছিলেন। শারিয়া কোর্ট আয়েশাকে পাথরের আঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং সেটা কার্যকর হয় ২৭ অক্টোবর

২০০৮ সালে, সোমালিয়ায়। জাতিসংঘের তখনকার সেক্রেটারি জেনারেল বান কি মুন তীব্রভাবে এর নিন্দা করেছিলেন।

- নাইজেরিয়ায় ১২ বছরের ধর্ষিতা বরিরা শাস্তি পেয়েছে।
- বাংলাদেশেও অবৈধ ফতোয়ার আদালতে এ ঘটনা ঘটেছে কয়েকবার।
- এই আইনের পাল্লায় পড়ে পাকিস্তানে হাজারো মা-বোন ১০-১৫ বছর ধরে জেলখানায় বন্দি ছিলেন। কারণ তাঁরা ধর্ষণের চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী আদালতে হাজির করতে পারেননি। পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর প্রবল প্রতিরোধের জন্য সংসদে আপ্রাণ চেষ্টার পরেও ১৯৭৯ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত এ আইন বাতিল করা যায়নি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে পরের দিকে ধর্ষিতারা থানায় অভিযোগ করতেন না, কারণ সেখানে পুলিশেরা তাদের বন্দি করে আবার গণধর্ষণ করত। দীর্ঘ ২৬ বছরে এ আইনে বলি হয়েছেন হাজার হাজার ধর্ষিতা।
- কল্যাণপুরে মাকে বেঁধে কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে। ধর্ষণের একমাত্র সাক্ষী হলো মেয়ের মা, ধর্ষক হলো স্থানীয় তিন ব্যক্তি।

('দ্য ডেইলি স্টার', ৭ জুলাই ২০০৩)। এই মামলা যদি শারিয়া কোর্টে ওঠে তবে শারিয়ার আইন অনুযায়ী এক নারীর সাক্ষ্যে ধর্ষকদের শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ রাসুল (সা.) শুধু নারীর একক সাক্ষ্যে ডাকাতের (জেনার মতো ডাকাতিও হুদুদ মামলার অন্তর্ভুক্ত) মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন এবং তা কার্যকরও করেছেন–'সহি বুখারি', ৭ম খণ্ড হাদিস ২১৬হ; 'সহি ইবনে মাজাহ', ৪র্থ খণ্ড হাদিস ২৬৬৬; 'সহি তিরমিজি', ১৩৯৯।

রাসুল (সা.)-এর সে নির্দেশ পায়ে দলেছে কেন শারিয়া আইন?

এসব ইসলামবিরোধী আইন প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ওই আল্লাহ-রাসুলের (সা.) নামেই। এ জন্যই বুঝি নবীজি (সা.) উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছেন: "আমার

অনুসারীদের জন্য আমার সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা পথভ্রষ্টকারী ইমামগণ নিয়ে।”–‘সহি ইবনে মাজাহ’, ৫ম খণ্ড, হাদিস ৩৯৫২। এসব কারণে কোটি কোটি মুসলিম এবং বহু ইসলামি বিশেষজ্ঞ শরিয়া আইনের কঠিন বিরোধিতা করেন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শরিয়া সমর্থক ও বিশেষজ্ঞ ড. হাশিম কামালি ব্যাকুল হয়ে বলেছেন:

“শরিয়াকে এ যুগে চালাইতে হইলে অবশ্যই যে প্রচণ্ড ঘষামাজা করিতে হইবে সে ব্যাপারে আমি সবাইকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি... সেই যুগে যে উদ্দেশ্যে শরিয়ার উশুল বানানো হইয়াছিল অনেক কারণেই এখন উহা সেই উদ্দেশ্য অর্জন করিতে সক্ষম নহে... শরিয়ার উশুল নিজের পদ্ধতি ও তত্ত্বের ভেতর সমাজের স্থান-কালের ব্যাপার ঠিকমতো অন্তর্ভুক্ত করে নাই।”–‘প্রিন্সিপালস অব ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স’, ড. হাশিম কামালি, পৃষ্ঠা ১৩, ৫০০, ৫০৪।

আরও বলতে হবে? যারা শারিয়া আইনকে সমর্থন করেন তাদের অনুরোধ করি, আইনগুলো একটু পড়ে দেখবেন। ইসলামে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোনো দালালের জায়গা নেই। রোজ হাশরে আপনার জবাব শুধু আপনাকেই দিতে হবে।

‘নেত্রীত্ব’ বনাম ‘নেতৃত্ব’

হেফাজতের সঙ্গে সরকারের সাম্প্রতিক ‘মায়াময়’ বৈঠকের পর ইসলামের এক হেফাজতকারী নাকি বলেছেন: ইসলামে নারী ‘নেত্রীত্ব’ (নেতৃত্ব) নিষিদ্ধ। কথাটা নতুন নয়। দেশের অনেক আলেম-ইমাম নারী নেতৃত্বের বিরোধী এবং তারা গ্রামগঞ্জের কোটি মানুষকে প্রভাবিত করেন।

গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে এক ইসলামি দল লিখিত স্মারকলিপি দিয়েছিল যেন সাংবিধানিকভাবে নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিষিদ্ধ করা হয়– ১৩ জুলাই ২০০৮।

১৮ জানুয়ারি ২০০৬ ‘ভয়েস অব আমেরিকা’ রেডিওর আলোচনায় আমার বিপক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতের সিনিয়র অ্যাসিসটেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি জনাব মরহুম কামরুজ্জামান মিয়া অংশ নিয়েছিলেন। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল জামায়াত বহু বছর ধরে নারী নেতৃত্ব ‘হারাম’ বলার পরেও বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব ও প্রধানমন্ত্রিত্ব মেনে নিল কী করে? জবাবে তিনি বলেছিলেন:

“পরিস্থিতির কারণে জামায়াত নারী নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে।”

অর্থাৎ ‘পরিস্থিতির কারণে’ যাঁরা এতকালের ‘হারাম’কে ‘হালাল’ করেছেন, ভবিষ্যতে তারা ওই ‘পরিস্থিতির কারণে’ই সে হালালকে হারাম করতে পারেন এবং সেই পরিস্থিতি কখন কোথায় কীভাবে ঘটবে, সেটাও তারাই ঠিক করবেন। এটা অবশ্য কিছু নয়; এ রকম উদ্ভট ও স্বার্থকেন্দ্রিক কিছু দাবি চিরকাল হয়েছে মুসলিম ইতিহাসে। যেমন, সুবিশাল ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ ইসলামি প্রকাশনা কেন্দ্রের ‘দ্য ডকট্রিন অব ইজমা ইন ইসলাম’-এ স্টাডি অব দ্য জুরিডিক্যাল প্রিন্সিপল অব কনসেন্সাস’ বইয়ে (পৃষ্ঠা ১৬–আহমেদ হাসান–কিতাব ভবন, নিউ দিল্লি ১১০০০২) দাবি করা হয়েছে:

“কোরানের কোনো আয়াত যদি আমাদের ইমামদের মতের বিরুদ্ধে

যায় তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে ওই আয়াতটি বাতিল হইয়া গিয়াছে... ইহাই ভালো যে ওই আয়াতটি এমনভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে যাহা ইমামদের মতের সাথে মিলে।"

কেউ চাইলে পৃষ্ঠাটার ফটোকপি পাঠানো যেতে পারে। ইসলাম নিয়ে এ কালখেলার অনেক মূল্য দিয়েছে ও দিচ্ছে বিশ্ব-মুসলিম। আমরা এখন দেখব নারী নেতৃত্বের ব্যাপারে (১) শারিয়া আইন কী বলে, (২) ইতিহাসের বাস্তবতা কী, (৩) রাসুল (সা.) কী বলেন এবং (৪) কোরান কী বলে।

(১) শারিয়া আইনঃ

শারিয়া আইনে নারী নেতৃত্ব সরাসরি নিষিদ্ধ যা কোরান, রাসুল (সা.) ও ইসলামি ইতিহাসের বাস্তবতার বিরুদ্ধে যায়, সূত্র-প্রমাণ নিচে দেওয়া হলো। শারিয়া আইনটা বাংলাদেশের পাঠক যাতে মিলিয়ে দেখতে পারেন সেজন্য দেখাচ্ছি বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন' বইয়ের ৩য় খণ্ডের ১৯৭ পৃষ্ঠায় ধারা ৯০০। 'রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার যোগ্যতা' আইনে আছেঃ

"রাষ্ট্রপ্রধানের পুরুষ হওয়াও অপরিহার্য শর্ত।"

'অপরিহার্য' মানে যাকে পরিহার করা বা বাদ দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু তার পরপরই কোনো এক রহস্যময় কারণে 'অপরিহার্য শর্ত' আর ততটা 'অপরিহার্য' থাকেনি। বলা হয়েছেঃ

"ইসলামি রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ ফকিহগণ কোনো বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জাতির সার্বিক কল্যাণ বিবেচনা করিয়া উক্ত সর্বোচ্চ পদ নারীর জন্য অনুমোদন করিতে পারেন।"

অর্থাৎ তাদের অনুমোদন ছাড়া যোগ্য নারীও রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন না। এই সুবিশাল সিদ্ধান্ত কে বা কারা, কবে, কোথায়, জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়াই কোন অধিকারে ও কিসের ভিত্তিতে ঠিক করল এবং এটা বিশ্ব-মুসলিম মানবেই-বা কেন তা অবশ্য বলা হয়নি।

(২) ইতিহাসের বাস্তবতাঃ

আমাদের সময়ে বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছেন শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, বেনজির ভুট্টো ও সুকর্ণপুত্রী। আর ইতিহাসে আছে মুসলিমপ্রধান দেশ মিসর, ইয়েমেন, ইরান, মধ্য এশিয়া, মালদ্বীপ ও ইন্দোনেশিয়ায় সার্বভৌম মুসলিম রানিরা শাসন করেছিলেন। তাঁরা কোনো রাজাদের অলংকার-মার্কা রানি ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন রাজদণ্ডধারী সার্বভৌম শাসনক্ষমতার অধিকারী মুসলিম রানি। তাঁদের কারো কারো নিজের নামে মুদ্রা ছিল, তাঁদের অনেকের নামে মওলানারা দোয়া (খুতবা) করতেন মসজিদে। ১৭ জন সার্বভৌম মুসলিম রানির উদাহরণ দিচ্ছি বিশ্ববিখ্যাত ইসলামি বিশেষজ্ঞ ডক্টর ফাতিমা মার্নিসির বই 'ইসলামের বিস্মৃত রানিগণ' (দ্য ফরগটেন কুইনস অব ইসলাম) পৃষ্ঠা ৯০-৯১ থেকে–

- ১২৩৬ সাল দিল্লি, মানুষের ইতিহাসে একমাত্র কুমারী রানি সুলতানা রাজিয়া। তখনকার খলিফা আমিরুল মুমেনিনের সমর্থনও পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর মুদ্রায় খোদাই করা আছেঃ

  "সুলতান ইলতুৎমিসের কন্যা মালিকা ইলতুৎমিস, যিনি আমিরুল মুমেনিনের সম্মান বাড়ান।" মুদ্রাটা এখনো থাকার কথা কলকাতার মিউজিয়ামে।

- ইরানের তুরকান অঞ্চলের রানি তুরকান খাতুন, ১২৫৭ থেকে ১২৮২ পর্যন্ত একটানা ২৫ বছর। মসজিদে তাঁর নামে খুতবা পড়া হতো।
- তুরকান খাতুনের কন্যা পাদিশা খাতুন। নামাঙ্কিত মুদ্রা।
- ইরানের সিরাজ অঞ্চলে আবশ খাতুন। ১২৫৩ থেকে ১২৮৭, একটানা ৩৪ বছর। খুতবা ও নামাঙ্কিত মুদ্রা, দুটোই ছিল।
- ইরানের লুরিস্থান অঞ্চলের ১৩৩৯ সালের মুসলিম রানি (নাম জানা নেই)।

- রানি তিন্দু, ১৪২২ থেকে ৯ বছর পর্যন্ত (জায়গা সম্বন্ধে মতভেদ আছে)।
- মালদ্বীপের সুলতানারা খাদিজা, মরিয়ম ও ফাতিমা। ১৩৪৭ থেকে ১৩৮৮, একটানা ৪১ বছর। এক সময়ে ইবনে বতুতা সেখানকার সরকারি কাজি ছিলেন।
- ইয়েমেনের সুলায়হি (শিয়া-খেলাফত?) বংশের দুই রানি আসমা ও আরোয়া, প্রায় ৫০ বছর রাজত্ব করেছেন। মসজিদে তাঁদের নামে খুতবা হতো।
- ১২৫০ সালে মিসরের রানি সাজারাত আল দুর, ১২৫৭ থেকে ১২৫৯, মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত দুবছর। তাঁর নামে মুদ্রা ও মসজিদে খুতবা দুটোই। মামলুক খেলাফতের সমর্থনও পেয়েছিলেন তিনি।
- সুলতানা ফাতিমা, মধ্য এশিয়ায় কাসেমি খেলাফতের শেষ সার্বভৌম সুলতানা, শাসন করেছেন ১৬৭৯ থেকে ১৬৮১ দুবছর।
- ইন্দোনেশিয়ায় ১৬৪১ থেকে ১৬৯৯ পর্যন্ত ৫৮ বছর ধরে একটানা শাসন করেছেন সুলতানা শাফিয়া, সুলতানা নুর নাকিয়া, সুলতানা জাকিয়া ও সুলতানা কামালাত শাহ। ওখানকার মওলানারা মক্কা থেকে ফতোয়া এনে সুলতানাদের উৎখাত করার চেষ্টা করেও পারেননি রানিদের জনপ্রিয়তার জন্য।

(৩) রাসুল (সা.):

নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কিছু হাদিস আছে কিন্তু সেগুলোতে নাম-ধাম জায়গা ও ঘটনার বিস্তারিত কোনো বিবরণ নেই। যেমন, মওলানা মুহিউদ্দীনের অনূদিত বাংলা কোরানের ব্যাখ্যার অংশ, পৃষ্ঠা ১২২০। নবীজি (সা.) নাকি বলেছেন:

"যখন তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মন্দ ব্যক্তি হইবে, তোমাদের

বিত্তশালীরা কৃপণ হইবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হইবে, তারা যেভাবে ইচ্ছা কাজ করিবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্য ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূগর্ভই শ্রেয় হইবে।"

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। সবাই জানেন আমাদের সহি হাদিসের কিতাবগুলোতে অনেক পরস্পরবিরোধী হাদিস আছে। নাম-ধাম ঘটনার বিবরণহীন কোনো হাদিসের বিপক্ষে যদি নাম-ধাম ঘটনার বিবরণসহ কোনো হাদিস থাকে তবে পরেরটা গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, যদি তা থেকে সমাজের উপকার হয়।

'শারিয়া কী বলে, আমরা কী করি' বইতে আমি এরকম দুপক্ষেরই পরস্পরবিরোধী হাদিসের অজস্র উদাহরণ-উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছি। আরেকটা কথা না বললেই নয়। হাদিসের অনুবাদগুলোতে নম্বরের পার্থক্য আছে। আমি ব্যবহার করি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহসিন খানের সহি বুখারির ৯ খণ্ডের অনুবাদ, দুনিয়ায় ওটাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় বলে আমার ধারণা।

নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নাম-ধাম ঘটনার বিবরণসহ হাদিস পেয়েছি মাত্র একটি, তা-ও আবার মাত্র একজন সাহাবির বলা, এবং রাসুলের (সা.) মৃত্যুর সুদীর্ঘ ২৪ বছর পরে। এবারে সেই হাদিসটার ব্যবচ্ছেদ করা যাক।

নবীজির (সা.) তায়েফ আক্রমণের সময় কিছুতেই তায়েফের দুর্গ ভাঙা যাচ্ছিল না। তখন তিনি ঘোষণা করলেন দুর্গের ভেতর থেকে যে সব ক্রীতদাস পালিয়ে আসবে, তারা সবাই মুক্ত হবে। শুনে অনেক ক্রীতদাস পালিয়ে আসে, ফলে দুর্গের পতন হয়। বালক আবু বাকরা [হজরত আবু বকর (রা.) নন] ছিলেন তাঁদের একজন।

এরপর ২৪ বছর চলে গেছে, নবীজি (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, আবু বাকরা তখন বসরা নগরের গণ্যমান্য নাগরিক। ঘটে গেল রক্তাক্ত 'জামাল যুদ্ধ' হজরত আলীর (রা.) বিরুদ্ধে হজরত আয়েশা-তালহা-যুবায়ের (রা.) দলের। যুদ্ধে হজরত আলী (রা.) জয়লাভ করে বিবি

আয়েশাকে (রা.) সসম্মানে মদিনায় পাঠিয়ে দেওয়ার পর বসরায় প্রবেশ করে শহরের গণ্যমান্য লোকদের ডেকে পাঠান। আবু বাকরা তখন হজরত আলীকে (রা.) এই হাদিস শোনান–

নবীজির (সা.) সময় রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের আক্রমণে ইরানে খুব বিশৃঙ্খলা হয়েছিল। তখন সেখানে দুজন নেত্রীর আবির্ভাব হয়েছিল, সে কথা শুনে নবীজি (সা.) নাকি আবু বাকরাকে বলেছিলেন:

"আবু বাকরা বলিয়াছেন, জামাল যুদ্ধের সময় আমি সাহাবিদের সহিত যোগ দিয়া (বিবি আয়েশার পক্ষে) যুদ্ধে প্রায় নামিয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু নবীর (সা.) একটি কথায় আল্লাহ আমাকে বড়ই উপকৃত করিয়াছেন। যখন নবীজিকে (সা.) বলা হইল যে (পারস্য সম্রাট) খসরুর মৃত্যুর পরে পারস্যের লোকেরা তাহার কন্যার উপর নেতৃত্ব অর্পণ করিয়াছে, তখন তিনি বলিলেন, 'কখনো উন্নতি করিবে না সেই জাতি যে জাতি তাহাদের নেতৃত্ব অর্পণ করে নারীর উপরে'।"

(সহি বুখারির ইংরেজি অনুবাদ, ড. মুহসিন খান, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়– পঞ্চম খণ্ড, হাদিস ৭০৯)

তাহলে আমরা পেলাম:

১। এ হাদিস জানার পরেও আবু বাকরা বিবি আয়েশার (রা.) পক্ষে যুদ্ধে "যুদ্ধে প্রায় নামিয়া পড়িয়াছিলাম", অর্থাৎ তিনি বিবি আয়েশার (রা.) পক্ষে যুদ্ধ করেননি;

২। এ হাদিস তিনি প্রকাশ করেছেন হজরত আয়েশা (রা.) পরাজিত হওয়ার পরে, আগে নয়;

৩। বলেছেন নবীজির (সা.) মৃত্যুর সুদীর্ঘ ২৪ বছর পর, তার আগে নয়;

৪। এ হাদিসে তিনি "বড়ই উপকৃত হয়েছেন";

৫। তিনি হজরত আলীকে (রা.) বলেছেন, অন্য কাউকে না জানালেও তিনি নাকি শুধু হজরত আয়েশাকে (রা.) জামাল যুদ্ধের আগে চিঠি

লিখে এ হাদিসের কথা জানিয়েছিলেন;

৬। অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদিস নবীজি (সা.) বর্ণনা করেছেন অনেক সাহাবিকে, কিন্তু যে হাদিসের সঙ্গে কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের সব মুসলিম নারীর সম্মান ও অধিকার বাঁধা, সেই অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ হাদিস নবীজি (সা.) বলেছেন শুধু তাকেই, আর কাউকেই নয় কিংবা বিদায় হজের খুতবাতেও নয়।

এবার হিসাবের কড়ি:

- আবু বাকরা বলেছেন, "আমি বড়ই উপকৃত হইয়াছি।" কীভাবে? তিনি কোনো নেতা বা রাজা-বাদশা ছিলেন না, কীভাবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বড়ই উপকৃত হলেন? তিনি তো বিবি আয়েশার (রা.) বিরুদ্ধে হজরত আলীর (রা.) পক্ষে যুদ্ধও করেননি।
- জামাল যুদ্ধে যদি আয়েশা (রা.) জিতে যেতেন, তবে কি তিনি এ হাদিস প্রকাশ করতেন? নিশ্চয়ই না, তিনি তো ২৪ বছরে কাউকেই এ হাদিস বলেননি।
- জামাল যুদ্ধ যদি না হতো তবে তিনি এ হাদিস বলতেন কি? নিশ্চয়ই না, কারণ তিনি ২৪ বছরে কাউকেই এ হাদিস বলেননি।

এবারে প্রমাণ:

- চিঠিতে হাদিসের কথা জানানোর পরেও বিবি আয়েশা (রা.) যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি এ হাদিস বিশ্বাস করেননি;
- পরবর্তী সময়ে মওলানারা এ হাদিস জানতেন না, এটা হতে পারে না। ইতিহাসে এক ইন্দোনেশিয়া ছাড়া আর কোথাও তারা সুলতানাদের বিরোধিতা তো করেনইনি বরং রানিদের নামে খুতবা পড়িয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা এ হাদিস বিশ্বাস করেননি;
- খলিফাদের সমর্থন ছাড়া সুলতানাদের মুদ্রা ও খুতবা সম্ভব হতো না। তাঁদের দরবারে কোরান-হাদিসের প্রচণ্ড চর্চা হতো, খলিফারা ও

প্রাসাদ ইমামেরাও এ হাদিস বিশ্বাস করেননি।

অর্থাৎ ইসলামের ইতিহাসে বেশির ভাগ লোক এ হাদিস বিশ্বাস করেনি। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিরুদ্ধে নির্বাচনে ফাতিমা জিন্নার সমর্থক মওলানা মওদুদীও বিশ্বাস করেননি। কেন? কারণ তাঁরা জানতেন, এ হাদিস জাল।

এই সূত্রগুলো থেকে জানা যায় কেন এ হাদিস জাল–

- "ইহার বর্ণনাকারী আবু বাকরাকে নারী-ব্যভিচারের মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে হজরত ওমর (রা.) শাস্তি দিয়াছিলেন"। (উইমেন অ্যান্ড পলিটিকস ইন ইসলাম–Submission নামক ইসলামি ওয়েবসাইট)

অর্থাৎ আবু বাকরা এক নিরপরাধ শালীন নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। এটা একটা জঘন্য অপরাধ;

- "এই হাদিসের অসত্যতা সুপ্রমাণিত শুধু ইতিহাসেই নয়, বরং ইহাও সত্য যে আবু বাকরা সম্বন্ধে মুসলমানের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে তাহাকে জনসমক্ষে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।"–(উইমেনস রাইট ইন ইসলাম–শরীফ চৌধুরী)
- "আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে আবু বাকরাকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।"–(দ্য ফরগটেন কুইনস অব ইসলাম–ফাতিমা মার্নিসি)

(৪) কোরান:

সুরা নূর, আয়াত ৪:

"যাহারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ-সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাহাদিগকে ৮০টি বেত্রাঘাত করিবে এবং কখনো তাহাদের সাক্ষ্য কবুল করিবে না। ইহারাই নাফরমান।"

এই নাফারমান আবু বাকরার কথাতেই শারিয়া আইনে নারী নেতৃত্ব নিষিদ্ধ করা আছে। অথচ কোরানে কোথাও নারী নেতৃত্ব নিষিদ্ধ তো নেইই বরং সমর্থন করা আছে। সুরা নমল আয়াত ২৩:

"আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করিতে দেখিয়াছি।"

সেই রানি যখন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হলেন (আয়াত ৪৪) তখন কি কোরান তাকে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছে? মোটেই নয়, কোথাও বলেনি! (কোরানে তাঁর নাম নেই, কিন্তু ইসলামি সাহিত্যে তাঁর নাম বিলকিস পাওয়া যায়।)

জীবনের বেশির ভাগ বোঝা মা-বোনেরাই বয়েছেন চিরকাল। কিন্তু তাদের অবদানের প্রতিদান তো দূরের কথা, স্বীকৃতিটুকুও দেওয়া হয়নি। লজ্জাটা কম নয়, কিন্তু সমস্যাটা তার চেয়ে অনেক বড়। নারী-পুরুষের মিলিত অবদান ছাড়া সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। নেতা কিংবা মহাপুরুষেরা সেটা বিলক্ষণ জানতেন, তাই তাঁরা নারীদের কখনো অক্ষম করে রাখেননি।

বিশ্বনবী (সা.) তো ননই।

১৭ মে, ২০১৭

বাংলাদেশের শারিয়াকরণঃ সুদে ও আসলে গুনতে হবে কি দেনা?

'এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না'– প্রজ্ঞায় ভরপুর একটি প্রবাদ। আজ আমরা ইসলাম নিয়ে যে পথে পা দিয়েছি, ৪০-৫০ বছর আগে আরেকটা ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিমপ্রধান দেশ সে পথে পা দিয়েছিল। আজ সে দেশ কেমন আছে? কেমন আছে সংখ্যালঘুরা? ভিন্নমতের মুসলিমরা, বিশেষ করে নারীরা? ইতিহাসের বুকে প্রস্তরস্বাক্ষরে অঙ্কিত সেই পদচিহ্নগুলো ধরে ধরে একটু ঘুরে আসা যাক, কারণ এর ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

রাজনীতি, ভাস্কর্য, কওমি সনদের স্বীকৃতি, স্কুলের সিলেবাস, সৌদি অর্থায়নে ৫৬০টি মডেল মসজিদ, পুলিশ লাইনে সরকারি খরচে ইসলামি অনুষ্ঠান, সরকারি খরচে 'আরবি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি নিয়ে দেশে মতামতের প্রবল মেরুকরণ ও চিন্তার সংঘাত হচ্ছে। সেই সঙ্গে কয়েক দশক ধরে অত্যন্ত সন্তর্পণে জাতির অলক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্রোত বয়ে চলেছে। সেই দেশটাতেও এই একই স্রোত শুরু হয়েছিল। সেটা হলো সাধারণ জনগণের শারিয়াকরণ।

একাডেমিক জরিপকারী সংগঠন হিসেবে 'PEW'-এর খ্যাতি আছে। ২০১৩ সালের এপ্রিলে কিছু দেশের মুসলিমদের মধ্যে শারিয়ার প্রতি সমর্থন জরিপ করে PEW যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তাতে বাংলাদেশও আছে। জরিপের নাম 'The World's Muslims: Religion, Politics and Society' (বিশ্বমুসলিমঃ ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজ)। সেই জরিপ থেকে প্রধান পাঁচটি প্রশ্নোত্তর দেখাচ্ছি–

- প্রথম তিনটি জরিপ সাধারণ মুসলিমের মধ্যেঃ

১। শারিয়া আইনকে আল্লাহর নাজিলকৃত আইন বলে মনে করে–সর্বোচ্চ জর্দান ৮১%, সর্বনিম্ন আলবেনিয়া ২৪%। বাংলাদেশ ৬৫% ও

পাকিস্তান ৮১%।

২। শারিয়া আইন একটাই, বিভিন্ন নয় বলে মনে করে–সর্বোচ্চ তাজিকিস্তান ৭০%, সর্বনিম্ন তিউনিসিয়া ২০%। বাংলাদেশ ৫৭% ও পাকিস্তান ৬১%।

৩। নিজের দেশে শারিয়া আইন চায়–সর্বোচ্চ আফগানিস্তান ৯৯%, সর্বনিম্ন আজারবাইজান ০৮%। বাংলাদেশ ৮২% ও পাকিস্তান ৮৪%।

- পরের জরিপগুলো শুধু শরিয়া সমর্থক মুসলিমদের মধ্যে:

৪। ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করে–সর্বোচ্চ পাকিস্তান ৮৯%, সর্বনিম্ন বসনিয়া ২১%। বাংলাদেশ ৫৫%।

৫। মুরতাদ অর্থাৎ ইসলামত্যাগীদের মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করে–সর্বোচ্চ আফগানিস্তান ৭৯%, সর্বনিম্ন কাজাখস্তান ০৪%। বাংলাদেশ ৪৪% ও পাকিস্তান ৭৬%।

সেই ধর্মনিরপেক্ষ দেশটায় কোনো শরিয়া সমর্থক দল তখন ক্ষমতায় ছিল না, কিন্তু জাতির শারিয়াকরণ ঠেকানো যায়নি। আমাদের শারিয়াকরণও হচ্ছে ওই একই রাজনীতিনিরপেক্ষ পদ্ধতিতে। অর্থাৎ শারিয়াপন্থীরা ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক বহু বছর ধরে দেশ শরিয়ার দিকে এগিয়ে গেছে। সেই এগিয়ে যাওয়ার পদ্ধতিটা কী? কারণটা কী?

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা, দ্রব্যমূল্য সর্বত্র নৈরাজ্য, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও দুর্নীতিবাজদের দাপটসহ সমাজের সর্বক্ষেত্রে অসহ্য অরাজকতা বিরাজ করছে। এমতাবস্থায় শারিয়াপন্থীদের প্রস্তাবিত 'ইসলামি' সমাধান ধীরে ধীরে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে, এটাই স্বাভাবিক। 'আল্লাহর আইন সবকিছু ঠিক করে দেবে'– এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে উঠছে জনগণ। বহু সাধারণ মানুষ কোনো মওলানা-মুফতির হুকুম বা ফতোয়া ছাড়াই নিজে থেকে শরিয়া প্রয়োগকারী হয়ে গেছে। লক্ষণীয়, এই সাধারণ মানুষের অনেকেই কিন্তু কোনো ইসলামি দল করে না। কিছু

উদাহরণ দিচ্ছি:

- আগে রোজার মধ্যে হোটেলগুলো চাদর দিয়ে ঢাকা থাকত। অমুসলিমরা তো বটেই কোনো কোনো মুসলিমও বাইরে খেত। এখন রোজার মধ্যে বাইরে কাউকে খেতে দেখলে সাধারণ মানুষের একাংশ হিংস্র হয়ে ওঠে। গাড়িতে ভ্যাপসা গরমের দুপুরে এক যাত্রী পানি খেয়েছে বলে ড্রাইভার বাস থামিয়ে তাকে অপমান করে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

- গ্রামে নানা-নানির কোলে মানুষ, এখন ঢাকায় থাকে এমন একজনের কন্যার আকিকা। তিনি তার প্রিয় নানা-নানিকে গ্রাম থেকে আনার আয়োজন করেছেন। এদিকে উৎসবের সাত দিন আগে নানা মারা গেলেন। তখন গ্রামের সাধারণ মানুষ এসে দাবি করল শারিয়া মোতাবেক নানি চার মাস ঘরে থাকবে, নিজের নাতির বাসা হলেও ঢাকায় যেতে পারবে না।

- এক গ্রামে নববর্ষের উৎসবে এক কিশোর এক কিশোরীর সঙ্গে 'হ্যান্ডশেক' করেছে বলে গ্রামবাসী তাকে বেধড়ক পিটিয়েছে কোনো মওলানার ফতোয়া ছাড়াই।

- পঙ্গু হয়ে কয়েক বছর শয্যাগত থাকার পর একজনের মৃত্যু হলে সাধারণ মানুষ দাবি করেছে কাফফারা না দিলে তাঁর জানাজা হবে না। কারণ তিনি এত বছর নামাজ পড়েননি।

- কোনো এক কলেজের শিক্ষক ছাত্রীদের বোরকা পড়তে বাধ্য করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও হাইকোর্টকে এগিয়ে আসতে হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কঠোর নির্দেশ দিয়েছে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাউকে বোরকা পরতে বাধ্য করা যাবে না। ('জনকণ্ঠ', ২৬ আগস্ট ২০১২)

- রংপুরে এক এসআই ১৯ জন মেয়েকে থানায় ধরে নিয়ে আসে বোরকা না পরে পার্কে গিয়েছিল বলে। সেখানেও কোর্টকে এগিয়ে এসে সেই পুলিশকে তলব করে এবং এ ধরনের অপকর্ম নিষিদ্ধ

করে। ('জনকণ্ঠ', ৩ মার্চ ২০১০)

এরকম অজস্র উদাহরণ প্রমাণ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে শারিয়া আইন প্রয়োগ করার উগ্র প্রবণতা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। এই একই ধরনের ঘটনা ৪০-৫০ বছর আগে সেই দেশেও ঘটেছিল। এবারে কী পদ্ধতিতে শারিয়াকরণটা হচ্ছে তা দেখা যাক।

- দেশে মাদ্রাসার সংখ্যা কমপক্ষে তিন লাখ। ('জনকণ্ঠ', ১৫ মে ২০১৩)।

এগুলোর প্রায় সবাই শারিয়া আইনে বিশ্বাস করে ও ছাত্রদের সেই শিক্ষা দেয়। এগুলো থেকে প্রতিবছর সমাজে আসছে লক্ষ লক্ষ শারিয়া সমর্থক যারা সমাজের প্রতি স্তরে তাদের প্রভাব খাটাতে থাকে। শারিয়াপন্থী মওলানা-মুফতিরা এখন এক নিমেষে বহু হাজার যুদ্ধংদেহী তরুণকে রাস্তায় নামানোর প্রচণ্ড 'স্ট্রিট পাওয়ারে'র অধিকারী। ৫ এপ্রিল ২০১৩ শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের লক্ষ লোকের সমাবেশ তার প্রমাণ। এ বাহিনী ভবিষ্যতে অনেক বাড়বে এবং সর্বত্র এর চাপ অনুভূত হবে। এ চাপ ঠেকানোর পদ্ধতি এখনো বাংলাদেশে অনুপস্থিত। এটা সে দেশেও ঘটেছিল, সেখানেও এ চাপ ঠেকানোর পদ্ধতি অনুপস্থিত ছিল।

- অসংখ্য মওলানা-মুফতি নিয়ে দেশজুড়ে শারিয়া সমর্থক আলেম সমাজ গড়ে উঠেছে। জনগণের ওপর এদের প্রভাব প্রচণ্ড। এদের অনেকেই অত্যন্ত উগ্র ও আপত্তিকর ভাষায় হুংকার দিয়ে বক্তৃতা করেন, কারো কাছে এদের জবাবদিহিতা নেই।

- তাদের অসংখ্য কর্মতৎপর ও ধনী সংগঠন জাতির চোখের সামনে শুধু তাদেরই ইসলামি ব্যাখ্যা ধরে রেখেছে। তার বিপক্ষে সুফি ইসলামি বা ইসলামের অরাজনৈতিক ধর্মতত্ত্বের বইগুলো লেখা ও প্রচারের সংগঠন নেই বললেই চলে।

- তাদের আছে দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান মসজিদ, জনতাকে প্রভাবিত করার সুযোগ, যা তাঁরা পুরোটাই নিয়েছেন এবং

ভবিষ্যতেও নেবেন।

- তাদের আছে দলীয় পত্রিকা এবং সেগুলোতে ক্রমাগত হচ্ছে শারিয়া প্রচার। পক্ষান্তরে তাদের ইসলামি ব্যাখ্যার ভিত্তিহীনতা, কোরান বিরোধিতা, ইসলাম বিরোধিতা ও নারী বিরোধিতা তুলে ধরার তেমন কোনো পত্রিকা নেই। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ইসলামি দলিল ছাপতে বেশির ভাগ সেক্যুলার পত্রিকা ভয় পায়।

- এটাও শারিয়াপন্থীদের আরেকটা বিরাট সাফল্য। তারা জনগণ, সরকার, মিডিয়া, টিভি-রেডিও-সংবাদপত্র প্রকাশনাসহ সারা জাতিকে ভয় পাওয়াতে সক্ষম হয়েছেন। এটা আরও বাড়বে ছাড়া কমবে না।

- তাদের আছে দুনিয়াজুড়ে 'ফেইথ-কাজিন' সংগঠনগুলোর সঙ্গে শক্তিশালী আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক। পক্ষান্তরে আমাদের বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজ ভোগে অহংরোগ, গর্ব, একগুঁয়েমি ও সাংগঠনিক ব্যর্থতায়। টাকার জোর বা আন্তর্জাতিক সমন্বয়ও তাদের নেই।

- ২০০৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে জামায়াত ঘোষণা দিয়েছে: দেশজুড়ে মহাশরিয়া কোর্টের জটাজাল বানানো হবে। গ্রাম থাকবে উপজেলার নিয়ন্ত্রণে, উপজেলা থাকবে জেলার নিয়ন্ত্রণে, এভাবে হাজার হাজার শারিয়া কোর্টের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকবে বায়তুল মোকাররমের খতিবের হাতে। জামায়াত যদি সত্যিই তা করতে পারে তবে জাতি শরিয়া কোর্টের জটাজালে মাছের মতো আটকে যাবে। তারা 'আইন', 'কোর্ট' এসব শব্দ এড়িয়ে এমন নাম দেবে যে এটাকে আইন দিয়ে ধরা যাবে না।

- ইসলামি টিভি চ্যানেলগুলো তো আছেই, অন্যান্য প্রায় প্রতিটি টিভি চ্যানেলে ইসলামি প্রোগ্রাম চলে। প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে ইসলামি অংশ থাকে যার প্রত্যেকটিই শারিয়াপন্থী। জনগণের ওপর এসবের প্রভাব সুস্পষ্ট।

- আওয়ামী লীগ সরকারি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে। ('ইনকিলাব', ২০ আগস্ট ২০১১) প্রস্তাবটা সম্ভবত সংসদে পাসও হয়ে গেছে। বাংলাদেশে কয়েকটা বেসরকারি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেগুলোতে নির্ভেজাল মওদুদিবাদ পড়ানো হয়। সরকারি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের হাতেই যাবে।

- দাবি এসেছে ন্যাশনাল ফতোয়া বোর্ড গঠনের।

- বায়তুল মোকাররমের খতিবকে প্রধান বিচারপতির মর্যাদা দিতে হবে– এ দাবি বহু আগে থেকেই ছিল।

এরকম আরও ঘটনা ঘটছে। সমস্যা হলো সে দেশের মতো এখানেও আমাদের শারিয়াপন্থী মওলানারা সাংঘাতিক নারীবিরোধী। তাদের ওয়াজ, বক্তৃতা ও নিবন্ধে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তাদের নারীবিরোধী অবস্থান এতই স্পষ্ট যে, প্রগতিশীল শক্তি বিশেষ করে নারীশক্তির সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এটা জাতির জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও বিপজ্জনক। উদ্ধৃতি দিচ্ছি শারিয়াপন্থী মওলানা ও তাদের দৈনিক থেকে (দৈনিকটির নাম উহ্য রাখা হলো):

- ইসলামে নারীদের পুরুষের অধীন করা হয়েছে–১২ নভেম্বর ২০০৫।

- রাজনীতিতে নারীর ৩৩% আসন শরিয়তবিরোধী–২৬ মে ২০০৭।

- গায়িকা ও নারী-আবৃত্তিকার নিষিদ্ধ–৫ জুলাই ২০০৮।

- নারীদের নোংরা ভাষায় গালাগালি–২৩ জুলাই ২০০৮, ৩ ডিসেম্বর ২০০৫, ১১ ও ২২ জুলাই ২০০৫, ২৮ আগস্ট ২০০৫, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৫, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৫, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৫, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭।

- নারী নীতিমালার বিপক্ষে খোলাখুলি অবস্থান–১৯ মে ২০০৬, ১৪ মার্চ ২০০৮।

- নারীরা শুধু নারী-সংক্রান্ত বিষয়ে আইনবিদ হতে পারবেন, তাও

অভিভাবকের সম্মতিক্রমে–৮ মার্চ ২০১০।

- নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ করা হোক, গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে খেলাফত আন্দোলন দলের প্রস্তাব–১৩ জুলাই ২০০৮।
- নারীরা তেঁতুলের মতো, দেখলে পুরুষের জিহ্বায় পানি আসে (ওয়াজ)।
- নারীদের পঞ্চম শ্রেণির বেশি পড়ানো উচিত নয় (ওয়াজ)।
- কর্মজীবী নারীরা বেশ্যা (ওয়াজ)।
- "আমাদের বড়জনও নারী, মেজোজনও নারী, সেজোজনও নারী, তাই আমরা একটা 'মাথা খারাপ' জাতি" (ওয়াজ)।

সে দেশের নাম পাকিস্তান, দুনিয়ার অন্যতম ব্যর্থ রাষ্ট্র। সেখানে অমুসলিমের সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে, সেখানে অহরহ শিয়া-সুন্নি-আহমদির হানাহানি রক্তপাত, সেখানে ক্রমাগত আত্মঘাতী হামলায় বাস-ট্রেন-বাজারে শত শত সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে মসজিদের নামাজিরা পর্যন্ত মরে পড়ে থাকে, সেখানে হত্যাকারীর নামে রাস্তা ও পার্ক বানানো হয়, ধর্ষণের চারজন মুসলিম সাক্ষী না হলে ধর্ষকের শাস্তি হয়নি বহু বছর।

এটা ওদের হুদুদ আইন নং ৭, ১৯৭৯, আইন ৮ এর খ, ১৯৮০ দ্বারা সংশোধিত। শারিয়া সমর্থকদের প্রচণ্ড বিরোধিতার জন্য এ আইন বহু বছর বাতিল করা যায়নি, সম্প্রতি বাতিল হয়েছে। সেখানে তিন হাজারের বেশি ধর্ষিতা ১০-১২ বছর জেল খেটেছেন, কারণ তাঁরা ধর্ষণের চারজন সাক্ষী আনতে পারেননি। এটা ওদেশে হয়েছে, হতে পারে এখানেও। ইসলামি নেতৃত্বকে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে ও তার সঙ্গে আপস করার কী মারাত্মক ফল হয়েছে, তা থেকে আমাদের রাজনীতিবিদদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

ঘটনা যেভাবে ঘটছে তাতে একদিন গণতান্ত্রিক ভোটেই বাংলাদেশ

'শারিয়া রাষ্ট্র' হয়ে যেতে পারে যেমন মিসরে ঘটেছে। আমাদের কিছুটা দেরি হয়েছে, কিন্তু পথ এখনো আছে, উপায় এখনো আছে। তা হলো, জাতিকে শারিয়া সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলা। জাতিকে জানানো যে হানাফি ও শাফি আইনের কিতাবে প্রত্যেকটিতে যে ছয় হাজারের বেশি আইন আছে তার বেশির ভাগই ভালো, কিন্তু কিছু আইন লঙ্ঘন করে কোরান, রাসুল (সা.) ও মানবাধিকার। সেগুলো যুগোপযোগী করতেই হবে। সব মিলিয়ে শারিয়া আইনের সিংহভাগ মানুষের তৈরি।

- আরও উচিত দুনিয়ার অন্যতম বৃহৎ ইসলামি সংগঠন নাহদলাতুল উলামার 'ইসলামি রাষ্ট্রের বিভ্রম' ('The Illusion of An Islamic State') বইটার বাংলা অনুবাদ করে জাতির কাছে পৌঁছে দেওয়া। ২০০৩ সালে এ সংগঠনের সদস্য ছিল মোটামুটি চার কোটি। এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট হাজি আবদুর রহমান ওয়াহিদ ছিলেন পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিমপ্রধান দেশ ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট।

- আরও দরকার ড. বাসাম তিবি, ড. আবদুল্লাহ আন নাঈমের মতো শারিয়াবিরোধী ইসলামি বিশেষজ্ঞদের বইগুলো অনুবাদ করে জাতির কাছে পৌঁছে দেওয়া।

- আরও উচিত জাতিকে জানানো কেন ড. হাশিম কামালির মতো শারিয়া বিশেষজ্ঞেরা (তাঁর অসাধারণ গবেষণার বই 'প্রিন্সিপলস অব ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স') ব্যাকুল হয়ে মুসলিম বিশ্বকে শারিয়া আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছেন।

- দেশেও কিছু কাজ হয়েছে। বই আছে 'শারিয়া কী বলে, আমরা কী করি', ডকুমুভি বানানো হয়েছে 'নারী', 'শরিয়া প্রহেলিকা' ও 'হিল্লা'; এখন আমাদের দায়িত্ব এগুলো ছড়িয়ে দেওয়া।

এসবের ভিত্তিতেই বেশ কিছু মুসলিমপ্রধান দেশের ইমামরা শারিয়াভিত্তিক ইসলামি ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইতিহাস ব্যাকুল হয়ে বারবার হুঁশিয়ারি দিচ্ছে আমাদের, কিন্তু আমরা বিপুল অহংকারে সে হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে যাচ্ছি, করেই যাচ্ছি। আমরা বালুর মধ্যে মাথা গুঁজে

নিজেদের সান্ত্বনা দিচ্ছি এই বলে যে ঝড়টা আসছে না। কিন্তু—

প্রকৃতির কিছু বিধান রয়েছে বাকি,
অন্ধ সে বিধি কাউকে ছাড় দেবে না,
কেউই পারেনি সেইখানে দিতে ফাঁকি,
সুদে ও আসলে গুনতে হয়েছে দেনা!

৪ মে, ২০১৭

ইসলামে বাল্যবিবাহ

দেশে বাল্যবিবাহের আইন ও তার প্রয়োগের দড়ি-টানাটানি চলছে তো চলছেই। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে মানবাধিকারকর্মীদের আন্দোলন, অন্যদিকে এর পক্ষে বেশির ভাগ ইমাম-আলেমদের অবস্থান। তাদের প্রধান যুক্তি সহি বুখারির হাদিস:

“রাসুল (সা.) বিবি আয়েশাকে (রা.) বিয়ে করিয়াছিলেন ছয় বছর বয়সে, নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন নয় বছর বয়সে।”

(বুখারি ৭ম খণ্ড-৬৪, ৫ম খণ্ড-২৩৪, ২৩৬)

অথচ ছয় বছরে বিয়ে হয়েছে এটা নির্ভরযোগ্য নয় তাঁর নিজের কথাতেই:

“বিবি আয়েশা (রা.) বলছেন, বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল সাত বছর।” (সহি মুসলিম ৮-৩৩১১)

এক বছরের তফাত বেশি না মনে হতে পারে, কিন্তু এ থেকে প্রমাণ হয় বুখারির ওই ছয় বছর, নয় বছরের দলিল প্রশ্নাতীত নয়।

বাল্যবিবাহের বিপক্ষে অন্য যেসব দলিল আছে তা উপেক্ষা করে এই একটামাত্র ঘটনার ওপরে নির্ভর করে বাল্যবিবাহ চলে আসছে। অথচ ড. জাকির নায়েকসহ বহু ইসলামি বিশেষজ্ঞ এই ‘ছয় বছর-নয় বছর’-এর বিরুদ্ধে চিরকাল প্রতিবাদ করেছেন। কিসের ভিত্তিতে করেছেন সেটাই আমরা দেখব, কিন্তু প্রথমে দেখা যাক এ ঘটনার ভিত্তিতে ইসলামবিরোধীরা রাসুলকে (সা.) ‘শিশু-ধর্ষক’ বলে যে অপবাদ দিয়ে থাকে, সেটা কেন ভিত্তিহীন।

শিশু নিপীড়ন মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত পুরুষ কম বয়সের শিশুদের সঙ্গে যৌনসংসর্গ করতে সর্বক্ষণ সুযোগ খুঁজতে থাকে। মনে রাখতে হবে সেই সময়ে সমাজ, পরিবার, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি এমনকি প্রতিটি মানুষের মনোজগতের ওপর রাসুলের (সা.) সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ

ছিল। লক্ষ অনুসারীরা তাঁর জন্য নিজেদের 'পিতামাতা উৎসর্গ' করার কথা সর্বক্ষণ বলতেন; তিনি চাইলে অনায়াসে শত শত নয়, বরং হাজার হাজার শিশুর সঙ্গে যৌন সংসর্গ করতে পারতেন। অথচ তেমন কিছুর কোনো দলিল নেই। বরং তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র আয়েশা (রা.) ছিলেন কুমারী, বাকিরা প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা, কেউ কেউ আবার তেমন সুন্দরীও ছিলেন না। কাজেই 'শিশু নিপীড়ন' তত্ত্বটা তাঁর বেলায় একেবারেই খাটে না।

২৫ বছরের দুরন্ত যৌবনে তাঁর প্রথম বিয়েই ছিল ৪০ বছরের বিধবা বিবি খাদিজার সঙ্গে এবং তিনি বিবি খাদিজার (রা.) মৃত্যুর আগে দ্বিতীয় বিবাহ করেননি।

'ছয় বছর-নয় বছর':

- মনে রাখতে হবে ১০০ বছর আগেও যেখানে কেউ দিন-ক্ষণ-বছরের দলিল রাখত না, সেখানে আমরা এক হাজার ৪০০ বছর আগের কথা বলছি। অতীতে অনেক দেশে (এমনকি বর্তমানেও কিছু অনুন্নত এলাকায়) সময় এবং বয়স মনে রাখার কোনো বৈজ্ঞানিক প্রথা চালু ছিল না। তখন তারা কোনো বিশেষ ঘটনার সাহায্যে, যেমন যুদ্ধ, খরা, অথবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভিত্তিতে বছর মনে রাখত। এমনকি ইতিহাসের পাতায় সভ্যতার শীর্ষে যে রোমান জাতি, তাদের মধ্যেও এই প্রথা চালু ছিল।

নবীর (সা.) জন্মের বছরে ইয়েমেনের রাজা আবরাহা তার হাতির বহর নিয়ে মক্কা আক্রমণ করে। তাই সেই বছরকে বোঝাতে মক্কার লোকেরা 'হস্তীর বৎসর' উল্লেখ করত। এই প্রথা স্মৃতির ওপর নির্ভরশীল, তাই বয়সের ও সময়ের হিসাবে অনিচ্ছাকৃত ভুল ইতিহাসে ধরা পড়ে। তারপরও, যে দলিলগুলো আমাদের হাতে আছে তার ভিত্তিতে কয়েকটা সংখ্যা দেখা যাক।

- রাসুল (সা.) নবুয়ত পেয়েছিলেন ৬১০ সালে;

- রাসুল (সা.) মদিনায় হিজরত করেছিলেন ৬২২ সালে;
- রাসুল (সা.) আয়েশাকে (রা.) ঘরে তুলেছিলেন ৬২২ সালে;
- বদর যুদ্ধ হয় ৬২৪ সালে এবং
- ওহুদ যুদ্ধ হয় ৬২৫ সালে।
- **অঙ্ক:**

ইবনে ওমর বলেন: “রাসুল (সা.) আমাকে (৬২৫ সালে) ওহুদ যুদ্ধে যোগ দিতে দেননি, কারণ তখন আমার বয়স ছিল ১৪। কিন্তু খন্দক যুদ্ধে আমি যোগ দিতে পেরেছিলাম, কারণ তখন আমার বয়স ১৫ ছিল।”

(বুখারি ৩-৮৩২ ও তফসির ইবনে কাথির ৪-২৮৬)

- ৬২৫ সালে বিবি আয়েশা (রা.) বদর যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। (বুখারি ৪-১৩১) কাজেই বিয়ের সময় ৬১৯ সালে তাঁর বয়স ছিল কমপক্ষে ৯ বছর এবং ৬২২ সালে ‘ঘরে তোলার’ সময় তাঁর বয়স অবশ্যই ১২ বছরের বেশি ছিল।

- ৬১৫ সালে পিতা হজরত আবু বকর (রা.) এক লোকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক করেছিলেন। কন্যাশিশুর বিয়ের প্রস্তাব করা কোনো পিতার পক্ষে সম্ভব হলেও ব্যতিক্রম মাত্র। তাই ৬১৫ সালে তিনি প্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন সে সম্ভাবনাই বেশি। সে হিসাবে চার বছর পর রাসুলের (সা.) সঙ্গে ৬১৯ সালে বিয়ের সময় তাঁর প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

- ৬১২ সালের দিকে কোরআনের ৫৪তম অধ্যায় সুরা ক্বামার নাজিলকালে বিবি আয়েশা (রা.) একজন কিশোরী (জারিয়াহ) ছিলেন এবং তিনি আয়াত মুখস্থ বলতে পারতেন। (বুখারি ৬-৫১৫) সে হিসাবে তাঁর বয়স তখন ছয়ের বেশি হওয়াই সম্ভব এবং ৬২২ সালে ‘ঘরে তোলার’ সময় তাঁর বয়স অন্তত ১৬ বছর।

- ইবনে হিশাম/ইসহাকের বিখ্যাত ‘সিরাত’ কেতাবে আমরা দেখি

তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ৬১০ সালে। ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য ভালো-মন্দ বোঝার কিছুটা ক্ষমতা থাকবে বলেই আশা করা যায়। ৬১০ সালে যদি তাঁর বয়স তিন বছরও (খুব সম্ভব তার চেয়ে বেশি) হয়ে থাকে, তবে ৬২২ সালে 'ঘরে তোলার' সময় তাঁর বয়স অন্তত ১৫ বছর।

- ১৪০০ বছর আগে নয় বছরের বালিকার বিয়ে স্বাভাবিক ধরা হতো। তখনকার সামাজিক ব্যবস্থা, জীবনযাপন প্রণালী, প্রাকৃতিক অবস্থা এবং রূঢ় আবহাওয়া এর কারণ হতে পারে। বাইবেলেও এর ইঙ্গিত আমরা পাই। ইসলামের শত্রুপক্ষের লোকেরা রাসুলের (সা.) অনেক সমালোচনা করেছে, কিন্তু এ বিষয়ে কখনো কোনো কটু মন্তব্য করেনি।

- ৬১৫ সালে হজরত আবু বকর (রা.) মুত'আমের পুত্রের সঙ্গে আয়েশার (রা.) বিবাহের চিন্তা করেছিলেন। মুত'আম তার পুত্রের এই বিবাহে রাজি হয়নি, কারণ তখন হজরত আবু বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তখন অবশ্যই বিবি আয়েশার (রা.) বয়স দুইও হয়ে থাকে সেই হিসাবে ৬২২ সালে তাঁর বয়স অবশ্যই নয়ের বেশি ছিল।

- হজরত আবু বকরের (রা.) চার সন্তানেরই জন্ম হয়েছিল আইয়ামে জাহেলিয়ার যুগে, যখন ইসলাম প্রচার শুরু হয়নি। এই যুগের পরিসমাপ্তি হয় ৬১০ সালে। সেই সূত্রে ৬২২ সালে বিবি আয়েশার (রা.) বয়স ন্যূনতম বয়স ১২ বছর ছিল।

- বিবি ফাতেমা (রা.) বিবি আয়েশার (রা.) পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। মুহাম্মদের (সা.) বয়স যখন ৩৫ বৎসর তখন ফাতেমার (রা.) জন্ম হয়। সেই হিসাব অনুযায়ী বিবি আয়েশা (রা.) রাসুলাল্লার (সা.) চেয়ে ৪০ বছরের ছোট ছিলেন, অর্থাৎ বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল ১২।

- দলিল আরও অনেক আছে, যা কখনও পরস্পরবিরোধী, তাই তা

থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন।

- **কোরান:**

“এতিমদের প্রতি বিশেষ নজর রাখবে যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করতে পারো।” (সুরা নিসা আয়াত ৬)

কী মনে হয়? “যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে...তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পারো”– এর অর্থ বিয়ের একটা বয়স আছে সেটা তখনই হবে যখন তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ হবে। কথাটা নাবালিকাদের ক্ষেত্রে খাটে না, বাল্যবিবাহ ওখানেই সুস্পষ্ট ভাষায় নাকচ করেছে কোরান।

- **বাস্তবতা:**

যারা বাল্যবিবাহ সমর্থন করেন, তারা কি ওই কচি মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়েছেন একবার? বিশ-পঁচিশ বছরের তরুণের দেহে দুর্দান্ত খেলা করে প্রচণ্ড যৌবন, আর ওদিকে ওই বাচ্চা মেয়েটার না শরীর তৈরি, না মন। সেখানে প্রতিদিন ওই বাচ্চাটাকে কি দোজখের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তার শরীরের ওপর কি মর্মান্তিক অত্যাচার হয়, তা কি বাল্যবিবাহ সমর্থনকারীরা ভেবেছেন একবারও?

অন্ধের মতো হাদিস অনুসরণ করার উদগ্র বাসনা এভাবেই জীবন ধ্বংস করে, ইসলামেরও বদনাম হয়। তার ওপর আছে ওই কচি শরীরে সময়ের আগেই মাতৃত্বের চাপ।

আরও বলতে হবে?

২৩ এপ্রিল, ২০১৭

জঙ্গি উচ্ছেদে শারিয়া আইন?

দেশে ইসলামের নামে জঙ্গি-বিস্ফোরণ ঘটেছে। সরকার প্রচণ্ড বিক্রমে জঙ্গি দমন ও নিধন করছে। কিন্তু শুধু বিষফল নিধন করেই স্থায়ী সফলতা আসবে না যদি বিষবৃক্ষ উচ্ছেদ করা না হয়।

জঙ্গিরা চায় কী? দেশ ও দুনিয়া যেভাবে চলছে তাতে ওরা অত্যন্ত বিরক্ত, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। ওদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা মানুষ খুন করে হলেও শারিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু যে 'আল্লাহর আইন' প্রতিষ্ঠা করতে ওরা খুন করছে খুন হচ্ছে সে আইনগুলো ওরা যদি একটিবার পড়ে দেখত, তাহলে ওরা এ সর্বনাশা পথে পা বাড়াত না, বুঝতে পারত ওদের ধর্মীয় আবেগ নিয়ে কী মারাত্মক ষড়যন্ত্র হয়েছে।

এখানে সে রকম কিছু আইনের উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

১. 'রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার যোগ্যতা' আইনে যে আটটা শর্ত আছে পুরুষ হওয়া তার অন্যতম। 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন', ৩য় খণ্ড ধারা ৯০০।

২. তওবা করলে গণহত্যাকারী, গণধর্ষণকারী, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজকারীদের শাস্তি হবে না। 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন', ১ম খণ্ড ধারা ১৩।

৩. ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে হুদুদ মামলা করা যাবে না। হানাফি আইন পৃষ্ঠা ১৮৮ এবং 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন', ৩য় খণ্ড নং ৯১৪গ।

হুদুদ মামলা হলো খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মদ্যপান, মানহানি ও ইসলাম ত্যাগ।

৪. হুদুদ মামলায় নারী-সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। হানাফি আইন, পৃষ্ঠা ৩৫৩, শাফি'ই আইন ০.২৪.৯, 'ক্রিমিনাল ল ইন ইসলাম অ্যান্ড দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড' পৃষ্ঠা ২৫১, মুহিউদ্দীন খানের অনূদিত 'বাংলা

কোরান' পৃষ্ঠা ২৩৯, 'পেনাল ল অব ইসলাম' পৃষ্ঠা ৪৪, 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন', ১ম খণ্ড ধারা ১৩৩ ও ২য় খণ্ড ধারা ৫৭৬।

৫. হুদুদ মামলায় নারী-বিচারক অবৈধ। 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন', ২য় খণ্ড ধারা ৫৫৪।

৬. (স্বামীর) বৌ-তালাকে সাক্ষ্য শর্ত নহে। 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন', ১ম খণ্ড, ধারা ৩৪৪।

৭. বোবার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১১, ধারা ১৪৯। দাস-দাসী, গায়িকা এবং সমাজের নিচু ব্যক্তির (রাস্তা পরিষ্কারকারী বা শৌচাগারের প্রহরী ইত্যাদি) সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। হানাফি আইন পৃষ্ঠা ৩৬১, শাফি'ই আইন ০.২৪.৩.৩, পেনাল ল অব ইসলাম পৃষ্ঠা ৪৬, 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন', ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৬৩।

৮. কোনো কারণে ধর্ষকের শাস্তি মওকুফ হইলে ধর্ষক ধর্ষিতাকে মোহরের সমান টাকা দেবে। 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন', ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩০১; শাফি'ই আইন এম.৮.১০।

৯. খাবার, বাসস্থান ও পোশাক দিতে স্বামী বাধ্য থাকবে শুধুমাত্র বাধ্য স্ত্রীকে, অবাধ্য স্ত্রীকে নয়। এর বাইরের সব খরচ এমনকি ডাক্তারের, ওষুধের বা সৌন্দর্য-চর্চার খরচ ইত্যাদি হবে স্বামীর করুণা ও দয়া। হানাফি আইন পৃষ্ঠা ১৪০; শাফি'ই আইন এম.১১.৪।

১০. "স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর জিম্মায় ওয়াজিব (বাধ্য), তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ–আহার, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশি কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ, অপরিহার্য নয়।" মুহিউদ্দীন খানের অনূদিত 'বাংলা কোরান', পৃষ্ঠা ৮৬৭। বলা বাহুল্য, স্ত্রী অবাধ্য কি না সেটা ঠিক করবে স্বামী নিজেই।

১১. বাবা-মা, দাদা-দাদি বা নানা-নানি যদি ছেলে-মেয়ে বা নাতি-

নাতনিকে খুন করে তবে খুনির মৃত্যুদণ্ড হবে না। ‘বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন’, ১ম খণ্ড ধারা ৬৫ ক ও খ; শাফি’ই আইন ০.১.২.৪।

১২. হুদুদ মামলায় পারিপার্শ্বিক প্রমাণ চলবে না, চাক্ষুষ সাক্ষী থাকতে হবে–বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ২য় খণ্ড ধারা ৬০০)। এতে মুশকিল হলো, চুরি-ডাকাতি-খুনের চাক্ষুষ সাক্ষী প্রায়ই পাওয়া যায় না, পারিপার্শ্বিক প্রমাণেই অপরাধীর শাস্তি হয়। এ আইন হলে বহু অপরাধীর শাস্তি হবে না।

১৩. তাৎক্ষণিক তালাকের পর স্ত্রী খাবার-বাসস্থান কিছুই পাবে না। সাধারণ তালাকের পর স্ত্রী তিন মাসের জন্য খোরপোশ পাবে। তারপর তারা কোথায় যাবে, কী খাবে তার উল্লেখ নেই। হানাফি আইন, পৃষ্ঠা ১৪৫; শাফি’ই আইন এম.১১.১০, ১ ও ৩, পৃষ্ঠা ৫৪৬।

১৪. “কোনো অমুসলমানকে খুন করার অপরাধে কোনো মুসলমানের মৃত্যুদণ্ড হবে না।” পেনাল ল অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৪৯।

১৫. নিহতের পুত্র ও কন্যা থাকলে খুনিকে মাফ করতে শুধু পুত্ররাই পারে, কন্যারা নয়। ‘শরিয়া দি ইসলামিক ল’, ড. আবদুর রহমান ডোই, পৃষ্ঠা ২৩৫। এর মধ্যে রক্তমূল্যের দাবিও থাকার কথা।

১৬. আত্মীয়ের বাসা থেকে চুরি করলে বা মেজবানের বাসা থেকে মেহমান চুরি করলে তার হুদুদ শাস্তি হবে না। ‘বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন’, ১ম খণ্ড ধারা ১৫৬ ও ১৫৭।

১৭. বিবাহিতা যুদ্ধ-বন্দিনীদের বিয়ে তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে যাবে। শাফি’ই আইন ০.৯.১৩।

১৮. যুদ্ধবন্দিনীদের সঙ্গে দৈহিক সংসর্গ করা (অর্থাৎ ধর্ষণ–লেখক) বৈধ। মওদুদি, তাফহীমুল কুরআন, সুরা নিসা আয়াত ২৪ এর ব্যাখ্যা।

১৯. মদ্যপানের সাক্ষী হতে হবে শুধু দুজন পুরুষ মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্য। মেয়েদের বা পুরুষ-মেয়েদের মিলিত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য

নয়। 'বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন', ১ম খণ্ড ধারা ১৭৪।

২০. স্বামী তার স্ত্রীকে যখন ইচ্ছে তখনই তাৎক্ষণিকভাবে পুরো তালাক দিতে পারবে। কোনো কোনো কেতাবে আছে অত্যাচারের চাপে, নেশার ঘোরে বা হাসি-ঠাট্টাতে 'তালাক' উচ্চারণ করলেও পুরো তালাক হয়ে যাবে। হানাফি আইন পৃষ্ঠা ৮১ ও ৫২৩, শাফি'ই আইন এন.৩.৫, 'বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন', ১ম খণ্ড ধারা ৩৫১, ৩৪৭, ৩৪৯, 'বেহেশতি জেওর' (দ্বীন কি বাতে–মওলানা আশরাফ থানভি) আইন নং ১৫৩৭, ১৫৩৮, ১৫৪৬ ও ২৫৫৫।

২১. "যেকোনো কর্মের বাস্তব সংঘটনই উহাকে অপরাধকর্মে পরিণত করে। বাস্তবে সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো কর্মের জন্য কাহাকেও দায়ী করা যায় না।" 'বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন', ৩য় খণ্ড ধারা ১২৮২।

অর্থাৎ হামলা বা খুন করার আগে জঙ্গিদের বা ডাকাতদের গোপন পরিকল্পনা-বৈঠক বন্ধ করা যাবে না। এ আইন হলে অপরাধীদের পোয়াবারো। কিন্তু অনেক সময়ই গুপ্তচরের সাহায্যে পুলিশ চুরি-ডাকাতি বোমাবাজি-খুন-গণহত্যা-প্লেন-হাইজ্যাকের পরিকল্পনা আগে থেকেই জেনে ফেলে ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে। এতে জনগণের জানমালের সুরক্ষা হয় এবং অপরাধীরা ভয় পায়।

এই শারিয়া আইনগুলো দেখানো হয়েছে প্রধানত– ১. হানাফি আইনের বই 'হেদায়া', যেটা ইংল্যান্ডের ব্যারিস্টারি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত, ২. শাফি আইনের বই 'উমদাত আল সালিক', যেটাকে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় সই ও স্ট্যাম্প দিয়ে সত্যায়িত করেছে, ৩. বি-ই-আ, বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন', ৪. পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শারিয়া সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ড. আবদুর রহমান ডোইয়ে 'শরিয়া দি ইসলামিক ল', ৫. মওলানা মুহিউদ্দীন খানের অনূদিত বাংলা 'কোরান', ৬. 'ক্রিমিনাল ল ইন ইসলাম অ্যান্ড দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড', (৭) 'পেনাল ল অব ইসলাম' ইত্যাদি থেকে।

'বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন' ও মওলানা মুহিউদ্দীন খানের অনূদিত 'বাংলা কোরান' হাতের কাছেই আছে, 'উমদাত আল সালিক' এখন অন লাইনে ফ্রি পাওয়া যায়, আপনারা আইনগুলো মিলিয়ে দেখতে পারেন। হানাফী আইনের বই 'হেদায়া' এখনো অনলাইনে আসেনি।

এখন আপনারাই বলুন এসব আইন দিয়ে কি একটা রাষ্ট্র চালানো সম্ভব? তওবা করলেই গণহত্যাকারী, গণধর্ষণকারীদের শাস্তি হবে না? কেন হবে না? চোখের সামনে খুন-জখম-চুরি-ডাকাতি হবে আর 'নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়'? কেন? কোরান কোথায় নারীর সাক্ষ্য নিষিদ্ধ করেছে? রাসুল (সা.) কোথায় করেছেন? নারীরা বিচারক হতে পারবেন না কেন? স্বামীর কেন অধিকার থাকবে স্ত্রীকে তাৎক্ষণিক তালাক দেওয়ার? কোনো অমুসলমানকে খুন করার অপরাধে কোনো মুসলমানের মৃত্যুদণ্ড হবে না কেন? নারী নেতৃত্ব তো কোরানেই বৈধ করা আছে, মুসলিম-বিশ্বের ইতিহাসেও অন্তত ১২ জন রাণির সফল ও দীর্ঘ শাসন আছে। '(স্বামীর) বৌ-তালাকে সাক্ষ্য শর্ত নহে' কেন? খুলুন কোরান, সুরা ত্বালাক, আয়াত ২: "তোমরা যখন স্ত্রীদিগকে তালাক দিতে চাও তখন দুইজন সাক্ষী রাখিবে।"

শরিয়াতে এ রকম আরও শত শত ইসলামবিরোধী, নারীবিরোধী, মানবতাবিরোধী আইন আছে। জঙ্গিদের উৎসই হলো এসব আইন প্রতিষ্ঠা করার বিভ্রম। এই বিভ্রমের কারণেই কোটি কোটি মুসলিম এমনকি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ইসলামি সংগঠন 'নাহদালতুল উলামা' শরিয়া আইনের কঠিন বিরুদ্ধে। জাতিকে যদি এসব আইন দেখানো যায়, তবে আশা করা যায়, জাতি ওই 'আল্লাহর আইন'-এর বিভ্রম থেকে বেরিয়ে আসবে, জঙ্গিপনার শিকড় উচ্ছেদ হবে। বিষবৃক্ষের শিকড় অক্ষত রেখে ডালপালা কেটে লাভ নেই। কারণ ওই শিকড় থেকে আবার ডালপালা গজাবে।

সূত্রবিশেষে আইনের কিছু পার্থক্য দেখা যায়, কারো দরকার হলে শারিয়া বইয়ের আইনগুলোর পৃষ্ঠার ছবি পাঠানো যেতে পারে।

১২ এপ্রিল, ২০১৭

মুরতাদ হত্যার পক্ষে-বিপক্ষে

মুরতাদ দুরকমের– ফিতরি ও মিলি। ফিতরি– ফিতরা মানে স্বভাবজ। স্বাভাবিকভাবে মুসলিম হয়ে জন্মে ইসলাম ছেড়ে দিলে হয় 'মুরতাদ ফিতরি'। 'মুরতাদ মিলি' হলো সে, যে অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করে তারপর ইসলাম ছেড়ে দেয়। এ নিবন্ধে আমরা দেখব এ ব্যাপারে ১. শারিয়া আইন কী বলে; ২. কোরান কী বলে; ৩. রাসুল (সা.) কী করেছেন; ৪. মওলানা মওদুদি (ও অন্যদের) মুরতাদ হত্যা সমর্থন কতটা বৈধ; ৫. অন্য বিশেষজ্ঞেরা কী বলেন এবং ৬. বাস্তবে কী ঘটেছে ও ঘটছে।

১. শারিয়া আইন

- শারিয়া আইনে মুরতাদকে তিন দিন সময় দেওয়া হয় তওবা করে ইসলামে ফিরে আসতে। সে তা না করলে মৃত্যুদণ্ড। (বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খণ্ড, ধারা ১২৭৬, শাফি ল' ও.৮.২ ইত্যাদি)
- শারিয়ার অন্য একটি ভয়ানক আইন হলো মুরতাদকে যে কেউ যে কোনো জায়গায় খুন করতে পারে, তাতে খুনির মৃত্যুদণ্ড হবে না। (বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড, ধারা ৭২, শাফি ল' ও.৫.৪ ইত্যাদি)

অর্থাৎ কোনো ধর্মান্ধ কাউকে মুরতাদ ঘোষণা করলে তাকে খুন করতে অন্য ধর্মান্ধকে উৎসাহিত করা হয়। মুসলিম বিশ্বে এমন ঘটনা ঘটেছে এবং খুনির শাস্তি হয়নি।

- হানাফি আইনে নারী মুরতাদের আজীবন কারাবাস। (হেদায়া, পৃষ্ঠা ১৪৬)
- মুরতাদের বিয়ে, সাক্ষ্য ও উত্তরাধিকার বাতিল হয়ে যায়।

২. কোরান

- বিশ্বাসের স্বাধীনতা দেওয়া আছে।

সুরা ইউনুস ৯৯– "তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে ইমান আনিবার জন্য?"

কাহ্‌ফ ২৯– "যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।"

নিসা ৮০– "আর যে লোক বিমুখ হইল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ!) তাহাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করি নাই।"

বাকারা ২৫৬– "ধর্মে জোর-জবরদস্তি নাই।" ইত্যাদি প্রায় ৩০টি আয়াত।

- মুরতাদের ওপরে কোরানে বেশ কিছু আয়াত আছে, কিন্তু কোরানের কোথাও খুন করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। বরং এর ভেতরে মানুষের নাক গলানো নিষেধ করা আছে। যেমন: বাকারা ২১৭, ইমরান ৮২, ৮৬, ১০৬, নাহল ১০৬, মুনাফিকুন ৩, তওবা ৬৬ ও ৭৪, নিসা ৯৪, ও নিসা ১৩৭–"যাহারা একবার মুসলমান হইয়া পরে আবার কাফের হইয়া গিয়াছে, আবার মুসলমান হইয়াছে এবং আবার কাফের হইয়াছে এবং কুফরিতেই উন্নতি লাভ করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদের না কখনো ক্ষমা করিবেন, না পথ দেখাইবেন।"

অর্থাৎ কোরান সুস্পষ্ট ভাষায় মুরতাদকে ইসলামে ফিরে আসার সুযোগ ও অধিকার দিয়েছে, তাকে খুন করলে সেই খুন সরাসরি কোরান লঙ্ঘন হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে কোরানের আরেকটা স্পষ্ট নির্দেশ আছে সুরা ইমরানের ৮৬ নম্বর আয়াতে। হারিথ নামে এক মুসলমান মুরতাদ হলে তার ওপর নাজিল হয়েছিল এ আয়াত:

"কেমন করে আল্লাহ এমন জাতীকে হেদায়েত দেবেন যারা ইমান আনার পর ও রাসুলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেওয়ার পরও তাদের কাছে প্রমাণ আসার পর কাফের হয়েছে?"

রাসুল (সা.) তাকে মৃত্যুদণ্ড কেন, কোনো শাস্তিই দেননি। (সিরাত–ইবনে হিশাম-ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ৩৮৪)

৩. রাসুল (সা.):

- বহু বিষয়ের মতো এ ব্যাপারেও পক্ষে-বিপক্ষে হাদিস আছে। কিন্তু সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে মুরতাদ হত্যার নাম ও ঘটনার বিবরণ নেই। আছে শুধু "রাসুল (সা.) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ধর্মত্যাগ করে তাহাকে হত্যা করো"– এই ধরনের বায়বীয় কথা। (বুখারি ২৮৫৪ নং হাদিস, মওলানা আবদুল জলিলের অনুবাদ)

পক্ষান্তরে, রাসুল (সা.) বিভিন্ন অপরাধে অনেক অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু কাউকে তিনি শুধু ইসলাম ত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ড তো দূরের কথা কোনো শাস্তিই দেননি। বরং তাঁর জীবনেই আমরা অন্তত চারজন মুরতাদের বিস্তারিত বিবরণ পাই যাদের তিনি কোনো শাস্তি দেননি। উদাহরণ দিচ্ছি:

- রাসুলের (সা.) ওহি-লেখক আবদুল্লা বিন সা'আদ মুরতাদ হয়ে মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিল এবং পরে ধরা পড়েছিলেন। (সিরাত–ইবনে হিশাম-ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ৫৫০)। হজরত ওসমান (রা.) পরে তাকে মিসরের গভর্নর করেছিলেন।

- হারিথ-এর ঘটনা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে– সিরাত–ইবনে হিশাম-ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ৩৮৪, সুরা ইমরান ৮৬ নম্বর আয়াতের পটভূমি হিসেবে।

- উবায়দুল্লাহ– সিরাত–ইবনে হিশাম-ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ৫২৭

- সহি বুখারি ৯ম খণ্ড হাদিস নং ৩১৮– জাবির বিন আবদুল্লা বলেন, এক বেদুইন আল্লাহর রাসুলের (সা.) কাছে বায়াত গ্রহণ করিল। পরে মদিনায় তাহার জ্বর হইলে সে আল্লাহর রাসুলের (সা.) নিকট আসিয়া বলিল, 'হে আল্লাহর রাসুল (সা.), আমার বায়াত ফিরাইয়া

দিন।' রাসুল (সা.) সম্মত হইলেন না। তারপর সে আবার আসিয়া বলিল, 'হে আল্লাহর রাসুল (সা.), আমার বায়াত ফিরাইয়া দিন।' রাসুল (সা.) সম্মত হইলেন না। তারপর সে আবার আসিয়া বলিল, 'হে আল্লাহর রাসুল (সা.), আমার বায়াত ফিরাইয়া দিন।' রাসুল (সা.) সম্মত হইলেন না। তারপর সে মদিনা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ইহাতে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলিলেন, "মদিনা একটি উনুনের মতো–ইহা ভেজালকে বাহির করিয়া দেয় এবং ভালোকে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করে।"

৪. মওলানা মওদুদি

মুরতাদকে হত্যার সমর্থনে নামকরা বই হলো মওলানা মওদুদির 'দ্য পানিশমেন্ট অব দ্য অ্যাপোস্টেট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইসলামিক ল'। এ বইতে মওদুদি বলেছেন, "কোরান ও সুন্নাহ এ ব্যাপারে বিশেষ ব্যাখ্যা দেয় না।"

কথাটা ঠিক নয়, ওপরে কোরান-রাসুলের (সা.) স্পষ্ট উদাহরণ দেখানো আছে। তিনি সুরা তওবার আয়াত ১১ ও ১২-এর উদ্ধৃতি দিয়ে দাবি করেছেন, ওখানে মুরতাদ হত্যার বিধান আছে। আয়াত দুটো হলো, "যদি প্রতিশ্রুতির পর তাহারা তাহাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে তবে কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ ইহাদের কোনো শপথ নাই যাহাতে তাহারা ফিরিয়া আসে।"

মওদুদি বলেছেন, "এখানে 'শপথ ভঙ্গ' কোনোমতেই রাজনৈতিক চুক্তি হইতে পারে না। বরং ইহার পটভূমি নির্দেশ করে যে, ইহার অর্থ 'ইসলাম গ্রহণ ও পরে ইসলাম ত্যাগ করা'।"

কেন 'শপথ ভঙ্গ' কোনোমতেই রাজনৈতিক চুক্তি হইতে পারে না? অবশ্যই হতে পারে। সুরা তওবার ওই আয়াতে মুরতাদের নামগন্ধও নেই। এর পটভূমি হলো মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে যুদ্ধবিরতি, যুদ্ধ-চুক্তিভঙ্গ ও যুদ্ধচুক্তি বাতিল। এ পটভূমি ধরা আছে ইসলামের সবচেয়ে

নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোতে এবং বহু ইসলামি ওয়েবসাইটেও। তবে উদ্ধৃতি দিচ্ছি মওলানা মুহিউদ্দিনের অনুবাদ করা বাংলা কোরান থেকে যেন সবার পক্ষে মিলিয়ে নিতে সুবিধে হয়। ৫৫৩ ও ৫৫৬ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি:

"সুরা তওবার সর্বত্র কতিপয় যুদ্ধ, যুদ্ধ-সংক্রান্ত ঘটনাবলি এবং এ-প্রসঙ্গে অনেকগুলো হুকুম-আহাকাম ও মাসায়েলের বর্ণনা রয়েছে।...হোদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায়, যাতে ছিল দশ বছরকাল যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি... এখানে (১১ নং আয়াতে) বলা হয় যে, কাফেররা যত শত্রুতা করুক, যত নিপীড়ন চালাক, যখন সে মুসলমান হয় তখন আল্লাহ (যেমন) তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করেন...আলোচ্য দ্বাদশ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, এরা যদি চুক্তি সম্পাদনের পর শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ইসলামও গ্রহণ না করে, অধিকন্তু ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তবে সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করো।"

মওদুদি মুরতাদ হত্যার সমর্থনে টানার চেষ্টা করেছেন সুরা নিসাও (আয়াত ৮০)। কিন্তু মওদুদির বোধহয় মনে নেই যে, তিনি নিজেই তাঁর তফহিমুল কুরানে সুরা নিসার ৮০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "নবীজির প্রতি দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে শুধু আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ লোকদের কাছে পৌঁছানো এবং তিনি তাহাতে ভালোভাবেই সফল হইয়াছেন। তাহাদিগকে সত্যপথে বাধ্য করা তাঁহার দায়িত্ব ছিল না।"

এবারে মওদুদি নির্ভর করেছেন হজরত আবু বকরের (রা.) ওপর। তিনি বলেছেন, "দূরের কিছু গোত্র মুরতাদ হয়েছিল এবং হজরত আবু বকর সৈন্য পাঠিয়ে তাদের পরাজিত করেছেন।"

মওদুদি হজরত আবু বকরের (রা.) চিঠি উল্লেখ করে বলেছেন, হজরত আবু বকর নাকি তাঁর সিপাহসালারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'ইসলাম কবুল না করলে কাউকে জীবন্ত ছাড়বে না, আগুন তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে এবং তাদের নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস বানিয়ে রাখবে।"

তাহলে কোথায় গেল বাকারা ২৫৬: "ধর্মে জোর-জবরদস্তি নাই"?

নবীজির (সা.) ওফাতের পর স্বভাবতই কিছু বিশৃঙ্খলা হয়েছিল। কেউ

কেউ নবীত্ব দাবি করে বসল, তাদের কিছু ‘সাহাবি’ও গজাল। তবে প্রধান কারণ হলো, কিছু গোত্র মনে করত রাসুলের (সা.) গাদির-এ-খুম মাঠের বক্তৃতা ও অন্যান্য বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত আলীর (রা.) প্রথম খলিফা হওয়ার কথা। তখন জাকাত সরকারি বায়তুল মালে জমা হতো। তারা হজরত আবু বকরের (রা.) সরকারকে অবৈধ সরকার মনে করে জাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, ইসলাম ত্যাগ করেনি। হজরত আবু বকরের (রা.) এ যুদ্ধ ছিল রাজনৈতিক, সরকারপ্রধান হিসেবে তিনি সরকারবিরোধীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন।

[সূত্র: বিখ্যাত লেখক আলী আবদুল রাজিকের ‘ইসলাম অ্যান্ড দ্য ফান্ডামেন্টালস অব অথরিটি’ (‘Islam and the fundamentals of authority›; a studz of the Caliphate and government in Islam, পৃষ্ঠা ৫২০)]

এবারে মওদুদি সমর্থন নেওয়ার চেষ্টা করেছেন অতীতের ইমামদের থেকে। হ্যাঁ, প্রায় প্রত্যেক শারিয়া-ইমামই মুরতাদ হত্যার পক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্তু আমরা সেটা প্রত্যাখ্যান করি কোরানের ভিত্তিতে। আসল কথাটা হলো, পরকীয়ার প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের মতো মুরতাদ হত্যার আইনও এসেছে ইহুদি কিতাব ‘ডিউটেরনমি’ থেকে। উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

“(যদি কেহ) বলে ‘চলো আমরা অন্য স্রষ্টাকে সেবা করি’, তবে তোমরা নিশ্চয় তাহাকে হত্যা করিবে... তাহাকে প্রস্তরের আঘাতে হত্যা করিবে...” ইত্যাদি।

৫. অন্যান্য সূত্র

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, মূল শব্দটা হলো ‘রাদ্’। এর সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দগুলো ইরতাদা, রিদ্দা এবং মুরতাদ সবই হলো স্বকর্ম। নিজে থেকে না বললে বা না করলে বাইরে থেকে কেউ কাউকে স্বকর্ম করাতে পারে না। যেমন আত্মহত্যা যে করে সে-ই করতে পারে, অন্যেরা খুন করতে পারে কিন্তু কাউকে আত্মহত্যা করাতে পারে না। ঠিক তেমনি মুরতাদও নিজে ঘোষণা করতে হয়, অন্য কেউ করিয়ে দিতে পারে না। চিরকাল বহু সুফি-দরবেশ ও ইসলামি বিশেষজ্ঞ এর বিরুদ্ধে প্রবল

প্রতিবাদ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন:

- ড. ইউসুফ কারজাভি (দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ মার্চ ২০০৬ ও দৈনিক ইনকিলাব, ১৪ এপ্রিল ২০০৬)
- ইউরোপিয়ান ফতোয়া ও গবেষণা কাউন্সিলের সদস্য ড. জামাল বাদাওয়ী
- আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা কানাডার মওলানা মুবিন শেখ

আমাদের বাংলাদেশে শরিয়ার তাত্ত্বিক গুরু প্রাক্তন সচিব জনাব শাহ আবদুল হান্নান বলেছেন:

"অতীতের অনেক ইসলামি বিশেষজ্ঞের মতে সৈয়দ মওদুদি প্রাচীন মতে (অর্থাৎ মুরতাদের মৃত্যুদণ্ডে–লেখক) বিশ্বাস করিতেন। বর্তমানের বেশির ভাগ ইসলামি বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ে তাঁহার সহিত বা প্রাচীন বিশেষজ্ঞের সহিত একমত নহেন। যখন কোনো বিষয়ে মতভেদ হয় বা একাধিক মতামত হয় তখন কোনো একজন বিশেষজ্ঞের ইজতিহাদকে মানিতে কেহ বাধ্য নহে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই বিষয়ে সৈয়দ মওদুদির সহিত একমত নহি।" (ইন্টারনেট, বাংলার নারী আলোচনা ফোরাম–৭ এপ্রিল ২০০৬)

৬. বাস্তবতা

প্রতিপক্ষকে (রাজনৈতিক, সামরিক বা অন্যান্য) মুরতাদ ঘোষণা করে খুন, হেনস্তা বা দেশছাড়া করার ঘটনায় মুসলিম ইতিহাসে ভর্তি। পাকিস্তানে এটা হরহামেশাই হয়। অথচ অটোমান খলিফার আমলে মুরতাদ হত্যা এবং আরও কিছু শারিয়া আইন কয়েক শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছিল। (Research of Quiliam foundation, UK.)

১৭২৮ সালের অটোমান খলিফার আমলে শারিয়া-কোর্টের সিসিল দলিলের 'শিকায়তে দফতরি'তে আমরা দেখি, জয়নাবের স্বামী ইব্রাহীম

ইসলাম ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসকে অভিশাপ দিয়েছে, কাজেই সে মুরতাদ হয়ে গেছে। দুজন সাক্ষী দ্বারা এটা প্রমাণিত হলে কোর্ট ইব্রাহীমকে হত্যার রায় না দিয়ে শুধু বিয়ে বাতিলের রায় দিয়েছে (উইমেন, দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড ডিভোর্স লজ ইন ইসলামিক হিস্ট্রি: ড. আমিরা আজহারী সনবল, পৃষ্ঠা ১১৯)

মধ্যপ্রাচ্যের তেল ও মুসলিম বিশ্বের স্বাধীনতার পরে এসব বর্বর আইন আবার ফিরে এসেছে।

উপসংহার

মওলানারা কোনো মুরতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন বলে আমার জানা নেই। সেটা উপেক্ষা করলেই তো "লা ইকরাহা ফিদ্বীন" বা "ধর্মে জবরদস্তি নেই"-এর মর্যাদা রক্ষা হয়! এ মর্যাদা নবীজি (সা.) কীভাবে রক্ষা করেছেন, তা দিয়ে শেষ করছি।

"উসামা বিন জায়েদ বলিয়াছে, 'যখন আমি ও এক আনসার তাহাকে (মিরদাস বিন নাহিক নামে এক অমুসলিমকে যার গোত্রের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ চলছিল–লেখক) আমাদের অস্ত্র দিয়া আক্রমণ করিয়া পাকড়াও করিলাম তখন সে কলমা উচ্চারণ করিল। কিন্তু আমরা থামিলাম না এবং তাহাকে হত্যা করিলাম।' রাসুলের (সা.) নিকট আসিয়া আমরা এই ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, 'কলমার দায় হইতে কে তোমাকে রক্ষা করিবে, উসামা?' আমি বলিলাম, 'লোকটি শুধু মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য কলমা উচ্চারণ করিয়াছে।' কিন্তু তিনি প্রশ্নটি করিতেই থাকিলেন এবং করিতেই থাকিলেন। তখন আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম এবং বলিলাম আমি আর কখনোই তাহাকে খুন করিব না যে কলমা উচ্চারণ করিয়াছে। তিনি বলিলেন, 'আমার (মৃত্যুর) পরেও তুমি এই কথা বলিবে তো?' আমি বলিলাম, 'বলিব'।" (ইবনে হিশাম-ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ৬৬৭)

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যেকোনো উদ্দেশ্যেই হোক না কেন যদি কলমা উচ্চারণ করে, তাকে হত্যা করার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি।

কলমার দায় বড় দায়, কলমার অপমান ইসলামের অপমান! ইমাম হাম্বলের মসনদ ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৬০-র উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায় রাসুলের (সা.) তীক্ষ্ণ প্রশ্ন: "তুমি কি তাহার বক্ষ চিরিয়া দেখিয়াছ?"

(বহু হাদিসের সূত্রে ড. ত্বাহা জাবির আল আলওয়ানী–'দ্য এথিকস অব ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট ইন ইসলাম')

ইসলাম কোনো 'ইঁদুর মারার কল' নয় যে, এতে ঢোকা যাবে কিন্তু বেরোনো যাবে না। হুংকারী মাওলানারা ভুলে যান যে কাউকে মুরতাদ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর হত্যার হুমকি এসে পড়ে। অনেকে খুনও হয়, বিধবা আর এতিমের বুকফাটা আর্তনাদে কেঁপে ওঠে আল্লাহর আরশ। তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, রাসুল (সা.)-এর বড় বেদনা, বড় কষ্টের সেই উচ্চারণ:

"তুমি কি তাহার বক্ষ চিরিয়া দেখিয়াছ?"

৬ মার্চ, ২০১৭

মূর্তি বিড়ম্বনার ইসলামি আঙ্গিক

(২০১৬ সালে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে ন্যায়বিচারের গ্রিক দেবী থেমিসের আদলে গড়া একটা ভাস্কর্য বসানো হয়েছিল। পরে হেফাজতে ইসলামসহ ইসলামপন্থী দলের দাবির মুখে ভাস্কর্যটি সরিয়ে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে এনেক্স ভবনের পেছন দিকে রাখা হয়েছিল। এর পক্ষে-বিপক্ষে দেশে আলোচনা ও সমালোচনার তুমুল ঝড় বয়ে যায়)।

দেশে মূর্তি ও ভাস্কর্য নিয়ে উত্তেজনা চলছে। বিষয়টির সঙ্গে হেফাজতিরা ইসলামকে জড়িয়ে ফেলেছে। তাই চলুন আমরা সূত্র ধরে দেখি এ ব্যাপারে কোরান, হাদিস, সিরাত (ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাক), তারিখ আল তারারি ও অন্যান্য দলিল কী বলে।

প্রথমেই তিনটে শব্দ বুঝে নেওয়া যাক: প্রতিমা, ভাস্কর্য ও মূর্তি। প্রতিমা হলো মানুষ যার আরাধনা উপাসনা করে, ইহকালে-পরকালে মঙ্গল চায়, ভুলের ক্ষমা চায় ইত্যাদি। ভাস্কর্য হলো মানুষসহ কোনো প্রাণী বা কোনো কিছুর মূর্তি যাকে মানুষ রাখে সম্মান দেখতে বা সৌন্দর্য বর্ধন করতে, মানুষ যার আরাধনা বা উপাসনা করে না। এবারে অন্যান্য দলিলের দিকে তাকানো যাক, সেখানে আমরা দেখব হজরত মুহাম্মদের (সা.) বাড়িতে মূর্তি ছিল তাঁর সম্মতিক্রমেই। সব দলিলের শেষে আমরা কোরানে যাব এবং দেখতে পাব আল্লাহর নির্দেশেই এক পয়গম্বরের প্রাসাদে ভাস্কর্য ছিল।

কোরানে যাওয়ার আগে প্রথমেই হাদিস ও অন্যান্য দলিল। কাবাতে রাসূল (সা.) লাত, মানাত, উজ্জা, হোবল, ওয়াদ ইত্যাদির প্রতিমা ভেঙেছিলেন, এগুলোর আরাধনা করা হতো বলে। ভাস্কর্য ও মূর্তির বিপক্ষে কিছু হাদিস আছে, কিন্তু সাধারণত বিপক্ষের দলিলে আমরা ব্যক্তির নাম ও ঘটনার বিবরণ পাই না, যা পক্ষের হাদিসগুলোতে পাই। পার্থক্যটা গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) সহি বুখারি ৮ম খণ্ড হাদিস ১৫১:

আয়েশা বলিয়াছেন, আমি রাসুলের (সা.) উপস্থিতিতে পুতুলগুলি লইয়া

খেলিতাম এবং আমার বান্ধবীরাও আমার সহিত খেলিত। যখন আল্লাহর রাসুল (সা.) আমার খেলাঘরে প্রবেশ করিতেন, তাহারা লুকাইয়া যাইত, কিন্তু রাসুল (সা.) তাহাদিগকে ডাকিয়া আমার সহিত খেলিতে বলিতেন।

(খ) সহি আবু দাউদ বুক ৪১ হাদিস নং ৪৯১৪:

বিশ্বাসীদের মাতা আয়েশা (রা.) বলিয়াছেন, যখন আল্লাহর রাসুল (সা.) তাবুক অথবা খাইবার যুদ্ধ হইতে ফিরিলেন তখন বাতাসে তাঁহার কক্ষের সামনের পর্দা সরিয়ে গেলে তাঁহার কিছু পুতুল দেখা গেল। তিনি [(রাসুল (সা.)] বলিলেন, "এইগুলি কী?" তিনি বলিলেন, "আমার পুতুল।" ওইগুলির মধ্যে তিনি দেখিলেন একটি ঘোড়া যাহার ডানা কাপড় দিয়া বানানো হইয়াছে এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি যাহা উহার উপর রহিয়াছে?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "দুইটি ডানা।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডানাওয়ালা ঘোড়া?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "আপনি কি শোনেননি যে সুলেমানের ডানাওয়ালা ঘোড়া ছিল?" তিনি বলিয়েছেন, ইহাতে আল্লাহর রাসুল (সা.) এমন অট্টহাসি হাসিলেন যে আমি উনার মাড়ির দাঁত দেখিতে পাইলাম।"

(গ) সহি মুসলিম–বুক ০০৮, নং ৩৩১১:

আয়েশা (রা.) বলিয়াছেন যে আল্লাহর রাসুল (সা.) তাঁহাকে সাত বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন (যদিও অন্য রেওয়াতে আমরা পাই ছয় বছর: হাসান মাহমুদ) এবং তাঁহাকে নয় বৎসর বয়সে কনে হিসেবে তাঁহার বাসায় লইয়া যাওয়া হয়, এবং তাঁহার পুতুলগুলি তাঁহার সাথে ছিল এবং যখন তিনি দেহত্যাগ করিলেন তখন তাঁহার বয়স ছিল আঠারো।

(ঘ) সহি মুসলিম–বুক ০৩১ নং ৫৯৮১:

আয়েশা (রা.) বলিয়াছেন যে তিনি আল্লাহর রাসুলের (সা.) উপস্থিতিতে পুতুল লইয়া খেলিতেন এবং যখন তাঁহার সঙ্গিনীরা তাঁহার কাছে আসিত তখন তাঁহারা চলিয়া যাইত। কারণ তাঁহারা আল্লাহর রাসুলের (সা.) জন্য লজ্জা পাইত। যদিও আল্লাহর রাসুল (সা.) তাহাদিগকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিতেন।

সহি বুখারির ব্যাখ্যা শুনুন। হাদিসটার ফুটনোটে 'ফতহুল বারি'র লেখক ইমাম ইবনে হাজার আসকালানীর উদ্ধৃতি: "পুতুল ও একই রকম ইমেজ অবৈধ কিন্তু ইহা বৈধ করা হইয়াছিল তখন আয়েশার (রা.) জন্য। কারণ তিনি ছিলেন ছোট বালিকা, তখনও তিনি বয়স্কা হননি।" (ফতহুল বারি, পৃষ্ঠা ১৪৩, ১৩ খণ্ড)

নবী (সা.) পুতুল বৈধ করেছিলেন এটাই আসল কথা। কী কারণে করেছিলেন, সেটা ইমামের জানা সম্ভব নয়। কারণ তিনি রাসুলের (সা.) ৮০০ বছর পরের হাজার মাইল দূরে মিসরের লোক, রাসুলের (সা.) সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়নি, কথাও হয়নি। ওটা তাঁর ব্যক্তিগত মত মাত্র।

এবারে আরও কিছু সংশ্লিষ্ট দলিল।

তখন কাবার দেয়ালে ৩৬০টি মূর্তি (বুখারি ৩য় খণ্ড–৬৫৮) ও অনেক ছবির সঙ্গে ছিল হজরত ঈসা (আ.) ও মাতা মেরির ছবিও। উদ্ধৃতি দিচ্ছি, "রাসুল (সা.) হজরত ঈসা (আ.) ও মাতা মেরির ছবি বাদে বাকি সব ছবি মুছিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলেন।" (সিরাত (ইবনে হিশাম/ইবনে ইশাক-এর পৃষ্ঠা ৫৫২) এবারে সাহাবি ও খলিফারা।

দুনিয়ার প্রায় এক-চতুর্থাংশ জয় করেছিলেন মুসলিমরা। সবই অমুসলিমের দেশ এবং সেখানেও নিশ্চয়ই অনেক প্রতিমা-ভাস্কর্য ছিল, সেগুলোর তো সবই ভেঙে দেওয়ার কথা। কিন্তু সেখানেও আমরা তেমন দলিল পাই না। ৭১০ সালে হিন্দু রাজা দাহিরের দেশ সিন্ধু জয় করার পর কয়টা মূর্তি ভেঙেছিলেন মুহম্মদ বিন কাশেম? ভাস্কর্য-মূর্তি তো দূরের কথা কোনো প্রতিমাও ভেঙেছেন বলে জানা যায় না।

রাসুলের (সা.) অজস্র ছবি স্বচক্ষে দেখতে চাইলে ইরানে চলে যান। দেখবেন দেয়ালে ঝুলানো সুদৃশ্য কার্পেটে আছে মা আমিনার কোলে শিশু নবী (সা.), সাহাবি পরিবেষ্টিত নবীজি (সা.), আসমানে বোরাখে উপবিষ্ট নবীজি (সা.) ইত্যাদি।

গুগল করলেই পেয়ে যাবেন– সবই কাল্পনিক ছবি অবশ্য– হাজার বছর ধরে আছে ওগুলো। ইরান এখন তো শিয়া দেশ, কিন্তু ৭৫০ সালে

আব্বাসিরা দখল করার আগে পর্যন্ত ওটা সুন্নি উমাইয়াদের রাজত্ব ছিল।

এবারে সাম্প্রতিক কাল। ছবি তো ছবি, নবীজির (সা.) আট ফুট উঁচু, ১০০০ পাউন্ড ওজনের মার্বেল পাথরের ভাস্কর্যও ছিল দীর্ঘ ৫৩ বছর। ১৯০২ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ২৫ নং স্ট্রিট ম্যাডিসন এভিনিউতে অবস্থিত ম্যাডিসন পার্কের মুখোমুখি নিউইয়র্ক আপিল বিভাগের কোর্ট দালানের ছাদে। ইতিহাসের আরও নয়জন আইনদাতাদের সঙ্গে নবীজির (সা.) আট ফুট উঁচু মার্বেল পাথরের ভাস্কর্যও রাখা ছিল সসম্মানে।

গুগলে ‘এ স্ট্যাচু অব মুহাম্মদ’ সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন। মুসলিম সমাজ ও দেশগুলোর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ওটা সরানো হয়েছে। এখন ইতিহাসের বাকি নয়জন আইনদাতার ভাস্কর্য রাখা আছে। কোর্টের ভেতরের দেয়ালে ওই দশজনের সঙ্গে তাঁর ভাস্কর্য এখনো আছে কি না জানি না। ওটার ছবি এখনো আছে কি না জানি না।

কোরান-রাসুল (সা.)-সাহাবি-খলিফা-সাম্প্রতিক কাল তো অনেক হলো, মধ্যপ্রাচ্যের কী খবর? হাঙ্গামা করার আগে বাংলাদেশের ইমামদের ভেবে দেখা দরকার কেন মধ্যপ্রাচ্যের ইমামেরা ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে নন। সৌদি আরবেও বহু ভাস্কর্য আছে। গুগল করুন ‘স্ট্যাচু ইন মুসলিম ওয়ার্ল্ড’ কিংবা ‘স্ট্যাচু ইন সৌদি আরব’–রাস্তার মোড়ে মোড়ে উটের, কবজি থেকে হাতের আঙুলের, মুসলিম বীরদের এবং আরও কত ভাস্কর্য। সেখানকার মওলানারা জানেন কোরান ও রাসুল (সা.) সুস্পষ্টভাবে প্রতিমাকে নিষিদ্ধ করে মূর্তি ও ভাস্কর্যকে বৈধ করেছেন। তাই তাঁরা মুসলিম বিশ্বে অজস্র মূর্তি ও ভাস্কর্যকে অস্বীকৃতি জানাননি।

এবারে কোরান। কোরানে সুস্পষ্ট বলা আছে: (ক.) মূর্তিপূজা শয়তানের কাজ (মায়েদা ৯০) এবং (খ.) “এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ?” (আম্বিয়া ৫২)।

অর্থাৎ কোরানের নিষেধ মূর্তিপূজা, উপাসনা-আরাধনা-ইবাদত সম্পর্কে। কারণ, মূর্তি স্রষ্টার অংশীদার অর্থাৎ শরিক হয়ে দাঁড়ায়। এটাই মানুষকে মুশরিক বানায়। তাহলে যে মূর্তিকে আরাধনা-ইবাদত করা হয় না, যে

মূর্তি সৌন্দর্য বাড়ায়, সুসজ্জিত করে সে ব্যাপারে কোরান কী বলে? এখানে আমরা অবাক হয়ে দেখব কোরান সুস্পষ্ট ভাষায় ভাস্কর্যের অনুমতি দেয়। উদ্ধৃতি:

"তারা সোলায়মানের (আ.) ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউজসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত।" (সুরা সাবা, আয়াত ১৩)

নবীজি (সা.) মূর্তি-ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে সেটা কোরানের ওই আয়াতের বিরুদ্ধে যেত, সেটা সম্ভব নয়। আরাধনা করলে সেটা হয় প্রতিমা আর না করলে হয় ভাস্কর্য (মূর্তি)। ইসলাম প্রতিমার বিরুদ্ধে, ভাস্কর্য ও মূর্তির বিরুদ্ধে নয়।

আদি থেকে মানুষ স্রষ্টা খুঁজেছে, সূর্য-চন্দ্র থেকে শুরু করে পশু-পাখিকে, এমনকি নিজেরাই মূর্তি বানিয়ে আরাধনা করেছে। যে হজরত মুসা (আ.) মানুষকে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম স্রষ্টার দিকে ডেকেছেন তাঁর বিশ্বাসীরা বাছুরের মূর্তির আরাধনা করেছে। যে ঈসা (আ.) মানুষকে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম স্রষ্টার দিকে ডেকেছেন তাঁর বিশ্বাসীরা তাঁর তো বটেই, তাঁর মায়েরও (মাতা মেরি) মূর্তি বানিয়ে আরাধনা শুরু করেছে। যে গৌতম বুদ্ধ স্রষ্টার ধারণা ত্যাগ করে কর্মফলের কথা বলেছেন, তাঁর অনুসারীরা তাঁর মূর্তি বানিয়ে আরাধনা শুরু করেছে। এখানেই ইসলামের আপত্তি: ইসলাম আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক বা অংশীদার করার ঘোর বিপক্ষে।

তাই হয়তো অতীত-বর্তমানের কিছু ইমাম সরাসরি মূর্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, প্রতিমা ও ভাস্কর্যের পার্থক্য উপেক্ষা করছেন। ইমামেরা প্রতিমার বিরুদ্ধে বলুন অসুবিধা নেই, কিন্তু ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে সেটা কোরান-রাসুলের (সা.) বিরুদ্ধে দাঁড়ানো হয় কি না, তাঁরা ভেবে দেখতে পারেন।

(সংযোজন : "তুরস্কের রাজধানী আংকারায় বঙ্গবন্ধু ব্যুলভার্ড নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি আবক্ষ ভাস্কর্য

শিগগিরই স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর বিপরীতে তুর্কি কর্তৃপক্ষও তাদের নেতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের একটি আবক্ষ ভাস্কর্য ঢাকাস্থ আতাতুর্ক অ্যাভিনিউয়ে স্থাপন করবে। এ বিষয়ে গত সোমবার দুই দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং এটি শিগগিরই করা হবে বলে দু'পক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়”–বাংলা ট্রিবিউন, ২২ মে ২০১৯)।

২৩ *ফেব্রুয়ারি*, ২০১৭

ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড, মুসলিম-প্রতিক্রিয়া, বাক-স্বাধীনতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড চিরকালই হয়েছে, এ ব্যাপারে কোরান-রাসুলে আমরা যাব একটু পরেই। ১৯২৪ সালে পাঞ্জাবে নামহীন লেখকের "রঙ্গীলা রসুল"-এর প্রকাশক রাজপালের বিরুদ্ধে মামলায় সে খালাস পায় কারণ তখন কোনো ব্ল্যাসফেমি আইন ছিল না। কিন্তু তাকে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলেছিল ইলুমিদ্দীন। সাম্প্রতিক কালে সালমান রুশদীর বই "স্যাটানিক ভার্সেস লেখার কারণে আয়াতুল্লাহ খোমেনী'র খুনের ফতোয়ার শিকার হয়ে সে আত্মগোপন করে বেঁচে আছে। এর পরে এখন বেরিয়েছে অনেক ইসলামবিরোধী বই—অল্প কিছু বই যৌক্তিক প্রশ্ন তুলেছে কিন্তু বেশির ভাগই ইসলামের প্রতি ঘৃণা থেকে লেখা। তবে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে ডেনমার্কের নবীর কার্টুন, হল্যান্ডের "ফিতনা" নামে ছায়াছবি আর এখন আমেরিকার ছায়াছবি "ইনোসেন্স অব মুসলিমস"। যে ওটা বানিয়েছে সে একটা রেকর্ডেড ক্রিমিনাল, মিসরীয় কপটিক খ্রিস্টান। খুব সম্ভব সে প্রতিহিংসায় এ কাজ করেছে। শত শত বছর ধরে ওখানে মৌলবাদী মুসলমানেরা ওদের ওপর যে অত্যাচার করেছে এবং এখনো করছে তা অকল্পনীয়। এই সেদিনও মুবারক হটাও আন্দোলনের সময়ও ওদের প্রায় ৬০০ চার্চ ধ্বংস হয়েছে। কী হতো যদি কোনো দেশে আমাদের ৬০০ মসজিদ ধ্বংস হতো? ওদের ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সবই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, পাকিস্তানের হিন্দুদের মতো দেশ ছেড়ে পালাতে পালাতে ওদের সংখ্যাও তলানিতে এসে ঠেকেছে! ওদের সরকারের নীরবতাও অকল্পনীয়।

স্বাভাবিক যে আমরা বিশ্ব-মুসলিম ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে চাই! কিন্তু যেভাবে আমরা প্রতিক্রিয়া করছি তাতে এটা বন্ধ হয়েছে, নাকি আরো বেড়েছে? অধিকাংশ নিহত হয়েছে কিন্তু মুসলমানেরাই! সবচেয়ে হিংস্র প্রতিক্রিয়া করেছে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলো! ওরা পশ্চিমা সরকারের ওপর চাপ দিয়েছে অনেক কিছু না

বুঝেই! ওরা জীবন কাটিয়েছে স্বৈরশাসকের অধীনে যেখানে সরকার প্রধানের অখণ্ড অধিকার যার ইচ্ছে গলা চেপে ধরার! ওরা কল্পনাই করতে পারে না পশ্চিমের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে বাকপ্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে সরকারের আইনগত দিক দিয়ে কিছুই করার নেই! ২০১০ সালে ফ্লোরিডার এক পাদ্রি আগে থেকেই ১১ সেপ্টেম্বরে (নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংসবার্ষিকীতে) জনসমক্ষে কোরান পোড়ানোর ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল। তাকে আইন দিয়ে ঠেকানো যায়নি! আমেরিকান সরকার, বহু ইহুদি-খ্রিষ্টান পাদ্রি, টিভি-রেডিও সংবাদমাধ্যম ও জনগণের চাপে ঠেকাতে হয়েছে! কিন্তু তার পরেও অন্য স্টেটে জনসমক্ষে কোরান পুড়িয়েছে দু'জন সাধারণ নাগরিক, সংবাদমাধ্যম সেটা বুদ্ধি করে তেমন প্রকাশ করেনি। "ইনোসেন্স অব মুসলিমস"-এর ক্ষেত্রেও ওবামা সরকার গুগলকে অনুরোধ করেছে ওটা ইন্টারনেট থেকে নামিয়ে নিতে কিন্তু গুগল সেটা শোনে নি! ড্যানিশ কার্টুনের সমালোচনা করে আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলেছে–"ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক হিংসাকে উস্কাইয়া তুলে এমন কার্টুন গ্রহণযোগ্য নহে"!

কার্টুনের ঘটনার ঘটনার পর বিপক্ষ দল মজা পেয়ে আবারো ঢোলের বাড়ি দিল; ডেনমার্কসহ সাতটা ইউরোপিয়ান দেশ ও ক্যানাডায় কার্টুনগুলো আবারও ছাপা হলো। সত্য-মিথ্যা জানা সম্ভব না হলেও ইন্টারনেটে নানারকম ইসলাম ও মুসলিম-বিরোধী খবর উঠল যেমন আল্-কোরানকে টয়লেটে টাঙিয়ে রাখা বা ছিঁড়ে টয়লেটে ফ্লাস করা, কোরানকে টার্গেট করে বন্দুক-প্র্যাক্টিস করা কিংবা রাতের আঁধারে কার্টুনগুলোর ফটোকপি ছড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি। বেশ কিছু মুসলিম-প্রধান দেশে ড্যানিশ দুগ্ধজাত খাবার আমদানি নিষিদ্ধ হলো (ওটাই ওদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি আয়)। মুসলিম-বিশ্ব বুঝল না যে কার্টুনের সাথে ওসব কোম্পানি'র কোনোই সম্পর্ক নেই, বরং ওই সরকারগুলো ওসব অপকর্মের তীব্র" প্রতিবাদ করেছে! ওই কোম্পানিতে অনেক মুসলমান কাজ করেন যাঁরা চাকরি আর সম্মান নিয়ে মহা উদ্বেগের মধ্যে আছেন। মুসলিম-বিশ্বের দাবি ছিল জিল্যান্ড পস্টেন যেন ক্ষমা প্রার্থনা করে। সেটা তো দুরের কথা ইউরোপিয়ান সংবাদপত্র জগৎ বাক্-স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হলো ও

কার্টুনিস্ট কুর্ট ওয়েস্টারগার্ডকে "মৌলিক সাংবাদিকতা"-র জন্য পুরস্কার দিল। অর্থাৎ মত-প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষায় তারা খোলাখুলি মুসলিম-বিশ্বের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গেল। তার মানে মুসলিম-বিশ্ব যতই হিংস্রতা করুক মূল অপরাধীরা থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরেই।

মুসলিম-বিশ্বে পশ্চিমা দুনিয়ার প্রতি ঢালাওভাবে ঘৃণা প্রচার হয় এবং সেসব খবর পশ্চিমে পৌঁছে যায়। ওদিকে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমের একটা অংশ সুযোগ পেলেই ইসলাম-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়, কিছু ইসলাম-বিদ্বেষী লেখক-সংগঠনও আছে। বিশ্ব-মুসলিমের জানা দরকার দুনিয়াতে শিল্পীর কল্পনা থেকে বানানো নবীর শত শত ছবিই শুধু নয় মূর্তিও আছে। শত শত বছর ধরে ইরানের অভিজাত বাড়িগুলোর ড্রইংরুমে ঝোলানো আছে ছোট সুদৃশ্য কার্পেটে তোলা আমিনার কোলে শিশুনবী, বোরাকে চড়ে উড়ে যাওয়া আর সাহাবি পরিবেষ্টিত নবীর ছবি। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের দেয়ালে সম্মানের সাথে রাখা আছে পৃথিবীর অন্যতম আইনদাতাদের কাল্পনিক মূর্তি, প্রাচীন ব্যাবিলনের রাজা হাম্বুরাবীসহ। নিউইয়র্কের আপিল বিভাগের আঙিনাতেও ছিল নবী'র মূর্তি যা মুসলিম সরকারগুলোর দেন-দরবারের কারণে সরানো হয়। রাসুলের বহু ছবি পাবেন এখানে, এর মধ্যে অনেকগুলো মুসলমানদেরই বানানো : http://zombietime.com/mohammed_image_archive/misc_mo/

আজ নবীর কার্টুন নিয়ে আমরা প্রতিবাদ করছি অথচ বহু বছর আগে থেকে আরব দেশগুলো ও মিসরের খবরের কাগজগুলোতে ইহুদি ধর্ম নিয়ে ক্রমাগত জঘন্য ঠাট্টা-তামাশা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কোন মুসলিম সরকার তার প্রতিবাদ করেনি, সেটা বন্ধ করেনি। সেজন্যই যখন সৌদি মন্ত্রী প্রিন্স তায়েফ ভ্যাটিকানের পোপকে বলেছিলেন ইসলাম নিয়ে কার্টুন বন্ধ করার আদেশ জারি করতে তখন পোপ সটান বলে দিয়েছিলেন বাইবেলের কথা–"অন্যকে যা করতে বলো, আগে নিজেরা তাই করো"। কথাটা কিন্তু আমাদের নবীজিরও। মনে আছে, এক লোক যখন তার ছেলেকে এনে নবীজিকে বলল,–"ছেলেটা এত মিষ্টি খেতে চায়, আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন", তখন নবীজি কি করেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, পরের সপ্তাহে এসো। পরের সপ্তাহে লোকটা ছেলে নিয়ে এল, নবীজি

তাকে বোঝালেন, ছেলেটা মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করল। লোকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল নবীজি তো ছেলেটাকে আগের সপ্তাহেই বোঝাতে পারতেন, পরের সপ্তাহে কেন আসতে বললেন। নবীজি হেসে বলেছিলেন, ‘বাপু, আমি নিজেই তো মিষ্টি খেতে পছন্দ করি এবং খাই। গত এক সপ্তাহে আমি মিষ্টি খাওয়া কমিয়েছি, তাই বোঝাবার বৈধতা আমার হয়েছে’। অর্থাৎ তাঁর বাণী হলো “অন্যকে যা করতে বলো, আগে নিজেরা তাই করো।” আমরা কি তা করেছি ? না, করিনি, নিচে মুসলিমদের ছড়িয়ে দেয়া প্রমাণ দেখুন (ইহুদি ধর্মের প্রতীক ✡)।

খেয়াল করুন, প্রতিটি কার্টুনে ইহুদি ধর্মের প্রতীক “ডেভিডস স্টার” আছে। এগুলো নিউইয়র্কের নরমেধযজ্ঞ, ড্যানিশ কার্টুন বা কোরান পোড়ানোর বহু আগের কার্টুন। এখন বলুন, ওদের যে আমরা ইসলাম নিয়ে ব্যঙ্গ বন্ধ করতে বলব, বলবটা কোন মুখে? সবারই ধর্মীয় প্রতীক তার কাছে অত্যন্ত সম্মানের নয়? কোনো মুসলিম সরকার, কোনো মওলানা এর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি। আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টও এ ব্যাপারে নীরব।

‘ইনোসেন্স অব মুসলিমস মুভি’র পরে পরেই ফ্রান্সে ঘটল আরেক জঘন্য ঘটনা, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে পত্রিকায় উঠল রাসুলের (সা.) কার্টুনের খবর, ফ্রান্স সরকার সেটা ইন্টারনেট থেকে নামিয়ে নিতে অনুরোধ করল কিন্তু পত্রিকা তা শোনেনি। এ নিয়ে আমরা আবার জ্বালাও-পোড়াও করতে পারি কিন্তু আত্মসমালোচনা করারও দরকার আছে ।

সন্ত্রাসী ইহুদি রাষ্ট্র এবং দুনিয়ার সাধারণ খেটে খাওয়া ইহুদিরা এক নয়। বহু ইহুদি ইসরাইলের গণহত্যার বিরুদ্ধে বলে ও লিখে চলেছেন। এগুলো

মুসলিম নেতারা আমাদের জানতে দেন না। ড্যানিশ কার্টুনের বিরুদ্ধেও গর্জে উঠেছেন বহু খ্রিষ্টান-ইহুদি, আছেন ফ্রান্সের ও ক্যালগেরী'র সর্বোচ্চ ইহুদি ধর্মনেতা দু'জন রাবাই–জোসেফ সিটরুক ও মি. নেলসন। জোসেফ সিটরুক তীব্রকণ্ঠে বলেছেন–"কার্টুন প্রকাশের পরে বিশ্ব-মুসলিমের যে ক্রোধ আমি তাহাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কোনো ধর্মকে অপমান করিয়া কেহই কিছু লাভ করিতে পারে না, ইহা অত্যন্ত অসৎ কর্ম। মুসলমানদের যদি আত্মসমালোচনা করার কিছু থাকে তবে তা তাহারাই করুক"। গতবার গাজা'র ওপরে যখন ইসরায়েলি ট্যাংক গণহত্যা চালাল তখন আমার শহর টরন্টোতে ইহুদি মহিলা সংগঠন ইসরায়েলি দূতাবাসে ঝটিকা প্রবেশ করে চিৎকার করে অবস্থান ধর্মঘট করল, তাদের হাতে পোস্টার ছিল–"হে ফিলিস্তিনিরা! তোমরা একা নও, আমরা তোমাদের সাথে আছি।" পরে পুলিশ ডেকে তাদের ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে হয়।

এই হলো জনগণের পাশে জনগণ দেশে দেশে যুগে যুগে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির তুঙ্গ উদাহরণ রেখে গেছেন শিখদের গুরু অর্জুনদেব। আমাদের যেমন কাবা শরিফ ওদের তেমনি অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির। গুরু অর্জুনদেব ১৫৮৮ সালে স্বর্ণমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর নিজে স্থাপন না করে করিয়েছিলেন লাহোর থেকে মুসলিম সুফি শেখ মিয়া মীর-কে ডেকে এনে তাঁরই হাতে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কত বড় বাণী এতে আছে তা কি কল্পনাও করতে পারবে তারা যারা আজ অন্য ধর্মকে ব্যঙ্গ করছে?

জ্বালাও-পোড়াও করে কেউ কোনোদিন ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা ঠেকোতে পারবে না। তাহলে আমরা কি করব? দুনিয়ার কেউ কোথাও ঢোলের বাড়ি দিলেই কি আমরা নেচে উঠব? নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে ছুটতে থাকব? তাহলে তো মজা পেয়ে ওরা আরো ঢোলের বাড়ি দেবে এবং আরো জোরে দেবে। এটা খুবই ঠিক যে ইসলামের প্রতি ব্যঙ্গ হলে আমাদের মনে লাগে। কিন্তু সেই সাথে এটাও ঠিক যে প্রতিবাদের ভাষা প্রতিবাদীর চরিত্র প্রমাণ করে। আমরা অবশ্যই প্রতিবাদ প্রতিরোধ করব কিন্তু জান-মালের ক্ষতি না করেও সেটা করা যায়। করা যায় বিক্ষোভ মিছিল, ওদের দূতাবাসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট, আমাদের সরকারের মাধ্যমে ওদের চাপ দেয়া, ওআইসি দিয়ে জাতিসংঘের মাধ্যমে চাপ দেয়া, ওদের

জিনিসপত্র না কেনা, সংবাদমাধ্যমে প্রতিবাদ করা, প্রতিপক্ষের সাথে সংলাপে বসা ইত্যাদি। কোনো মুসলিম নেতা কি কখনো ওদের সাথে সংলাপের আহ্বান করেছেন? কখনোই করেননি।

মুসলিম সমাজের এই হিংস্রতার শিকড় কোথায় তা আমরা জানি। সহি বুখারি সহি মুসলিম ছাড়াও সেটা আছে ইবন হিশাম ইবন ইসহাকের "সিরাত"-এ (নবীজির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জীবনী)–৫৫০, ৫৫১ ও ৬৭৫ পৃষ্ঠায়. তিনি নাকি ইসলামকে ব্যঙ্গ করার অপরাধে খুন করিয়েছিলেন ১২০ বছর বয়সের আবু আফাক, ক্রীতদাসী আসমা বিনতে মারওয়ান, ইবন খাত্তালের ২ ক্রীতদাসী বালিকা (একজন পালিয়ে গিয়েছিল) ও হুয়াইরিথ নুকায়িধ ওয়াহাব কুসাই-কে। কিন্তু যেহেতু এসব "ম্যানমেড" দলিল কোরানের বিরুদ্ধে যায় তাই আমরা স্বচ্ছন্দে ওগুলো বাতিল করতে পারি। ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ-সমস্যার চিরকালের সমাধান চৌদ্দশ বছর আগে দিয়ে রেখেছে আল্ কোরান শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, শুধু এখনকার জন্য নয়, সর্বকালের সমগ্র মানবজাতির জন্য। আশ্চর্য এই যে সেই নির্দেশ ইহুদি-খ্রিষ্টানরা মেনে চলেছে বলেই ওরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। রামকে নিয়ে আপত্তিকর কথা আছে মাইকেলের লেখায়, যিশুকে নিয়ে কিছু সিনেমায় অত্যন্ত আপত্তিকর ব্যাপার আছে, এমনকি নিউইয়র্কে বোতলের মধ্যে প্রস্রাবের ভেতর যিশুর মূর্তি প্রদর্শনের মতো ভয়াবহ ব্যঙ্গ হয়েছিল। কোটি কোটি খ্রিষ্টান কষ্ট পেয়েছে কিন্তু ওরা কোরানের আদেশ মেনেছে বলেই অমন ভয়াবহ ঘটনা ওখানেই মরে গেছে, পরে আর কেউ করেনি, কিছু ব্যতিক্রম থাকবেই কিন্তু আমাদের প্রতি ব্যঙ্গও মরে যাবে যদি আমরা পালন করি হুকুমদাতার হুকুম–

"কোরানের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ'র আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়"–সুরা নিসা আয়াত ১৪০।

যদি আমরা এ হুকুম না মানি–"তা নাহলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে"–পরের আয়াত।

এর চেয়ে কথা স্পষ্ট হয় না। হুকুমটা যদি কারো পছন্দ না হয় তবে এর চেয়ে কার্যকর উপায় কী হতে পারে তা কেউ বলে দিক।

কানাডায় পশ্চিমা বিশ্বের প্রথম শারিয়া কোর্ট–অতঃপর?

এই সেই দালান। কানাডার টরন্টো শহরে এই সেই গর্বিত দালান যেখানে ছিল পুরো পশ্চিমা বিশ্বের সর্বপ্রথম শারিয়া কোর্ট। যে শারিয়া কোর্ট ছিল কানাডিয়ান আইন দ্বারা সুরক্ষিত, যার ওপরে আরবি ও ইংরেজীতে লাগানো ছিল গর্বিত সাইনবোর্ড "দারুল কাদা" অর্থাৎ "ন্যায়বিচারের বাড়ি"। সেই দালান আজও আছে, শুধু সেই সাইনবোর্ড চলে গেছে ইতিহাসের অতল গহবরে। বিশ্ব মুসলিমের সাথে সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ ঘটনা রয়ে গেছে জাতির অগোচরে।

১৯৯০ সালের দিকে। কানাডার সবচেয়ে জনবহুল ও সমৃদ্ধ প্রদেশ অন্টারিও, তার সবচেয়ে জনবহুল শহর টরন্টোতে প্রতিদিন শত শত ইমিগ্র্যান্ট আসছে, মামলার সংখ্যাও বাড়ছে, রায় দিতে কোর্ট-কাচারির দেরি হচ্ছে। তাই অন্টারিও'র অ্যাটর্নি জেনারেল ম্যারিয়ন বয়েড-এর অনুরোধে অন্টারিও সরকার ১৯৯১ সালে আইন পাশ করল, এখন থেকে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিধি-বিধান দিয়ে পারিবারিক

ও ব্যবসায়িক সমস্যার মীমাংসা করতে পারবে, খুনখারাবি ইত্যাদি ফৌজদারি মামলা যাবে সরকারি আদালতে। অনতিবিলম্বে মুসলিমেরা টরন্টো শহরের কিপলিং অ্যাভিনিউ আর রেক্সডেল বুলেভার্ড-এর দক্ষিণ পশ্চিম কোনায় বিশাল এক দালানের ওপরে সাইনবোর্ড লাগাল—"দারুল কাদা" অর্থাৎ "ন্যায়বিচারের বাড়ি", সেখানে শারিয়া কোর্ট প্রতিষ্ঠা করে পারিবারিক ও ব্যবসায়িক সমস্যার মীমাংসা করা শুরু করল। সেখানে রুদ্ধদ্বার আদালতে কি বিচার চলল, তা কেউ জানল না। কারণ সরকার বা জনগণের কাছে শারিয়া কোর্টের জবাবদিহিতা নেই, কারো অধিকার নেই তাদের প্রশ্ন করার।

আমি আইনবিদ নই সঠিক বলতে পারব না তবে পরিস্থিতি মোটামুটি এরকম ছিল। ১৯৯১ সালের আইনে ২টি ধারা ছিল—মেডিয়েশন (দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী) ও আরবিট্রেশন (দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে সমাধানকারী)। এই শারিয়া কোর্ট মেডিয়েশন স্ট্যাটাস পেয়েছিল অর্থাৎ তার রায়ের বিরুদ্ধে কানাডিয়ান কোর্টে আপিল করা যেত। কোনো ধর্মীয় কোর্ট "আরবিট্রেশন" স্ট্যাটাস পেলে তার রায়ের বিরুদ্ধে কানাডিয়ান কোর্টে আপিল করা যাবে না। ১৯৯১ থেকে দীর্ঘ ১২ বছর শারিয়া কোর্ট চালানোর পরে ২০০৩ সালে তাঁরা সরকারের কাছে আবেদন করলেন "আরবিট্রেশন" স্ট্যাটাস পাবার জন্য। অর্থাৎ তাঁরা একই দেশে স্বায়ত্তশাসিত দ্বিতীয় একটা সমান্তরাল বিচারব্যবস্থা চালাতে চান কারো কাছে যার জবাবদিহিতা থাকবে না। ২০০৩ সালে "কাদা"র খবরটা প্রচণ্ড শব্দে খবরের কাগজে বিস্ফোরিত হলো। চমকে তাকাল কানাডা, চমকে তাকালাম আমি।

আমি অনেক আগে থেকেই শারিয়া আইনের ওপরে পড়াশোনা করছি কিন্তু কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন ছাড়া কোন তখনো কোনো ইসলামি বা মানবাধিকার সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম । আমি ভালো করেই জানি শারিয়াপন্থীরা ন্যায়বিচারের কথা বলেন "আল্লাহ'র আইন"-এর কথা বলেন কিন্তু কস্মিনকালেও শারিয়ার আইনগুলো দেখান না। তাই আমি হানাফী শা'ফি ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য শারিয়া কেতাব থেকে সূত্রসহ নারী-অধিকার ও মানবাধিকারসংক্রান্ত বেশ কিছু শারিয়া আইন

টাইপ করলাম এক পাতার দুই পৃষ্ঠায়। ক্যাপশন ছিল "কানাডা আন্ডার অ্যাসল্ট" ("কানাডা আক্রান্ত") আর ছিল আমার ইমেইল। কাগজটার এক হাজার কপি বানিয়ে দুই বন্ধুসহ গরমের দুপুরে পায়ে হেঁটে ছড়িয়ে দিলাম শহরের কেন্দ্রে কানাডিয়ানদের হাতে হাতে। অনতিবিলম্বে সেটা পৌঁছে গেল শারিয়াপন্থীদের হাতেও। শারিয়া আইনের নারী-বিরোধিতা ও অমুসলিম-বিরোধিতা দেখে কানাডিয়ানরা ভিরমি খেল, শারিয়াপন্থীরা ক্ষিপ্ত হয়ে হুমকি দিয়ে ইমেইল পাঠাল। আর এল (MCC) মুসলিম কানাডিয়ান কংগ্রেস-এর আমন্ত্রণ। যোগ দিলাম ডিরেক্টর, শারিয়া ল' হিসেবে তার কেন্দ্রীয় কমিটিতে। আমাদের নেতাকর্মীরা ওয়েবসাইটে শারিয়া-কোর্টের ওপরে করলেন নিবন্ধের সংকলন আর নিরলস কাজ করলেন সামাজিক-সাংগঠনিক-মিডিয়া ফ্রন্টে। এই কোর্টের বিরুদ্ধে (১) মুসলিম কানাডিয়ান কংগ্রেস (MCC), (২) কানাডিয়ান কাউন্সিল অব মুসলিম উইমেন (CCMW) আর (৩) ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট শারিয়া কোর্ট ইন কানাডা (ICASCC), এই ত্রিমূর্তির আঘাত দিনে দিনে হয়ে উঠল দুর্বার। সরকারের টনক নড়ল। কী ব্যাপার? শারিয়া কোর্ট হলে আমাদের মুসলমানদের তো খুশি হবার কথা, তা না হয়ে আমরা বিক্ষুব্ধ কেন? কি করে ওদের বোঝাই মুসলিম বলেই আমরা শারিয়া আইন কি তা ভালো করেই জানি যা সরকার জানে না।

সেমিনার কনফারেন্সে বক্তৃতা ছাড়াও আমার অন্যতম প্রধান কাজ ছিল টেলিভিশন শোতে ইসলামি তত্ত্ব-তথ্যে প্রমাণ করা যে শারিয়া আইনে এই এই সমস্যা আছে। সেজন্য আমি একগাদা শারিয়া কিতাব নিয়েই টিভি শোতে যেতাম আর কিতাব থেকে আইন পড়ে শোনাতাম। পদ্ধতিটা এমন অব্যর্থ ছিল যে শারিয়াপন্থীদের আত্মরক্ষার কিছু ছিলনা। সমর্থনের প্রচুর ই-মেইল আসতে লাগল, ওদিকে আমাদের ইরানি দল হয়ে উঠল এমন প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিঝড় যার বর্ণনা ভাষায় সম্ভব নয়। সমস্ত কানাডা তখন অবাক বিস্ময়ে দেখছে এক একটা মেয়ে যেন আগ্নেয়গিরির এক একটা বিস্ফোরণ, কার সাধ্য তার সামনে দাঁড়ায়। তারাই তো শারিয়া-বিশেষজ্ঞ, ইরানে শারিয়ার আগুনে পুড়ে এসেছে তারা। একের পর এক কনফারেন্স-সেমিনারে বক্তৃতায় শারিয়াপন্থীদের বিরুদ্ধে চিৎকার করে চললাম আমরা,

খবরের কাগজের উপায় থাকল না আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে যাবার। ইরানি দল ইউরোপে ছড়িয়ে দিল এ প্রতিরোধ। ইউরোপ থেকে যখন একের পর এক সামাজিক-মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতিবাদ আসার ফলে বিব্রত বোধ করল সরকার, প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল ম্যারিওন বয়েডকে ভার দিল বিষয়টা সম্বন্ধে তদন্ত করে সরকারকে পরামর্শ দিতে।

এ পর্যন্ত আমরা জনগণকে ভালোই সচেতন করতে পারছিলাম কিন্তু এটাই ছিল আমাদের বিরুদ্ধে টার্নিং পয়েন্ট। এই ম্যারিওন বয়েডই ছিলেন ১৯৯১ সালে অন্টারিও-র অ্যাটর্নি জেনারেল, তিনিই সংসদের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন ধর্মীয় কোর্টকে বৈধ করার আইন বানাতে। এই অমুসলিম মহিলার হাতেই ঝুলতে থাকল "আল্লার আইন"-এর ভবিষ্যৎ।

আঘাত খাওয়া মৌমাছির মতো আমরা আর শারিয়াপন্থীরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম বয়েডের অফিসে। আমি গেলাম বিস্তর শারিয়া কিতাব নিয়ে–উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়ে তাঁকে বোঝাবার প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। বয়সী মহিলা, গম্ভীর হয়ে সব শুনলেন। মনে হলো যেন কাজ হয়েছে। কিন্তু হা হতোস্মি! ডিসেম্বরে তিনি তাঁর "পরামর্শ" সরকারের কাছে পেশ করলেন–শারিয়ায় কিছু দুর্বলতা আছে বটে কিন্তু তাঁরা সেগুলো প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবেন, কারো ওপর অত্যাচার হবে না।

আমাদের মুখ গেল চুপসে, শারিয়াপন্থী-সমাজে বয়ে গেল আনন্দের বন্যা।

ততদিনে পরিস্থিতি পুরোটাই কবজা করে ফেলেছে শারিয়াপন্থীরা। ওদের অনেক টাকা অনেক সংগঠন, প্রতিটি মসজিদ ওদের পক্ষে। ওরা জুমায় খুতবাগুলোতে আমাদেরকে হেনস্তা করে আর ঘন ঘন দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায় রাজনীতি, প্রশাসন ও মিডিয়ার কুতুবদেরকে। পরদিন খবরের কাগজে আমরা ওই দাওয়াতগুলোর ছবি দেখি আর হাত কামড়াই। আমাদের তো অত পয়সা নেই। ধীরে ধীরে আমরা একেবারেই কোণঠাসা হয়ে পড়লাম। আমি শারিয়া কোর্টকে ই-মেইল করে আলোচনার প্রস্তাব দিলাম, মিহিসুরে উত্তর এল শিগগিরই জানাবে। সে শিগগির আজও আসেনি। শেষ পর্যন্ত এক আল্ আজহারী শারিয়াপন্থী মওলানা টেলিভিশন

শোতে এলেন। আমাকে বিশেষ কিছু করতে হলো না, শুধু হানাফী ও শাফি শারিয়া কেতাব তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সসম্মানে বিশেষ কিছু আইন পড়তে বললাম। তিনি একেকটা আইন পড়লেন এবং তাঁর চেহারা রক্তশূন্য হলো। এক পর্যায়ে তিনি এটাও বললেন, এই শারিয়া কোর্টে যে ফিস নেবার নিয়ম আছে তা সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী কারণ মুসলিম খেলাফতে কোনোদিন শারিয়া কোর্টে কোনো ফিস ছিল না।

একদিন সংসদ আমাদেরকে আর শারিয়াপন্থীদেরকে আমন্ত্রণ জানাল আলাদা দুই দিনে ওখানে গিয়ে সাংসদদেরকে শারিয়া কোর্টের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে। আমি গেলাম শপিং কার্ট ভরে শারিয়া কিতাবগুলো নিয়ে, কিছু আইন পড়ে শোনালাম। সেই সাথে বোঝালাম যে সমস্যাটা অন্টারিওর প্রাদেশিক তো নয়ই এমনকি কানাডিয়ানও নয়। সমস্যাটা আসলে বৈশ্বিক। বাইরে থেকে বোঝা যায় না কিন্তু অন্টারিও সরকার এই শারিয়া কোর্টকে বৈধতা দিলে তার প্রভাব অত্যন্ত সুদূর প্রসারী হতে বাধ্য। কারণ কানাডার অন্যান্য প্রদেশে এবং ইউরোপ অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের শারিয়াপন্থীরা ইগল পাখির মতো তাক করে আছে এই শারিয়া কোর্টের দিকে। এ কোর্ট বৈধতা পেলে তারা এই উদাহরণ দেখিয়ে নিজেদের সরকারের ওপর তাদের শারিয়া কোর্টকে বৈধ করার জন্য চাপ দেবে। তাছাড়া মুসলিম বিশ্বে শারিয়াপন্থীদের ক্রমবর্ধমান চাপে প্রগতিশীল শক্তি এমনিতেই ক্ষয়িষ্ণু। ওসব দেশে শারিয়াপন্থীরা দাবি করবে পশ্চিমা আইনের চেয়ে শারিয়া নিশ্চয়ই অনেক ভালো–না হলে কি আর কানাডার মতো দেশ শারিয়াকে বৈধ করেছে? এ যুক্তির সামনে প্রগতিশীল শক্তির কিছু বলার থাকবে না, এ তামস কাটতে সময় নেবে কে জানে কত শতাব্দী।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ওরা কি করে যেন কাগজগুলোকে হাত করে ফেলল। ওদের দাওয়াতের বন্যায় রাজনীতিকেরা ঢেকুর তুলে ঝুঁকে পড়তে লাগলেন ওদের দিকে, ওদের আর মন্ত্রীদের বত্রিশ দাঁতের হাসিমুখ ছবি উঠতে থাকল খবরের কাগজে। আমরা হতাশ হয়েও হাল ছাড়লাম না। একদিন ওদের সমর্থন করে বিবৃতি দিলেন স্বয়ং কানাডার প্রধানমন্ত্রী পল মার্টিন। সাথে সাথে আমরা ছোট্ট তিনটে সংগঠন যেভাবে বিস্ফোরণে

ফেটে পড়লাম তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। দৈনিক গ্লোব অ্যান্ড মেইল-কে বলে কয়ে জরিপ চালানো হলো, ৯৪% কানাডিয়ান রায় দিলেন শারিয়া কোর্টের বিপক্ষে। আমরা তিনজন বিখ্যাত কানাডিয়ান লেখকের বিবৃতি নিয়ে ছড়িয়ে দিলাম, তাঁরাও বললেন শারিয়া কোর্টের বিপক্ষে। এসব দেশের জনগণ আর সরকারের ওপরে এর প্রভাব প্রবল। ওদিকে ইরানি দলের নেতৃত্বে কানাডিয়ান-ইউরোপিয়ান ৮৭টা সংগঠন যৌথভাবে টরন্টো, মন্ট্রিয়ল, ভ্যানকুভার, প্যারিস, ডসেলডর্ফ রোমসহ ১২টা কানাডিয়ান পার্লামেন্ট ও দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল জনতা। ততদিনে আমরা শারিয়া আইনের নারী-বিরোধিতা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পেরেছি। আমাদের আয়োজনে পার্লামেন্টের সামনে কানাডিয়ান মহিলারা উচ্চস্বরে ঘোষণা করল—হে প্রধানমন্ত্রী! আমরা নারীরা যদি তোমাকে ভোট দিয়ে পার্লামেন্টে পাঠাতে পারি তবে তোমাকে নামিয়েও আনতে পারব।

এইবারে চাকা একটু একটু করে উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করল। বুক ধুক ধুক করছে সবার তখন। আমাদেরও, শারিয়াপন্থীদেরও। কী হয়, কী হয়।

রবিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)। সারাদিন ছুটোছুটি করে এসে বিকেলে কম্পিউটার খুলে দেখি, শতাব্দীর সুখবর অপেক্ষা করছে। বিকেল ৪:২০ মিনিটে অন্টারিও'র প্রধানমন্ত্রী ডাল্টন ম্যাকগুইন্টি দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন "ওয়ান ল' ফর অল।" ১৯৯১-এর সেই আইন বাতিল করা হবে, সব নাগরিক একই আইনের অধীনে থাকবে, কোনো ধর্মীয় কোর্ট চলবে না। এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আঘাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল শারিয়াপন্থীরা। শারিয়া কোর্টের সাথে ইহুদি কোর্টও নিষিদ্ধ, সেই সুযোগে "মুসলমানের চিরশত্রু" ইহুদি কোর্টের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে সরকারের কাছে তদ্বিরের চেষ্টা চালাল তারা। ওদের সেমিনার কনফারেন্স হলো প্রতিদিন, সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকিও দিল তারা। পশ্চিমা কোনো দেশের আইনের সমর্থনে এই প্রথম শারিয়া কোর্টের বৈধতার সুযোগ এসেছিল, যতদিক দিয়ে সম্ভব একটা মরণকামড় দেবার প্ল্যান করছিল তারা। আমরাও জেগে ছিলাম সতর্ক, ওরা কোর্টে

গেলে আমরাও কোর্টে বিশ্বের সামনে শারিয়া বই এবং ওদের ব্রোশিয়র থেকেই প্রমাণ করতে পারব কেন ওটা বিশ্বমানবতার জন্য হুমকি এবং কেন ইসলামবিরোধীও বটে (দেখুন "কানাডিয়ান শারিয়া কোর্ট–ফাঁক ও ফাঁকি" অধ্যায়)।

ওরা সেটা জানে, তাই বোধহয় শেষ পর্যন্ত ওরা আর এগোয়নি।

এ অন্ধকার চিরদিন থাকবে না। শতাব্দী-লাঞ্ছিতা অগণিত মুসলিম মা-বোনের অশ্রু আর দীর্ঘশ্বাসের অভিশাপের দেনা শোধ করতে হবেই শারিয়াকে। নিজেরই মহাপাপের ভারে সে একদিন খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে। সে বিবর্তনে বিশ্বের বিবেকবান মানুষরা চেষ্টা করতে থাকুক, আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে চেষ্টা আমি করেছি প্রাণপণ। ইন্টারনেটে আমার ওয়েবসাইটে বই রইল, মুভি রইল, বক্তৃতা ও অজস্র নিবন্ধ রইল। সেদিন আমি থাকব না কিন্তু আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে অঙ্গ-বঙ্গ-পুন্ড্র-সুম্ম-রাঢ়-গৌড়-সমতট-বরেন্দ্র-হরিকেলের সহজ সরল মানুষগুলোর জন্য।

ওয়েবসাইট: hasanmahmud.com

বই:

১. "শারিয়া কী বলে, আমরা কী করি"

২. How Sharia-Ism Hijacked Islam

শর্ট ফিল্ম:

১. হিল্লা

২. নারী -

৩. Sharia Conundrum (শারিয়া প্রহেলিকা)

মাভৈ!

কানাডিয়ান শারিয়া কোর্ট–ফাঁক ও ফাঁকি

১৯৯১ সালে কানাডিয়ান আইনের সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পুরো পশ্চিমা বিশ্বের প্রথম শারিয়া কোর্ট, কানাডার টরন্টোতে। আমাদের অক্লান্ত আন্দোলনে কানাডিয়ান আইনেই সেই শারিয়া কোর্টসহ সমস্ত ধর্মীয় কোর্ট উচ্ছেদ হয়েছিল ২০০৫ সালে। মুসলিম কানাডিয়ান কংগ্রেসের তৎকালীন ডিরেক্টর অব শারিয়া ল হিসেবে আমার সুযোগ ও অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই যুদ্ধে সম্মুখসমরে থাকার। এখন কানাডিয়ান শারিয়া কোর্টের ব্রোশিয়র দেখা যাক।

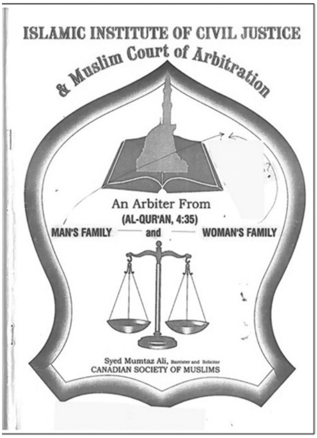

(ক) ব্রোশিয়রের প্রচ্ছদে শারিয়া কোর্টের ইসলামি বৈধতা প্রমাণ করার জন্য উনারা সুরা নিসা আয়াত ৩৫-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দাবি,–"যদি উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করো, তাহলে তোমরা স্বামীর পরিবার হতে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার হতে একজন সালিস নিযুক্ত করো; যদি তারা উভয়ে নিষ্পত্তির ইচ্ছা রাখে, তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন"–নিসা ৩৫।

হুকুমটা পরিষ্কার। কোরান মোতাবেক সালিস-মীমাংসার মধ্যস্থতাকারী দুজনকে অবশ্যই হতে হবে স্বামী-স্ত্রীর পরিবার থেকে। এখন প্রশ্ন–উকিল মোক্তার কবে থেকে "স্বামী-স্ত্রীর পরিবার" হলো? তাছাড়া, শারিয়া কোর্টে উকিলরা তো টাকা খাবে, সালিস মীমাংসা করতে গিয়ে বাবা-চাচা-খালুরা কি টাকা খায় ? উনাদের এ দাবি সরাসরি কোরানের বিরোধী, এটা টাকা কামাবার ধান্ধা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই বুঝি টিভি শোতে মুসলিম আইনজীবীরা উচ্চকণ্ঠে শারিয়া কোর্টকে সমর্থন করেছিলেন। কারণ শারিয়া কোর্টে তাঁদেরই একচ্ছত্র রাজত্ব থাকবে, কানাডিয়ান আইনজীবীরা শারিয়া আইনের কিছুই জানেন না বলে সেখানে যাবেনও না ।

(খ) **১৯৯১** সালের যে আইনে শারিয়া কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেই আইন অনুসারে কোর্টের অবস্থান ছিল "মেডিয়েটর" অর্থাৎ "মধ্যস্থতাকারী"। এতে কানাডার মুসলিমদের অধিকার ছিল সমস্যা নিয়ে ইচ্ছেমতো কানাডার কোর্টে বা শারিয়া কোর্টে যাবার। কিন্তু তাঁরা ব্রোশিয়রের পৃষ্ঠা ৯-তে দাবি করছেন - "আপনি যদি শারিয়া কোর্টে না আসেন তাহা হইলে আপনি দাবি করিতে পারেন না যে আপনি ইসলামকে ধর্ম ও সম্পূর্ণ জীবন-বিধান হিসাবে বিশ্বাস করেন"।

পরিষ্কার ব্ল্যাকমেইলিং। মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাসের সার্টিফিকেট দেবার স্পর্ধা উনাদের কোত্থেকে হলো? কোনো মুসলিম তাঁদের কোর্টে না গেলে সে ইসলামে বিশ্বাস করে না মানে হলো সে মুরতাদ। এবং তারপরেই চাপাতি হাতে ছুটে আসবে তাঁদের শারিয়া আইন। মুরতাদকে রাস্তাঘাটে হাটবাজারে যেকোনো জায়গায় খুন করা যাবে এবং সে খুনির হুদুদ শাস্তি হবে না। এই দাবির বিরুদ্ধে আমরা MCC থেকে কানাডিয়ান কোর্টে মামলা করতে চেয়েছিলাম, ওটা হলে পুরো কানাডার সামনে আমরা উনাদের ইসলাম-বিরোধী চেহারা খুলে দিতে পারতাম। কিন্তু আমরা টাকার অভাবে মামলা করতে পারিনি।

(গ) পৃষ্ঠা ১৫ - সাক্ষাৎকারে শারিয়া কোর্টের প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার মুমতাজ আলীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল–'ইহার (সালিস, মধ্যস্থতা, সাক্ষ্য ইত্যাদি) খরচ কে বা কাহারা দেবে?' তিনি জবাব দিলেন–'যে দুই পক্ষের

মধ্যে মধ্যস্থতা, তাহারাই এই খরচ (ফিস) দিবে।'

হোয়াট? শারিয়া কোর্টে ফিস? চৌদ্দশ' বছরের মুসলিম ইতিহাসে কবে কোন শারিয়া কোর্টে ফিস ছিল? কখনো ছিল না, শারিয়া কোর্টগুলো ছিল খেলাফত পরিচালিত, খরচও খেলাফত থেকেই দেয়া হতো। প্রচণ্ড শারিয়া সমর্থক টরন্টোর নূর মসজিদের মওলানা মুবিন শেখ আল-আজহারীও আমার সাথে টিভি-বিতর্কে বলেছেন সালিস-মীমাংসায় টাকা নেয়া ইসলামে অবৈধ–তাই নূর মসজিদে চিরকাল পারিবারিক দ্বন্দ্বের সালিস-মীমাংসা করা হয় সম্পূর্ণ ফ্রিতে। এখানেও আমরা শারিয়া কোর্টের ইসলামের নামে আর্থিক ধান্ধাবাজি দেখতে পাই।

(ঘ) ব্রোশিয়রের পৃষ্ঠা ১৫-তে আছে শুরুতেই বিবাদমান দুই পক্ষকে একটা দলিলে স্বাক্ষর করতে হবে অর্থাৎ কনট্র্যাক্ট সাইন করতে হবে। দলিলটা হলো,- "যখন বিবাদমান পক্ষগুলো শারিয়া কোর্টের আইন দ্বারা পরিচালিত হইতে রাজি হয় তখন তাহারা উহা মানিতে বাধ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়"। শারিয়া কোর্টের প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার মুমতাজ আলী সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "পরে যদি কেহ সুবিধা মাফিক উহা পরিত্যাগ করে তবে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ (ব্রিচ অব কনট্র্যাক্ট) হইতেও অনেক বড়ো অপরাধ করে যাহা ব্ল্যাসফেমি বা ধর্মত্যাগ"।

আবার ব্ল্যাকমেইলিং, আবার "মুরতাদ হত্যা"র উসকানী!! কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সাথে দালিলিক অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে সেটা আইনের ব্যাপার, সেটা কোর্টে ফয়সালা হবে! এর সাথে ধর্মবিশ্বাস ও "ব্ল্যাসফেমি বা ধর্মত্যাগ"-এর কি সম্পর্ক? এভাবে মুসলিম সমাজকে ব্ল্যাকমেইল করা কেন?

(ঙ) সুন্নিদের হানাফী-মালিকি-শাফিঈ-হাম্বলী আইন আর শিয়াদের জাফরি আইন আছে। উনারা পৃষ্ঠা ১৫ -তে বলছেন–"সংশ্লিষ্ট পক্ষেরা যে মজহাবের অনুসারী সেই মজহাবের আইন প্রয়োগ করা হইবে।"

বোঝাই যায় উনারা শারিয়া আইনগুলো পড়েনইনি কিন্তু শারিয়া প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন! স্বামী-স্ত্রী দুইজন আলাদাভাবে হানাফী-মালিকি-শাফিঈ

বা হাম্বলী মজহাবের হলে কি হবে? স্বামী-স্ত্রী শিয়া ও হানাফী-শাফিঈ হলে তাৎক্ষণিক তিন তালাকের কী হবে? তিন তালাক হানাফী-শাফিঈ আইনে বৈধ কিন্তু শিয়া আইনে অবৈধ! এক ধরনের বিয়ে হানাফী আইনে বৈধ কিন্তু শাফি আইনে অবৈধ, তার কী হবে? অনেক বিষয়ে মজহাবগুলোর আইন আলাদা বা পরস্পরবিরোধী, তার কী হবে? এরকম অনেক উদাহরণ আমি আমার বই "শারিয়া কী বলে, আমরা কী করি"-তে দেখিয়েছি।

(চ) ৩২ পৃষ্ঠায় উনাদের দাবি, এই শারিয়া কোর্ট–"কোনোভাবেই কানাডার আইন, বিচারব্যবস্থা বা আইনকর্তৃত্বকে লঙ্ঘন করিবে না"।

আচ্ছা!! এবারে তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে দাবিটা দেখা যাক।

১. কানাডার আইনে অনাথ বা এতিম বাচ্চাদের দত্তক নেয়া বৈধ। কিন্তু মুমতাজ আলীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়– "কানাডায় কোনো মুসলিম কি দত্তক নিতে পারবেন?" তিনি জবাব দিলেন– "না"।

২. তিনি বলেন, "কোনো মুসলিম যদি উইল না বানাইয়া মৃত্যুবরণ করে তবে আরবিট্রেশন কাউন্সিল মুসলিম আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিবে"। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তাঁরা কন্যাকে পুত্রের অর্ধেক সম্পত্তি দেবেন, যা কানাডার আইনের পরিপন্থী।

৩. কোনো বিবাহিত পুরুষ ফোনের মাধ্যমে দেশে আরেকটা বা আরো তিনটে বিয়ে করতে চাইলে তাঁরা শারিয়া মোতাবেক সে বিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন যা কানাডার আইনের পরিপন্থী। এমন বেআইনি বিয়ে টরন্টোর মসজিদে দেয়া হয়েছে ও হচ্ছে।

৪. তালাকের পর সম্পত্তি বিভক্তি, দেনমোহর, বাচ্চাদের ওপর প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ইত্যাদি ব্যাপারেও কানাডিয়ান ও শারিয়া আইন ঘোরতর পরস্পরবিরোধী, সেক্ষেত্রে তাঁরা তো অথই সাগরে পড়ে যাবেন! পুরুষ-নারীর জীবনে আইনি সংঘাত কত জটিল হতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা থাকলে এমন উদ্ভট দাবি তাঁরা করতে পারতেন না। বোঝাই যায় উনারা শারিয়া আইনগুলো পড়েনই নি কিন্তু শারিয়া প্রতিষ্ঠা

করতে এসেছেন!

(ছ) ব্রোশিয়রের পৃষ্টা ১৬-তে দাবি আছে–"কানাডিয়ান মুসলিমদের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে আমরা একটি কম্প্রিহেন্সিভ ক্যাম্পেইন করিয়াছি যাহাতে 'উন্মুক্ত সংলাপ' অন্তর্ভুক্ত। আমরা মুসলিম ও অমুসলিমদিগকে আমন্ত্রণ জানাইতেছি আমাদের নিকট তাঁহাদের মতামত জানাইতে।"

ডাহা মিথ্যা কথা। আমি নিজে ও আমার জানা অনেকে তাঁদেরকে বারবার ইমেইল করেছি আলোচনার জন্য। অন্যেরা কি জবাব পেয়েছেন জানি না তবে আমাকে জবাবে বলেছিলেন তাঁরা "পরে" যোগাযোগ করবেন। বারবার ইমেইল করা সত্ত্বেও সেই "পরে"-টা আর কোনোদিনই আসেনি। এই মিথ্যাভাষণ ও ধাপ্পাবাজি উনাদের জন্য স্বাভাবিক, কারণ শারিয়া প্রতিষ্ঠা উনাদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং "উদ্দেশ্য যদি বাধ্যতামূলক হয় তবে সেই উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য মিথ্যা বলা বাধ্যতামূলক"–শাফি' আইন আর.৮.২। এই ধাপ্পাবাজির নাম ত্বাকীয়া, এটাকে ইসলামের নামে বৈধ করা হয়েছে। ইন্টারনেটে মধ্যপ্রাচ্যের বহু ইমামের ভিডিও দেখলে তার আরো প্রমাণ পাবেন।

আমি অনেক তৃপ্ত যে ইসলামের নামে ওই ইসলাম-বিরোধী ধাপ্পাবাজকে আমরা তীব্র" আন্দোলন করে চিরতরে উৎখাত করতে পেরেছি ২০০৫ সালে।

- ইংরেজির প্রতিটি শব্দের হুবহু বাংলা অনুবাদ সম্ভব নয়। শারিয়া কোর্টের ব্রোশিয়রের হুবহু উদ্ধৃতি আছে আমার লেখা "How Sharia-Ism Hijacked Islam" ইংরেজি বইটার "DECEPTION AND DEATH OF THE CANADIAN SHARIA COURT" অধ্যায়ে। বইটা আমাজনে পাওয়া যায়।

বাবরি মসজিদঃ ভুতের ভবিষ্যৎ

৯ নভেম্বর ২০১৯: দলিল প্রমাণ নয় স্রেফ "হিন্দুদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে" ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন ভগ্ন মসজিদের ২.৭৭ একরের ওপর মন্দির বানানো হবে এবং মুসলিমদেরকে মসজিদ বানানোর জন্য অন্যত্র ৫ একর জমি দেয়া হবে।

বিষয়টা কিন্তু খুবই সিম্পল ছিল। কিন্তু সেটাকে এত প্যাঁচানো হয়েছে যে বলার নয় । কেউ যদি বাবরি মসজিদের ওপরে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়টার ব্যবচ্ছেদ থেকে আইন ও তার অপপ্রয়োগ শিখতে চান তবে তাঁদের জন্য গোল্ড মাইন হলো ন্যাশন্যাল একাডেমি অব লিগ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ-এর ভাইস চ্যান্সেলর ড. ফাইজান মুস্তাফা'র করা বাবরি মসজিদের ওপরে ভিডিও সিরিজ। সেটা দেখলেই আমাদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে যে দানবীয় মগ্ন-মৈনাক, তার চুড়োটা দেখা যাবে। ঘটনা অনেক, অতি সংক্ষেপেঃ

১. মসজিদটা বানানো হয়েছিল ১৫২৮ সালে।

২. ১৮৮৫-র পর থেকে ওখানে উপাসনার অধিকার ও জমির মালিকানা নিয়ে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ক্রমাগত মামলার পর মামলা হয়েছে।

৩. ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের গবেষণার রিপোর্টে বলা হয়েছে মসজিদের নিচে বহু পুরোনো একটি কাঠামোতে কুমির, মানুষ ও পশুপাখির টেরাকোটা পাওয়া গেছে, যা মসজিদ সংস্কৃতির সাথে যায় না। কিন্তু কাঠামোটা যে মন্দিরেরই ছিল তা সুস্পষ্ট নয়।

৪. মামলাগুলো চলাকালীন কোর্টের "স্টে অর্ডার" অর্থাৎ "ওখানে কেউ যেতে পারবে না" অবস্থাতে পুলিশের উপস্থিতিতেই ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় জনতা পার্টি ও শিবসেনা'র নেতৃত্বে হাজার হাজার অস্ত্রধারী গুন্ডারা এসে মসজিদটা ভেঙে ফেলে।

৫. এর প্রতিক্রিয়ার দাঙ্গার শিকার হয়েছে উপমহাদেশের হাজারো হিন্দু-মুসলিম।

৬. ৯ নভেম্বর ২০১৯: দলিল প্রমাণ নয় স্রেফ "হিন্দুদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে" ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন ভগ্ন মসজিদের ২.৭৭ একরের ওপর মন্দির বানানো হবে এবং মুসলিমদেরকে মসজিদ বানানোর জন্য অন্যত্র ৫ একর জমি দেয়া হবে।

৭. যখন বহু আগে থেকেই জমির মালিকানা নিয়ে মামলা চলছে তখন যদি ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর হাজার হাজার অস্ত্রধারী গুন্ডারা মসজিদটা না ভাঙত তাহলে সেটা আজও দাঁড়িয়ে থাকত। সেক্ষেত্রে কোর্ট কি মসজিদ ভেঙে জমিটা মন্দিরের জন্য দিতে পারতেন?

   না, পারতেন না। জমি মসজিদেরই থাকত।

তাহলে?

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভারসাম্যহীনতা এতই স্পষ্ট যে এর কড়া সমালোচনা করেছে হিন্দু আইনজীবী, প্রাক্তন বিচারপতি থেকে শুরু করে সন্ন্যাসী, সুশীল সমাজ হয়ে গৃহবধূ পর্যন্ত। সবাই বিশ্লেষণ করছেন মামলাটার প্রেক্ষাপট ও তার "ভূত" অর্থাৎ অতীত। আমি তাকিয়ে আছি সেই ভূতের ভবিষ্যতের দিকে। আমার কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে জ্বলজ্বলে হিংস্র চোখে তাকিয়ে আছে অজানা এক হিন্দুর ফেসবুক পোস্ট, ওটা আমাকে পাঠিয়েছে উৎকণ্ঠিত এক মুসলিম বন্ধু। পোস্টটাতে তিনটে ছবি আছে,–(১) বাম দিকে ভগ্ন বিধ্বস্ত বাবরি মসজিদ, (২) ডান দিকে এক বিশাল সুসজ্জিত মন্দির ও (৩) মাঝখানে সুপ্রিম কোর্ট। ফেসবুক পোস্টে লেখা আছে–"হাঃ হাঃ হাঃ!!..." (এর পরে আমাদেরকে, আমাদের ধর্মকে ও স্রষ্টাকে এত কুৎসিত ও অশ্লীল শব্দে বাক্যে ঠাট্টা অপমান করা হয়েছে যে লেখা যায় না)।

গল্প নয়। একদিকে, ভারতে ক্রমাগত দাঙ্গায় পিষে গেছে হাজারো মুসলিম, এখনো তাদের প্রতিটি দিন উৎকণ্ঠায় কাটে। অন্যদিকে, গত অর্ধশতাব্দী ধরে পাকিস্তান বাংলাদেশে হিন্দুদের চোখের সামনে

ক্রমাগত ভাঙা হয়েছে শত শত মন্দির আর বিগ্রহ, বেদখল হয়ে গেছে জমিজমা বাড়িঘর, শাস্তি পায়নি ক্রিমিনালেরা। কোটি হিন্দুরা পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে বৌ-বাচ্চার হাত ধরে বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসে রওনা হয়েছে অজানা অনিশ্চয়তার দিকে, মানুষের ইতিহাসে এত বড় অশ্রুসজল নীরব মাইগ্রেশন আর কখনো হয়নি।

"ওয়াতান জমি-হি রহি, হাম সরহাদোঁ মে বাঁট গ্যয়ে,

না জানে কব হাম মন্দির ঔর মসজিদোঁ মে বাঁট গ্যয়ে"–(অজানা)।

মাতৃভূমির মাটি সেই আগের মতোই আছে, আমরা সীমান্ত দিয়ে খণ্ডিত হয়ে গেছি,

জানি না কবে আমরা মন্দির আর মসজিদ দিয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছি...

(ধর্ম নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে)।

এখন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের শক্তিতে তাদের অনেকেরই মনে রক্তচোখে উঠে দাঁড়াবে বহু বছর ধরে জমে ওঠা তীব্র" ক্ষোভ ও ক্রোধ। ভাঙা মসজিদের জায়গাটায় মন্দির হলে হিন্দু সন্ত্রাসীরা ভাঙা মসজিদের ছবির পাশে নতুন মন্দিরের ছবি ইত্যাদি একত্রিত করে অনন্তকাল ধরে ইন্টারনেটে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে মুসলিমদেরকে অপমান ও আঘাত করতে থাকবে। ফলে কোনো এক মারাত্মক মুহূর্তে কোনো ক্রুদ্ধ মুসলিম যুবকের হাতে ঘাতক অস্ত্র ঝলসে ওঠার সম্ভাবনা শতকরা ১০০%। তার জবাবে মুসলিমদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে হিংস্র হিন্দুশক্তি, সেই আগুনে অনতিবিলম্বে ঘি ঢালবে হিংস্র ধর্মগুরুরা। শুরু হবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সেই দাবানল-তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়বে বাংলাদেশেও। আবারও ব্যর্থ হবেন শান্তিময় আলেমরা, ঠিক যেমন ১৯৯২ সালে গুজরাটের দাঙ্গায় মুসলিম-হত্যা থামাতে ব্যর্থ হয়েছিল হিন্দুদের শান্তির পক্ষের জনগণ, রাজনীতিক এমনকি সন্ন্যাসীরাও।

শিক্ষা নাও ইতিহাস থেকে। রজ্জুকে সর্পভ্রম করলে অসুবিধে নেই কিন্তু সর্পকে রজ্জুভ্রম করা সমূহ বিপজ্জনক। রাষ্ট্র সমর্থিত সাম্প্রদায়িকতার

মতো বিষাক্ত কালনাগিনী আর নেই। হিন্দুত্ববাদের অক্টোপাস সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে ভারতের মুসলিমদেরকে, যেমন করেছিল পাকিস্তানের হিন্দুদেরকে আইয়ুব খানের "এনিমি প্রপার্টি" আইন এবং এখন মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর অত্যাচার। হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে যে গজ-কচ্ছপ লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে কিছু রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক নেতা, সেটা থামাতে গরুড় হয়ে কবে কোন নেতা আসবেন জানি না। এর মধ্যে লম্ফ দিয়ে উঠেছে বলিউড, অজয় দেবগন'কে নিয়ে বাবরি মসজিদের ওপরে মুভি বানাবে তারা।

৬ নভেম্বর ১৯৯২ বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রতিক্রিয়াতে বাংলাদেশে দাঙ্গায় বাংলাদেশের হিন্দুদের প্রতি হুংকার উঠেছিল–"তোরা আমাদের মসজিদ ভাঙলি কেন?" এই আহম্মক প্রশ্নের কি জবাব দেবে বাংলাদেশের হিন্দুরা? ১৯৪৬ সালের জিন্নাহ'র ডাকা ১৬ আগস্টের "ডাইরেক্ট অ্যাকশন"-এর ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ দাঙ্গাতেও কলকাতায় প্রশ্ন ছুড়েছিল মুসলিম দাঙ্গাবাজ–"কয়টা হিন্দু মারিয়াছেন আপনি? মুখে মুখেই মুসলিম প্রীতি!"–'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর'–আবুল মনসুর আহমদ, পৃষ্ঠা ২৫৪। সব ধর্মের দাঙ্গাবাজেরই এটা কমন দাবি–"ওদের কয়টাকে মেরেছ?"

মত্ত দরিয়া, নাও ডুবুডুবু, মৃত্যু জীবন-নদীর দুধারে,

এধারে রক্তচক্ষু পুরাণ, রক্তচক্ষু কোরান ওধারে...

কেতাবে যাই লেখা থাকুক বাস্তবে এই হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

এর মধ্যেই ইন্টারনেটে তথাকথিত "বিশেষজ্ঞদের নির্ভরযোগ্য গবেষণা"-র ভিত্তিতে অজস্র পোস্টিং দিয়েছে উগ্র হিন্দুরা–ভারতে নাকি এই এই হাজারো জায়গায় এই এই হাজারো মসজিদ এমনকি তাজমহলও নাকি বানানো হয়েছে মন্দিরের ওপর। সেগুলোর কী হবে তাহলে? বৌদ্ধ রাজত্ব শেষ হলে হিন্দু রাজারা অনেক বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করে সেখানে মন্দির বানিয়েছিল। জায়গা ও মন্দিরের নাম ধরে ধরে

সেই একাডেমিক রিসার্চের তালিকা আমরা পেয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে। সেগুলোর কী হবে তাহলে? কেউ কি এই কমনসেন্স প্রশ্নটা করবেন, মোগল বাদশাদের জমির এমন কি অভাব ছিল যে মন্দিরের ওপর মসজিদ বানাতে হবে? কেউ কি এই কমনসেন্স দাবিটা করবেন–অতীতে যা হয়েছে হয়েছে, তার জন্য আজ আমরা কিছুতেই পরস্পরের কল্লা কাটব না, পরস্পরের বাচ্চাদের কল্লা কাটব না?

ভারতের মুসলিম নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রায়টার ওপরে রিভিউ-এর আবেদন করবেন। একটা জলজ্যান্ত মসজিদ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল কয়েক শতাব্দী, নামাজ হয়েছে দোয়া-কালাম-খুতবা হয়েছে, জমির মালিকানা তো তাতেই প্রমাণিত। সুপ্রিম কোর্ট যদি সেটা নাও দিতে পারেন তাহলেও ওখানে "সম্প্রীতি হাসপাতাল" বা "সম্প্রীতি সৌধ পার্ক" বা "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জাদুঘর" ধরনের কিছু একটা করা যেতে পারে। এর অন্যথা হলেই জন্ম নেবে অনন্তকাল ধরে হিংস্র ও রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনা। মনে রাখা দরকার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূল চালিকাশক্তি ধর্মপালন ও স্রষ্টাকে তুষ্ট করার প্রবণতা।

"মানুষের ওপরে মানুষ কখনো এত উল্লাসের সহিত এত সর্বগ্রাসী হিংস্রতা করে নাই যখন সে সেই হিংস্রতা করিয়াছে তাহার স্রষ্টাকে তুষ্ট করিবার জন্য।"

২১ নভেম্বর, ২০১৯

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও তুরস্কের নাক : ৫টি বিস্মৃত প্রতিবাদ

আবার এসেছে বিজয়ের মাস। আবার ডিসেম্বর।
আজকে তোদের যা কিছু চাই একাত্তরেই ছিল,
"বাংলাদেশি" নামের বড়াই, একাত্তরেই ছিল!!
ঐক্যবোধের শক্ত জাতি, মূল্যবোধের ভক্ত জাতি,
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিবোধ একাত্তরেই ছিল,
ধর্মচোরার অধর্ম রোধ একাত্তরেই ছিল !!
ওই যে জ্বলে একাত্তরের মরণজয়ী শিখা,
পথভোলাকে পথ দেখানোর আলোকবর্তিকা...

১৬ ডিসেম্বর এই নশ্বর জীবনের অবিনশ্বর দিন। আমরা যারা একাত্তরের আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে এসেছি, জানি আমাদের ওপর কি নৃশংস ও মর্মান্তিক যুদ্ধাপরাধ হয়েছিল এবং কারা তা করেছিল। পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীরা পিছলিয়ে গেল সে দুঃখ চিরকাল রয়ে যাবে। কিন্তু একাত্তরের স্থানীয় কসাইরা একের পর এক ফাঁসিতে ঝুলেছে, ঝুলছে সেটা কম সান্ত্বনাদায়ক নয়। যুদ্ধাপরাধটা হয়েছে বাংলাদেশের মাটিতে, অভিযুক্তরা বাংলাদেশি, বাদী বাংলাদেশ সরকার, বিচার করছেন বাংলাদেশের আদালত, বিচার হচ্ছে বাংলাদেশের আইনে। কিন্তু আদালতের নামটা "বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুন্যাল" না করে "আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (বাংলাদেশ)" করা হয়েছে। মনে হয় এই "আন্তর্জাতিক" শব্দটা আছে বলেই বিদেশে বাংলাদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা আর বাইরের বিভিন্ন কুতুবরা এর মধ্যে নাক গলাতে পেরেছে যেমন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল ইত্যাদি।

কিন্তু ওরা হলো সংগঠন, দেশ বা সরকার নয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সবচেয়ে সিরিয়াসলি নাক গলিয়েছে একটা সার্বভৌম মুসলিম দেশ,

তুরস্ক। গলিয়েছে একবার নয়, বারবার। সেই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নাসিকাকে ঝামা দিয়ে ঘষে রক্তাক্ত করে দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে টুপিখোলা ধন্যবাদ। তুরস্ক দেশটা হয় স্মৃতিভ্রংশ রোগে ভুগছে নয়তো স্মৃতিভ্রংশের নাটক করছে। তাকে কি কেউ মনে করিয়ে দেবেন, তার হাজার বছরের ইতিহাসে সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতা এবং তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী (১৯৫০-১৯৬০) আদনান মেন্ডারিসকে সে নিজেই আদালতের রায়ে ফাঁসি দিয়েছিল? মনে করিয়ে দেবেন, আমাদের একাত্তরের কসাইদের মতোই তার নৃশংস "ইয়ং টার্ক" বাহিনী ১৯১৫-১৯১৮ সালে আর্মেনিয়ার নিরীহ নিরপরাধ ১৫ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে খুন করেছিল, লক্ষ নারীদের ধর্ষণ করেছিল? এখনো সেই গণহত্যার স্মরণে জাতিসংঘ প্রতিবছর ২৭ জানুয়ারি 'আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস' পালন করে। সেই মারাত্মক অপরাধের জন্য তুরস্ক ক্ষমা প্রার্থনা তো করেইনি বরং মিনমিন করে বলেছে–হ্যাঁ, ইট্টুখানি 'ইয়ে' হয়েছিল বটে কিন্তু ওই প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে অনেক মানুষই তো মরেছে, তাই ওটা তেমন ব্যাপার না ... ইত্যাদি। অর্থাৎ গণহত্যা-গণধর্ষণকে খাটো করে দেখা ও দেখানোর খাসলতটা রয়েই গেছে তার রাজনৈতিক রক্তে। তার "মুসলিম" বিবেকের দরজায় ব্যর্থ করাঘাতে ফিরে গেছে আল কোরান–তোমরা ন্যায়বিচারে অটল থেকো যদিও তা নিজেদের বিরুদ্ধে যায়–নিসা ১৩৫। প্রমাণ;

১. আমাদের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনির সঙ্গে বৈঠকে (২০১১) তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুদ্ধাপরাধ বিচার বন্ধের অনুরোধ করেছিলেন।

২. প্রেসিডেন্ট আহমেত গুল আমাদের প্রেসিডেন্টের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যেন গোলাম আযমের ফাঁসি না হয়।

৩. জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামীর ফাঁসির পর 'ক্ষুব্ধ' তুরস্ক বাংলাদেশ থেকে তাদের রাষ্ট্রদূতকে 'ডেকে পাঠিয়েছিল', প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশও তুরস্ক থেকে রাষ্ট্রদূতকে 'ডেকে পাঠিয়েছিল'। এটা ছিল অঘোষিত প্রত্যাহার।

৪. প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান বলেছেন– "নিজামী মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার মতো কোনো পাপ করেনি"। রিয়েলি, ইওর এক্সেলেন্সি??

৫. মীর কাসেম আলীর ফাঁসির পরে তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে এই ফাঁসি "ভুল চর্চা" এবং সেজন্য তারা দুঃখিত।

৬. দিল্লিতে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত ড. বুরাক আকচাপার বলেছেন– নিজামীর ফাঁসি "এক বিরাট ভুল"। রিয়েলি, ইওর এক্সেলেন্সি??

আমাদের আদালতে, আমাদের আইনে, আমাদের মাটিতে ঘটে যাওয়া আমাদের ওপরে গণহত্যা-গণধর্ষণের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অবশ্যই আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এর মধ্যে বাইরে থেকে কারো নোংরা নাকটা গলানোর কোনোই অধিকার নেই। অথচ যখন বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করার পর ইয়াহিয়া তার গোপন বিচারের পরিকল্পনা করেছিল, তখন ওই নিজামীই সেটাকে "পাকিস্তানের নিজস্ব বিষয়" বলেছিল! উদ্ধৃতি:

"জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার বন্ধ রাখার জন্য যে বিবৃতি দেন, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় পরিষদ তার সমালোচনা করে বলে, জাতিসংঘ মহাসচিব এ ব্যাপারে ক্ষমতাবহির্ভূত হস্তক্ষেপ করেছেন। পরিষদে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার অনুষ্ঠান পাকিস্তান সরকারের নিজস্ব বিষয়। এ ব্যাপারে জাতিসংঘ মহাসচিবের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই"–দৈনিক জনকণ্ঠ ২১ অগাস্ট ২০১৯।

নিয়তির পরিহাস একেই বলে! এই তথ্যটার "তথ্যসূত্রঃ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর"-এও থাকার কথা।

এবারে আসা যাক হারিয়ে যাওয়া বিস্মৃত দলিলে। ভুললে চলবে না, মুসলিমের ওপরে মুসলিমের গণহত্যায় মুসলিম ইতিহাস পরিপূর্ণ কিন্তু কোনোদিন কোনো খেলাফতে কোনো গণহত্যাকারীর বিচারই হয়নি, শাস্তি তো দূরের কথা। বাংলাদেশই একমাত্র মুসলিম মেজরিটির দেশ যে মুসলিম গণহত্যাকারীদের বিচার করেছে, ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। একাত্তরে

নাপাক সৈন্যরা ও রাজাকার আলবদর আমাদের ওপরে যা করেছে, তা সমগ্র বিশ্ব-ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদ, সমাজবিদ, রাজনীতির বিশ্লেষক ইত্যাদি বিশেষজ্ঞেরা এগুলো নিয়ে চিরকাল গবেষণা করবেন। কাজেই আমাদের দায়িত্ব তাদের জন্য আমাদের সময়ের ছোট-বড় প্রত্যেকটি দলিল সংরক্ষণ করে রাখা। কারণ কে জানে কোনটা তাদের কাছে কতটা দরকারি মনে হবে।

ভবিষ্যতের দুনিয়ার জানা দরকার আমাদের যুদ্ধাপরাধী বিচার বন্ধ করার তুর্কি অপচেষ্টা প্রতিবাদ-প্রতিরোধহীন যেতে পারেনি। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের কয়েকটি ইসলামি/মুসলিম সংগঠন তীব্রভাবে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের অফিসিয়াল লেটারহেড-এ তীব্র" প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তাদের মধ্যে ইংরেজির পাশাপাশি তুর্কি ভাষাতেও প্রতিবাদটি ছড়িয়েছিল খোদ তুর্কিস্তানের প্রগতিশীল ইসলামিক সংগঠন 'ইসলামিক রিফর্ম'। নিচে সংগঠনগুলোর নাম ও তাদের অফিসিয়াল লেটারহেড-এ প্রতিবাদ দেয়া হলো। এগুলো আমার পরবর্তী বই 'অতঃপর শারিয়া কী বলে'-তে যোগ করা হবে যাতে দলিলগুলো ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে। বইটি আগামী বইমেলায় থাকবে।

১. (ক ও খ) তুর্কিস্তানের সংগঠন "ইসলামিক রিফর্ম", (ইংরেজি ও তুর্কি ভাষায় নিন্দা-বিবৃতি),

২. আমেরিকার সংগঠন " ওয়ার্ল্ড মুসলিম কংগ্রেস (অধুনা প্রায়বিলুপ্ত),

৩. হল্যান্ডের সংগঠন "দ্বীন রিসার্চ সেন্টার" (অধুনালুপ্ত),

৪. মুম্বাই-এর (ভারত) সংগঠন "ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ",

৫. কানাডার সংগঠন "মুসলিমস ফেসিং টুমোরো"।

১. (ক) তুর্কিস্তানের সংগঠন “ইসলামিক রিফর্ম”, (ইংরেজি)

ISLAMIC
REFORM

PRESS RELEASE Date: 10 January 2013

Subject: Denouncing the letter of the Turkish President Mr. Abdullah Gül

We are shocked to learn that the Turkish President Abdullah Gül has sent an official letter to the Prime Minister and President of Bangladesh urging them to forgive the alleged war criminals of Bangladesh War of Independence in 1971, which goes directly against the laws of sovereign Bangladesh, international ethics, constitutional rights of the war victims in 1971. This is a blatant interference in the judicial process of a sovereign country.

Therefore, I am urging you to stand for the rights of the victims of Bangladesh War of Independence in 1971 and at the same time to protest the statement of Abdullah Gül to the Bangladesh government, since it is an illegal interference in a proceeding court hearing before the verdict is given by the International Crime Tribunal (ICT) of Bangladesh.

I invite you to stand for a fair and free trial of the alleged war criminals, to ensure the justice for the genocide took place in1971. No political power should stop or influence the trial of Golam Azam the chief of the then East Pakistan Jamat-e Islami, who actively helped Pakistan army in their genocide and mass-rape on Bangladeshis in 1971.

We demand this letter to be rescinded by President Gül.

Dr. Edip Yuksel, J.D.
Founder, Islamic Reform
Arizona, United States

১. (খ) তুর্কিস্তানের সংগঠন "ইসলামিক রিফর্ম", (তুর্কি ভাষায়)

ISLAMIC REFORM

BASIN DUYURUSU

Tarih: 10 Ocak 2013

Konu: Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mektubunun kınanması

Bu bildiriyle Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 17 Aralık 2012 tarihinde Bangladeş'in Başbakanı ve Cumhurbaşkanına gönderilen tartışmalı bir beyanata dikkatinizi çekmek istiyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Gül o beyanatıyla Bangladeş Bağımsızlık Savaşında savaş suçu işlemekle itham edilenleri Bangladeş hükûmetinin "idam" etmeyip "bağışlamasını" önermektedir. Böyle bir mektup Türkiye'deki sivil kuruluşlardan gelseydi hiçbir sorun teşkil etmeyecekti. Doğrudan ve resmi yoldan yapılan bu telkin Bangladeş'in bağımsızlığına, uluslararası etik ve 1971 yılının mağdurlarının anayasal haklarına saygısızlıktır.

Bundan dolayı, sizleri 1971 yılında gerçekleşen Bangladeş Bağımsızlık Savaşı mağdurlarının haklarını desteklemeye ve aynı zamanda Abdullah Gül'ün Bangladeş Uluslararası Suç Mahkemesi (ICT) karar vermeden önce Bangladeş hükumetine yönelttiği tavsiyesini protesto etmeye çağırıyorum.

Savaş suçu zanlılarının adil ve özgür bir mahkemede yargılanmaları ve böylece 1971 yılında Cemaati İslami desteğinde Pakistan ordusu tarafından Bangladeş'te gerçekleştirilen cinsel tecavüz ve soykırımla ilgili olarak adaletin gerçekleşmesi için sizin Bangladeş halkının adalet arayışını desteklemenizi bekliyorum. Mahkemenin detayları ve usulü aşağıdaki email adresinden istenebilir.

Bu mektubun Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından geri çekilmesini istiyoruz.

İslami Reform

Hasan Mahmud
hasan@hasanmahmud.com

PROTESTO DUYURUSU

1971 yılında Pakistan ordusunun Bangladeş'te gerçekleştirdiği toplu cinsel tecavüz ve soykırımı aktif olarak destekleyen eski Doğu Pakistan Cemaati İslami'nin başkanı Golam Azam'ın mahkemesini durdurması için Türkiye Cumhurbaşkanının Bangladeş Cumhurbaşkanına gönderdiği mektubu protesto ediyoruz. Bu resmi mektup (1) ancak mağdurların suçluları affedebileceğini öngören İslami değerlere saygısızlık etmiştir, (2) Bangladeş'in bağımsızlığını ihlal etmiştir ve (3) Onun hukuk sistemine müdahale etmiştir.

Tarih:	12 Ocak 2013, Cumartesi
Saat:	13
Yer:	National Museum – Shahbag
Organizatör:	Youth For Peace and Democracy and Secular Unity

২. আমেরিকার সংগঠন "ওয়ার্ল্ড মুসলিম কংগ্রেস"

Muslims Committed to Religious Pluralism & Pluralistic Societies

To be a Muslim is to be a peace maker, one who seeks to mitigate conflicts and nurtures goodwill for peaceful co-existence of humanity.

MuslimsTogether
BUILDING COHESIVE SOCIETIES
www.IslamTogetherFoundation.Com

World Muslim Congress
GOOD FOR MUSLIMS & GOOD FOR THE WORLD
www.WorldMuslimCongress.com

Prophet Muhammad's (pbuh) actions reflected those twin values. God wants us to live in peace and harmony with his creation; Life and Matter.

www.WorldMuslimCongress.com

PRESS RELEASE

World Muslim congress

May 19, 2016, Dallas, Texas – On May 11, 2016 the death penalty of Mr. Motiur Rahman Nizami, Chief of Jamaat e Islami, Bangladesh was carried out. He was convicted and then brought to trial by the Court of Bangladesh for his involvement with the Pakistan Army in 1971 carrying out genocide and mass rape on the people of Bangladesh.

At World Muslim Congress, a think tank, we regret the opposition to death penalty expressed by the Government of Turkey and Pakistan. If they had expressed similar outrage at other killings around the world including their own, we would have had a different view, but they were taking an exception to this man as he was head of the largest political party in Bangladesh carrying an Islam banner but doing un-Islamic things; Rape and Genocide. No one is above the law.

"As an individual Muslim, I am opposed to death penalty, however, as a society; we have a responsibility to meet out punishment prescribed by the law of land in cases of mass murderers and rapists like this." Mike Ghouse added.

Genocide is a common crime committed in the history of all religions. However, for the first time in history a Muslim majority country, Bangladesh has shown the courage to take a stand for justice through trial and punishment of Muslim criminals committing atrocious crimes. Justice is the key to sustain cohesive societies with harmony and peace.

Hasan Mahmud
Member, Advisory Board
Email- hasan@hasanmahmud.com

৩. হল্যান্ডের সংগঠন “দ্বীন রিসার্চ সেন্টার”

DRC
Islamic Thinktank

PRESS RELEASE Date: 14 January 2013
Subject: Denouncing the letter of the Turkish President Mr. Abdullah Gül

We, in Deen Research Centre are shocked to learn that the Turkish President Abdullah Gül has sent an official letter to the President of Bangladesh urging them to forgive Mr. Gulam Azam, an alleged war criminal of genocide and mass-rape during Liberation war of Bangladesh in 1971. The letter is a violation of Islamic values, the laws of sovereign Bangladesh, international ethics, constitutional rights of the war victims in 1971. This is a blatant interference in the judicial process of a sovereign country. It also failed Islamic values and Turkey as a nation.

All people of integrity regardless of faith and race should stand for the rights of the victims of the genocide and mass rape in 1971 and protest the statement of Abdullah Gül to the Bangladesh government. It is an illegal interference in a proceeding court hearing before the verdict is given by the International Crime Tribunal (ICT) of Bangladesh.

Let us stand united for a fair and free trial of the alleged war criminals. No power should stop or influence the trial of all war-criminals including Mr. Golam Azam the chief of the then East Pakistan Jamat-e Islami, who actively helped Pakistan army in their genocide and mass-rape on Bangladeshis in 1971.

We demand this letter to be withdrawn by President Gül.
Arnold Yasin Mol
Founder and CEO, Deen Research Centre
The Netherlands

৪. মুম্বাই-এর (ভারত) সংগঠন "ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ"

INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES
(Reg. No. E-8900 (Mumbai)
602 / 603, "Silver Star", 6th Floor, Near Santacruz Station, Prabhat Colony, Santacruz (East),
Mumbai-400055. ★ (O) 2613 5098 / 2614 9668 / 2610 2089 (R) 2663 0086 ★ Fax: 91-22-2610 0712
Mobile : 98694 46999 / 98921 62233 ★ E-mail : csss@vsnl.com ★ Website : www.csss-isla.com

Dr. Asghar Ali Engineer
Director

Date :____________________

January 10, 2013

Subject: letter of the Turkish President Mr. Abdullah Gül to President of Bangladesh, Mr. Zillur Rahman.

Institute of Islamic Studies, India deeply resents the recent letter of the honourable Turkish President Mr. Abdullah Gül to honourable President of Bangladesh, Mr. Zillur Rahman requesting "to forgive" and "not to hang" Mr. Golam Azam, the ex-chief of Jamate Islami the main Islamic political party of Bangladesh. Mr. Azam, with few other leaders of Jamate Islami are being tried in ICT (International Criminal Court) in Bangladesh for taking active part in genocide and mass-rape on the innocent people during the Liberation War of Bangladesh in 1971. It is one of the most heinous genocides and mass rapes in human history where allegedly 3 million people were killed and about three hundred thousand women were raped by Pakistan army. Please note that while the nature of the crime is International, the court is trying them by Bangladesh law. Mr. Gul sent the letter on 17 December 2012 when the trial was still going on and no verdict was given.

Islam strongly ordains trial of all crimes and Turkey as a Muslim nation is expected to uphold Islamic values. Mr. Gul's latter has failed Islam. It also failed Turkey as the historic center of Muslim world. The blood and tear-stained Bangladesh with about a thousand fields of mass-slaughter waited for 40 years to see justice carried out. Many millions still miss their near and dear murdered and raped ones. Mr. Gul's letter has insulted the victims of the genocide. It also violated the sovereignty of Bangladesh and international ethics. His request "not to hang" Mr. Azam is ridiculous and unfounded because the trial was not over and no verdict was given. His letter is an assault on the sovereignty of Bangladesh and interference to her justice system. It also deceptively implies that Bangladeshi government controls the judiciary while the fact it ICT is totally independent.

We hope Turkish as a Muslim nation condemns the anti-Islamic act of its president. To uphold Islamic ethics Turkish people and all Muslims should rather support the trial of heinous crimes of genocide and mass-rape.

Sincerely,

Dr. Asghar Ali Engineer

৫. কানাডার সংগঠন "মুসলিমস ফেসিং টুমোরো"

muslims facing tomorrow

40 Richview Road, Toronto, ON M9A 5C1

PRESS RELEASE............FOR IMMEDIATE RELEASE........................MAY 17, 2016

On May 11, 2016 the death penalty of Mr. Motiur Rahman Nizami, Chief of Jamaat e Islaami, Bangladesh, the largest Islamist Political Party in the country was carried out. He was convicted and then brought to trial by the Court of Bangladesh for his involvement with the Pakistan Army in 1971 carrying out genocide and mass rape on people of Bangladesh.

We, at World Muslim Congress strongly condemn Turkey and Pakistan for objecting to the justice that was carried out in Bangladesh.

Genocide and mass-rape are common crimes committed in the history of many religions. However, for the first time in history a Muslim majority country, Bangladesh has shown the courage to take a stand for justice through trial and punishment of Muslim criminals committing such atrocious crimes. Criminals never feel the pain of their victims. Turkey needs to assess its own human rights policy and practice under President Erdogan. To date, Turkey has the highest number of journalists imprisoned and has an abysmal record of genocide against the Armenians.

Pakistan also has the highest number of extra judicial killings by kangaroo courts set up by the Pakistan Army and is still carrying out crimes against humanity in the Province of Baluchistan. This is the country that committed heinous crimes on people of Bangladesh in 1971 with the support of Jamaat e Islaami.

Hasan Mahmud, General Secretary
Email: hasan@hasanmahmud.com

ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার, সফল জঙ্গিবাদ উচ্ছেদ প্রকল্প ও আহলে হাদিস

অ্যান্টি টেররিজম ইউনিট প্রধান ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম ২০১৯ সালের ৯ ডিসেম্বরে উগ্রবাদবিরোধী জাতীয় সম্মেলনে বলেছেন– (১) জঙ্গিদেরকে ডি-র‍্যাডিক্যালাইজ অর্থাৎ বুঝিয়ে-শুনিয়ে উগ্রতা থেকে বের করার মেকানিজম তাদের নেই বললেই চলে, এবং (২) ধৃত জঙ্গিদের ৯০ শতাংশের বেশি জঙ্গি ইসলামি সংগঠন 'আহলে হাদিস-এর সদস্য।

তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ, তিনি জঙ্গি ও জঙ্গিবাদের পার্থক্য, জঙ্গি সমস্যার চরিত্র ও নিজেদের সীমাবদ্ধতা সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন। এর ভিত্তিতে প্রশাসন ও আলেমদের পরবর্তী পদক্ষেপের ওপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশ জঙ্গিমুক্ত হবে কি হবে না। এ বিষয়ে আমাদের দীর্ঘকাল ধরে মৌলবাদ-বিরোধী ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক তাত্ত্বিক ও ময়দানের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা প্রশাসনের কাজে লাগতে পারে।

২৬ ডিসেম্বর ২০১৯–আবারও ৬ জঙ্গি ধরা পড়েছে। ধরা না পড়লে আবার যেকোনো মুহূর্তে আরেকটা 'হলি আর্টিজান' হতে পারত, আবার অনেকগুলো রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকত। সরকারি হিসেবে এখনো আরও কয়েকটি জঙ্গি দল সক্রিয়। অর্থাৎ প্রতিটি নাগরিক এখনো ভয়াবহভাবে অরক্ষিত। জঙ্গিবাদ উচ্ছেদে অনেকে অনেক প্রস্তাব করেছেন, তার প্রায় প্রতিটিতেই কিছু পথনির্দেশ আছে। সরকারও চেষ্টা করছে কিন্তু শিকড়টা রয়েই যাচ্ছে। অনেকে বলছেন, জঙ্গিবাদ উচ্ছেদ করতে হলে 'প্রকৃত ইসলামের রূপ' তুলে ধরতে হবে। কিন্তু 'প্রকৃত ইসলাম' কী তা নিয়ে আলেমদের মধ্যেই বিপুল মতভেদ। এ সত্যটা আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি যে, জঙ্গিদের কাছে ওদের আদর্শই 'প্রকৃত ইসলাম' এবং ইসলামের শান্তিময় ব্যাখ্যার পাশাপাশি আরেকটা ব্যাখ্যা আছে যা ওদের হিংস্রতার চালিকাশক্তি। সে ব্যাখ্যার দলিল নিচে দেওয়া হলো। জঙ্গিদের উগ্রতার

কারণে নিরপরাধের প্রাণহানি ছাড়াও দুনিয়ায় ইসলামের একটা ভয়ংকর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর নিরসন হওয়া দরকার।

আলেমরা জঙ্গিদের তীব্র সমালোচনা করছেন কিন্তু জঙ্গিরা তাদের কথা মানছে না। কাজেই তাদের জঙ্গি-বিরোধিতার পাশাপাশি সহায়ক হিসেবে আমাদের অন্য পন্থা যোগ করতে হবে। সেটা হলো, জঙ্গিদের দলিল দিয়েই ওদের চোখ খুলে দেওয়া। বাংলাদেশে ওদের প্রধান উদ্দেশ্য গণতন্ত্র উচ্ছেদ করে–শারিয়া আইনভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এর বিপরীতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বহু আলেম ও মুসলিম বিশেষজ্ঞ শত শত দলিল দিয়ে অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন ইসলামের উদ্দেশ্য 'ইসলামিক স্টেট' অর্থাৎ ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয় বরং 'স্টেট অব ইসলাম' অর্থাৎ শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠা। এঁদের মধ্যে আছে বিখ্যাত আলেম-উলামাদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইসলামি সংগঠন 'নাহদাতুল উলামা', তাদের বইয়ের নাম The Illusion of an Islamic State (ইসলামি রাষ্ট্রের বিভ্রম)। ২০১৩ সালে এর সদস্যসংখ্যা ছিল চার কোটি। এ রকম মুসলিম গবেষক আরও অনেক আছেন যেমন ড. বাসাম তিবি, ড. আবদুল্লাহ আন নাঈম, ড. খালেদ আবু আল ফাদেল, ড. হাশিম কামালি ইত্যাদি। জঙ্গিদের ডি-র‍্যাডিক্যালাইজ করতে তাঁদের বইগুলো অপরিহার্য। সেসব গবেষণার অনেকটা সংকলন করা আছে 'শারিয়া কী বলে, আমরা কী করি' বইতে (৪র্থ সংস্করণ)। প্রশাসন ও সুশীল সমাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে বইটি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দলে থাকার সময় শেখ হাসিনা যখন আমেরিকা এসেছিলেন, তখন মি. জামাল হাসান তাঁকে বইটি উপহার দিয়েছিলেন। ওটা ছিল ১ম সংস্করণ, নাম ছিল 'ইসলাম ও শারিয়া।

'শারিয়া কী বলে, আমরা কী করি' বইয়ের "শারিয়া আইনের উদাহরণ" এবং "আইনে আইনে বিরোধ" অধ্যায় দুটোতে শারিয়া আইনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিছু কিতাব থেকে আইন নম্বরসহ অজস্র আইনের উদ্ধৃতি আছে যা জঙ্গিদের চোখ খুলতে সাহায্য করবে। যেমন:

১. তওবা করলে গণহত্যাকারী গণধর্ষণকারীদের শাস্তি হবে না (বিধিবদ্ধ

ইসলামি আইন ১ম খণ্ড ধারা ১৩)। কিংবা,

২. খুন-জখম চুরি-ডাকাতি মদ্যপান ইত্যাদি (হুদুদ) মামলায়, নারীদের চাক্ষুষ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। (হানাফি আইন পৃঃ ৩৫৩; শাফি'ই আইন #o.24.9, ক্রিমিনাল ল' ইন্ ইসলাম অ্যান্ড দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড পৃ. ২৫১, মুহিউদ্দীন খানের অনূদিত বাংলা কোরান পৃঃ ২৩৯, পেনাল ল' অব্ ইসলাম পৃ. ৪৪, বিধিবদ্ধ ১ম খণ্ড, ধারা ১৩৩ ও ২য় খণ্ড, ধারা ৫৭৬)। কিংবা,

৩. খুন-জখম-চুরি-ডাকাতি-মদ্যপান ইত্যাদি (হুদুদ) অপরাধের জন্য ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের শাস্তি তো দূরের কথা তাঁর বিরুদ্ধে মামলাই করা যাবে না (বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খণ্ড আইন নং ৯১৪ গ এবং হানাফি আইন হেদায়া পৃষ্ঠা ১৮৮)। কিংবা,

৪. খুন-জখম-চুরি-ডাকাতি-মদ্যপান ইত্যাদি (হুদুদ) হুদুদ মামলায় নারী-বিচারক অবৈধ।

এ রকম অজস্র। গ্রেপ্তারকৃত জঙ্গিদেরকে বইটার ওই অধ্যায় দুটো প্রিন্ট করে দিলে ওরা নিশ্চয়ই বুঝবে, যেই আইন প্রতিষ্ঠার জন্য তারা খুন করছে, খুন হচ্ছে—ওটা ইসলামি হতে পারে না এবং ওটা দিয়ে রাষ্ট্র চালানো অসম্ভব। সেক্ষেত্রে ওদের কেউ কেউ জঙ্গিবাদ থেকে ফিরে আসবেই এবং সেটা হবে অন্য জঙ্গিদের জন্য শিক্ষামূলক। এক প্রাক্তন তালেবান যোদ্ধাসহ প্রাক্তন কয়েকজন জঙ্গি এখন জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয়, তাদেরকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তাছাড়া, আল্লাহ এক রাসুল (সা.) এক কোরান এক হলেও বিভিন্ন শারিয়া আইনের (মজহাব) মধ্যে ব্যাপক বিরোধ আছে যার অনেক উদাহরণ 'আইনে আইনে বিরোধ' অধ্যায়ে দেওয়া আছে। এমন মামলাও আছে যাতে মালিকি আইনে অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ড অথচ হানাফি আইনে বেকসুর খালাস। এগুলো জানলে আশা করা যায় জাতির ও জঙ্গিদের চোখ খুলবে।

গ্রামভিত্তিক সফল 'জঙ্গিবাদ উচ্ছেদ' প্রকল্প

পদ্ধতিটা শান্তিপূর্ণ, সরল এবং সফল। এতে নেই কোনো হুংকার, নেই আর্থিক লেনদেন বা নেতৃত্বের কোন্দল। গ্রামবাসীদের কম্পিউটার নেই এবং তারা টিভিতে রোম্যান্টিক নাটক-মুভি দেখতে পছন্দ করে। এগুলো মাথায় রেখে আমরা রোমান্টিক গল্পের কাঠামোতে ইসলামি ও শারিয়া সূত্রসমৃদ্ধ দুটো শর্ট ফিল্মও বানিয়েছি, 'নারী' ও 'হিল্লা'। ওগুলো ইন্টারনেটে আছে, নির্মাণ করেছেন রাকিবুল হাসান আর অভিনয়ে রাইসুল ইসলাম আসাদ ও ইলোরা গহর। ২০১১ সালে আমরা ঢাকার রাজনীতি, সুশীল সমাজ ও মিডিয়ার ঢক্কানিনাদ থেকে বহুদূরে এক গহন গহিন গ্রামে একটা ডিভিডি প্লেয়ার আর ডিভিডিতে মুভি দুটো কপি করে পাঠাই। সেখানে আমাদের কর্মীর বাসায় সপ্তাহে দু-তিনবার পনেরো-বিশ-তিরিশজন গ্রামবাসী নারী-পুরুষ ডিভিডি চালিয়ে মুভি দুটো দেখে। এতে বিনোদনের পাশাপাশি তাদের শারিয়া আইন, ইসলামি রাষ্ট্র ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। মোটামুটি এক মাসে পুরো গ্রামের মানুষ সচেতন হবার পর ডিভিডি প্লেয়ার আর মুভির ডিভিডিটা অন্য গ্রামে দেয়া হয়। এভাবে গত নয় বছরে পঞ্চাশটাও বেশি গ্রামের মানুষ সচেতন হয়েছে, এখন ওসব গ্রাম থেকে কারো জঙ্গি হবার আশঙ্কা নেই বললেই চলে। গ্রামবাসীদের কম্পিউটার ইন্টারনেট নেই তাই পুরো আন্দোলনটা করতে হয়েছে কর্মীদের সাথে আমাদের সাপ্তাহিক টেলিফোনে নির্দেশের মাধ্যমে, রিপোর্টও এসেছে টেলিফোনেই।

উল্লেখ্য, কাগজে আসে না কিন্তু গ্রাম-গঞ্জে মাঝে মাঝে এখনো তিন তালাকের ঘটনা ঘটে। কারণ অনেক আলেম তিন তালাকের বিরোধী হলেও কিছু ইমাম ওটাকে সমর্থন করেন (তাঁদের ওয়াজ দেখে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি)। এ যাবৎ আমাদের কর্মীরা 'হিল্লা' মুভিটি দেখিয়ে ছয়টি হিল্লা বিয়ে বন্ধ করেছে, তার মধ্যে চারটে বন্ধ করেছেন ওই ইমামরাই যাঁরা হিল্লার ফতোয়া দিয়েছিলেন। আমাদের কর্মীরা তাঁদেরকে 'হিল্লা' মুভি দেখিয়েছিল, তারা মুভিতে দেখানো সূত্র মিলিয়ে ফতোয়া ফিরিয়ে নিয়েছিলেন (সুরা বাকারা ২২৯, ২২৯, সহি মুসলিম ৩৪৯১, ৩৪৯২, ৩৪৯৩, সুনান আবু দাউদ ২১৯৪ ইত্যাদি অনেক সূত্র মোতাবেক তাৎক্ষণিক তালাক অবৈধ। তাছাড়া সুরা ত্বালাক আয়াত ২ মোতাবেক

সাক্ষীরও দরকার যা তিন তালাকে প্রায়ই থাকে না)। বাকি দুই ইমামকে মানাতে হয়েছিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, গ্রামের সম্মানিত মুরুব্বি এঁদের মাধ্যমে।

যে পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবে পঞ্চাশ-ষাটটা গ্রাম জঙ্গিবাদ-মুক্ত হয়েছে সেটা পরীক্ষিত পদ্ধতি, সেটা দিয়ে সারা দেশ জঙ্গিবাদ-মুক্ত হতে পারে।

মো. শফিকুল ইসলাম জঙ্গিদের সাথে তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বলেছেন ধৃত জঙ্গিদের ৯০ শতাংশের বেশি আহলে হাদিস-এর সদস্য। দেশে আহলে হাদিস-এর আলেম অনেক, তাদের অনুসারীও অসংখ্য। স্বভাবতই তারা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। আমরা জানি আহলে হাদিসসহ দেশের সবকটি ইসলামি দলগুলোই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। কিন্তু এই জঙ্গিরা তো জঙ্গি হয়ে জন্মায়নি, তারা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো উৎস দ্বারা এ হিংস্রতায় অনুপ্রাণিত হচ্ছে। ভালো হয় যদি সরকার ও আলেমরা অনতিবিলম্বে সেই উৎসগুলোকে চিহ্নিত করে নিষিদ্ধ করেন। জঙ্গিরা আলেমদের শিক্ষা ভুল বুঝে থাকলে তাদের ভুল শোধরানো এবং আর কেউ যাতে ভুল না বোঝে, তা নিশ্চিত করা আলেমদেরই দায়িত্ব।

জঙ্গিদের 'ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা'-র ধর্মতাত্ত্বিক ডায়নামিক্সটা বুঝে নিলে আমরা সফল পদক্ষেপ নিতে পারব। সেটাই দেখা যাক এবার।

বিশ্ব-মুসলিম বিভিন্ন ফিরকা তরিকায় বিভক্ত হয়েছে কারণ কোরান-রাসুলকে (সা.) বিভিন্নভাবে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার একটি ব্যাখ্যা হলো, শারিয়া আইনভিত্তিক বিশ্ব-ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করাই ইসলামের লক্ষ্য ও কোরান-রাসুলের (সা.) হুকুম। এই ব্যাখ্যাই জঙ্গি-মানসের মূল চালিকাশক্তি।

"ইসলাম দেশ-জাতি নির্বিশেষে ইসলামের দর্শন ও কর্মপদ্ধতির পরিপন্থী সকল রাষ্ট্র ও সরকারকে পৃথিবী হইতে ধ্বংস করিতে চায়... ইসলামের নীতি ও শিক্ষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন না করা পর্যন্ত আমাদের শাহাদা (কলমা পড়া) পূর্ণ হইবে না"–মওলানা মওদুদী, 'ইসলামে জিহাদ' পৃ. ৬ ও 'উইটনেস টু ম্যানকাইন্ড' পৃষ্ঠা ৩২।

এটা ভাবা ভুল হবে যে, মওদুদীই সর্বপ্রথম দাবিটা করেছেন। আসলে ১৪০০ বছর আগে সুরা তওবা আয়াত ২৯-এর ভিত্তিতে ইসলামকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। 'তলোয়ারের আয়াত' নামে প্রসিদ্ধ সেই আয়াতটা হলো– "তোমরা যুদ্ধ করো আহলে কিতাবের (ইহুদি-খ্রিস্টান) ওই লোকদের সহিত যাহারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসুল যাহা হারাম করিয়া দিয়াছেন তাহা হারাম করে না এবং সত্যধর্ম গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তাহারা হাত জোড় করিয়া জিজিয়া প্রদান করে"। এর ভিত্তিতে ইসলামকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে:

"তখন আল্লাহ সুরা তওবা-তে (অমুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তি ইত্যাদি–লেখক) সমস্ত বাধ্যবাধকতা বাতিল করিতে হুকুম করিলেন। এবং আদেশ করিলেন সকল মুশরিকদের এবং ইহুদি-খ্রিস্টানদের সহিত যুদ্ধ করিতে যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করে অথবা স্বেচ্ছায় অপমানিতভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া জিজিয়া কর না দেয় যাহা সুরা তওবা আয়াত ২৯-এ নাজিল হইয়াছে। সুতরাং, মুসলমানদিগকে চিরকালের জন্য পৌত্তলিক, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাতিল করার বা সমঝোতায় আসিবার বা হিংস্রতা বাতিল করার অনুমতি দেওয়া হইল না যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানেরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি রাখে। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, প্রথমে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। তারপর যাহারা মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যাহারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল ও পরে যুদ্ধকে বাধ্যতামূলক করা হইল"।

সূত্র: সহি বুখারি (অখণ্ড) পৃ. ১০৮১, মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহসিন খান-এর অনূদিত।

এর সমর্থনে কোরানের কিছু আয়াতের ব্যাখ্যাও করা হয়েছে (সুরা হাদীদ আয়াত ২৫ ইত্যাদি) এবং আবারও ওই 'তলোয়ারের আয়াত'-এর উদ্ধৃতি দিয়েই "আল্লাহ'র আইন" বানানো হয়েছে,–মুসলিম খলিফা দুনিয়ার সব অমুসলিমকে আহ্বান জানাবেন ইসলাম গ্রহণের, সেটা না হলে জিজিয়া

কর দেবার, তাতেও রাজি না হলে তারা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত ক্রমাগত অন্তহীন যুদ্ধ করার আদেশ–আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাম্প ও স্বাক্ষরে সত্যায়িত শাফি আইনের কেতাব “উমদাত আল সালিক” পৃষ্ঠা ৬০২, ৬০৩ আইন নং ও.৯.৮ এবং ও.৯.৯।

চূড়ান্ত লক্ষণীয়, সুরা তওবার ওই আয়াত ২৯ নাজিল হয়েছিল একটা তাৎক্ষণিক যুদ্ধের পটভূমিতে। অথচ সেই তাৎক্ষণিক যুদ্ধের পটভূমিতে নাজিল হওয়া আয়াতের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে ইসলামের চিরকালীন শাশ্বত চরিত্র। আত্মপ্রতারণা আর কাকে বলে!

ইসলামের এই সংজ্ঞা দুনিয়ার সব অমুসলিমদের বিরুদ্ধে চিরযুদ্ধের আদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেক প্রগতিশীল ইসলামি বিশেষজ্ঞ এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন, একটার উদ্ধৃতি: ‘কোরানের ১০০টির বেশি মূল্যবোধের আয়াত যেমন দয়া, ক্ষমা, শান্তি, ন্যায়-ব্যবহার ও সহনশীলতাকে ‘তলোয়ারের আয়াত’ বাতিল করিয়াছে বলিয়া দাবি করা হয়... ইহা হয়তো তখন কাজে লাগিয়াছে যখন মুসলমানেরা পৃথিবীতে রাজনৈতিক-সামরিক শক্তিতে অনন্য ছিল। কিন্তু ইহা তখনো যথার্থ ছিল না, এখনো এই পরিবর্তিত বিশ্বে ইহা গ্রহণযোগ্য নহে’– প্রিন্সিপলস অব ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স, পৃ. ৫০৭, ডক্টর হাশিম কামালি।

এই শিকড় থেকেই থেকেই বিশ্ব-ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শারিয়া ডক্ট্রিনের জন্ম, যা জঙ্গিদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। এ ডক্ট্রিনে জঙ্গি-গুরুরা এমন সম্মোহনী শব্দাবলি ব্যবহার করেন যার প্রভাব ভক্ত মুসলমানের মনে হ্যামিলনের বাঁশির চেয়েও প্রবল। যেমন কোরানের কিছু আয়াত ও হাদিস (সূরা মায়েদা ৪৪, বাকারা ২০৮, ‘তলোয়ারের ছায়ার নিচে বেহেশত’- সহি বুখারি হাদিস ২৮১৫ ইত্যাদি)। টগবগে মুসলিম তরুণের পক্ষে এই প্রচণ্ড ঐশী আহ্বান উপেক্ষা করা অসম্ভব, এবং এর সাথে আছে ‘মরলে শহীদ বাঁচলে গাজি’-র দুর্বার আকাঙ্ক্ষা–কারো বা আছে ৭২ হুরের স্বপ্ন। সমস্যা ও দুর্নীতি জর্জরিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিপক্ষে মুসলিম সমাজে এসব শব্দ সর্বরোগ নিবারণী বেহেশতি বিকল্পের স্বপ্ন-সঞ্চার করে। সেই সাথে বিশ্বময় ইন্টারনেটে ইসলাম-বিদ্বেষীদের নোংরা পোস্ট, সুদভিত্তিক

পুঁজিবাদী সমাজের শোষণের বিরুদ্ধে ক্রোধ, অমুসলিমদের দ্বারা মুসলিম নিগ্রহ (যদিও তারা অমুসলিমদের ওপর মুসলিমদের অত্যাচারের ব্যাপারে নীরব) ইত্যাদি তো আছেই।

কালতামামী

বিশ্বাসীদের অকল্পনীয় দক্ষতা আছে নিজের ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তি বা বাহানায় ডিফেন্ড করার। যে লোক বিশ্বাস করে প্রাচীন ভারতে অর্গান ট্রান্সপ্ল্যান্ট ছিল তার প্রমাণ গণেশের হাতির মাথা মানুষের দেহ তাকে সে বিশ্বাস থেকে নড়ানো মুরগির দাঁতের মতোই অসম্ভব। কাজেই জঙ্গিদেরকে 'তোমাদের ইসলাম আসলে ইসলাম নয়' বলে লাভ হবে না। তার চেয়ে অনেক কার্যকর ওদেরকে এবং জাতিকে শারিয়া কিতাব থেকে আইনগুলো দেখিয়ে আলোকিত করে তোলা।

এক নতুন বছর এসেছে আমাদের জীবনে। এ বছর হোক শুধু জঙ্গিমুক্ত নয় বরং জঙ্গিবাদ-মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার পরীক্ষিত পদ্ধতির প্রয়োগ যেখানে কোরান রাসুলের (সা.) নামে বইবে না নিরীহের রক্তস্রোত, ইসলাম হবে না বদনাম। হ্যাঁ, সময় খারাপ এখন। কিন্তু একাত্তরের রক্তক্ষতে অর্জিত আমাদের মাতৃভূমি তো একটা বাগান, তাই না?

বাগান হোক না শত, ঝড়ে ক্ষতবিক্ষত–নামহীন কোনো ফুল ফুটবেই,

দূরদূরান্ত থেকে, যুগযুগান্ত থেকে–কলিতে অলিরা এসে জুটবেই!

তীক্ষ্ণ খরার পরে, খালবিল নদী ভরে–উত্তাল জল ছল ছলবেই,

ক্ষুদ্র মরণ শেষে, রুদ্র জীবন এসে–জীবনের রূপকথা বলবেই!

হোক পথ দুঃসহ, দুর্গম ভয়াবহ–দু-এক পথিক পথ চলবেই,

বোধের বন্ধদ্বারে, নিকষ অন্ধকারে–বিদ্রোহী কিছু দীপ জ্বলবেই!

ইসলামের নামে হিংস্রতার বিরুদ্ধে দেশের ঘরে ঘরে জ্বলে উঠুক এই বিদ্রোহী দীপ সেই প্রত্যাশায় সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও সালাম।